গান্ধী রচনা সংকলন

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত ॥

গান্ধীরচনা সংকলন

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত

অনুবাদ :

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



গান্ধী স্মারক নিধি
বাংলা

নবজীবন ট্রাস্টের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬৬ (আশ্বিন ১৩৭৩)
মুদ্রণ-সংখ্যা : ৩৩০০

প্রকাশক :
শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু
সম্পাদক, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১৪, রিভারসাইড রোড, ব্যারাকপুর
(২৪-পরগনা)

কলিকাতা কেন্দ্র :
প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীমতী শুক্লা সরকার

ব্লক :
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

বাঁধাই :
ক্যালকাটা বাইণ্ডার্স
২২, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রো, কলিকাতা-৯

মূল্য ৫·০০

মুদ্রক :
শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

গ্রন্থবদ্ধ পৃষ্ঠাগুলি সপ্রেম কর্মের প্রমাণ। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ১৯৩৪ সালে প্রথম তাঁহার এই সংকলন প্রকাশ করেন—উহাতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত আমার রচনার নির্বাচিত অংশ সন্নিবিষ্ট ছিল।* কিন্তু আমার লেখনী তার পরেও সক্রিয় রহিয়াছে, কাজেই অধ্যাপক বসুর মনে হইয়াছে যে তাঁহার সংকলনটিকে যতদূর সম্ভব অধুনাতন অর্থাৎ ১৯৪২ সালের সীমা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। এই সালের পরে বিক্ষিপ্ত আকারে যে সকল লেখা প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিরও নির্বাচিত অংশ অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছেন। সেইজন্য যদিও ইহা নূতন সংস্করণ নামে অভিহিত হইয়াছে, আসলে ইহা একখানি নূতন বই। এই-জাতীয় গ্রন্থ-সংকলনচেষ্টা সর্বপ্রথমে হইয়াছিল গুজরাটীতে, স্বর্গত অমৃলখরায় বিস্তারিত পরিসরে সেই সংকলন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অনেক বৎসর আগেকার কথা। তিনি আমার গুজরাটী ও হিন্দী রচনা হইতেও সংকলন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল সংকলন-গ্রন্থ গুজরাটীতে হওয়ায় উহাদের তেমন প্রচার হয় নাই। আমাদের স্বকীয় ভাষাগুলির প্রতি ত আমাদের এই প্রকার অনুরাগ! কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলির ন্যায় এমন পূর্ণাঙ্গ সংকলন আমার আর চোখে পড়ে নাই।

অধ্যাপক বসুর প্রয়াস ঐ গোত্রের। ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে যখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম, তিনি আমাকে তাঁহার পাণ্ডুলিপিখানি দেখান—আমার উপরেই উহার ভার তিনি ছাড়িয়া দেন। কিন্তু কর্ম-ব্যস্ততার দরুন সেই সময়ে পাণ্ডুলিপি দেখার অবকাশ আমার হয় নাই। অবশেষে নিছক কর্তব্যচ্যুতি জনিত লজ্জার পীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাণ্ডুলিপি দেখি। সংকলনকর্তার কাজ দেখিয়া বুঝা যায় তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই সংকলন-কার্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যাঁহারা আমার রচনার প্রতি আগ্রহশীল তাঁহারা সংকলনকর্তার শ্রমের গুরুত্ব অবশ্যই উপলব্ধি করিবেন। (অনূদিত)

আম্‌কি
নোয়াখালি, ৩০-১-'৪৭

এম. কে. গান্ধী

---

* প্রথম সংস্করণ নবজীবন প্রকাশন সমিতি (৪৯ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভূমিকা

গান্ধীজী সম্ভবতঃ কখনও লেখার জন্যই কিছু লেখেন নাই। চিন্তা এবং লেখা সর্বদাই তাঁর নিকটে ছিল নিপুণতরভাবে কর্মসম্পাদনের উপায়। তাঁর নিজের মনে অথবা তাঁর সহকর্মীদের মনে যে সকল সমস্যার জট সৃষ্টি হইত তার গ্রন্থি উন্মোচনের তাগিদ হইতেই তাঁর যাবতীয় চিন্তন ও লেখন। কাজেই তিনি মানুষটি কেমন ছিলেন তাঁর লেখা হইতে তার সঠিক আভাস পাওয়া যাইবে না, বরং তিনি সতত কী হইতে চাহিয়াছিলেন তারই যথার্থ প্রতিরূপ হইল তাঁর রচনা। উহা কতকগুলি লক্ষ্য ও অভীপ্সার বিবরণ, এবং ঐ সকল লক্ষ্যের নিকষে ঘটনা ও স্থিতিসমূহের মূল্য কষিবার চেষ্টা। বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে যে সকল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাঁর লেখা হইতে স্বতঃই সেগুলির আন্দাজ পাওয়া যায়, এবং জীবনের প্রয়োগ-ক্ষেত্রে কম-বেশী সাফল্যের সহিত তিনি সেই সকল বাধা কিভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তারও প্রতিফলন ঐ লেখা। বর্তমান সংকলন-গ্রন্থখানি পাঠকালে পাঠককে এসব কথা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা হইলে তিনি তাঁর স্বীয় আদর্শের পথে এ বই হইতে প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভ করিতে পারিবেন।

এই সংকলনের উপস্থাপনায় যে ক্রম অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য দুই-এক কথা বলা প্রয়োজন। গান্ধীজীর জীবনের ভিত্তি ছিল ঈশ্বরে জলন্ত বিশ্বাস এবং সমগ্র মানবপরিবারের ঐক্যে আস্থা। এই দ্বিবিধ বিশ্বাস উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সুতরাং প্রথম পর্বে তাঁর ঈশ্বর-বিষয়ক চিন্তাকে সর্বাগ্রগণ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে। মানুষের উচ্চতম লক্ষ্য—তাহা ঈশ্বর, সত্য, অথবা মানবতা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন—সাধনের জন্য কতকগুলি সংযমবিধি মানিয়া চলিতে হয়। সেগুলি সকলের ক্ষেত্রেই একপ্রকার অতএব তদ্বিষয়ক রচনাসমূহ ঠিক তার পরেই অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় পর্বে আছে নানাবিধ দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে গান্ধীজীর মতামতের সার-সংক্ষেপ, সুতরাং এক হিসাবে এই পর্বকে গ্রন্থের অবশিষ্টাংশের সার-সংক্ষেপও বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অন্য পর্বে আছে এমন কতকগুলি অংশও এই কারণে মৌলিক ধ্যানধারণা-সম্পর্কিত এই পর্বের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

ধনের উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে অভিমত, সমাজের বর্তমান রীতি-পদ্ধতির সমালোচনা, এবং সমাজের বাঞ্ছিত পরিবর্তনের জন্য অবলম্বনীয় উপায়াদির নির্দেশ—এগুলির স্থান হইয়াছে চতুর্থ হইতে অষ্টম এই পাঁচটি পর্বে। নবম পর্বে আছে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শবাদের বিশ্লেষণ। দশম পর্বে পাওয়া যাইবে ভারতের রাষ্ট্রিক তথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য গঠনমূলক কর্মসূচীর বর্ণনা।

গান্ধীজীর বাণীর তাৎপর্য কেবলমাত্র ভারতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজ ও সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ পরিসরে সংঘটিত হিংসক সংঘর্ষাদির সমাধান-রূপেই যে কেবল তিনি তাঁর অহিংসার বিকল্প খাড়া করিয়াছিলেন তা নয়; আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সমাধানের একই পথ তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মনের দিক দিয়া অপ্রস্তুত মানবগোষ্ঠীর উপরে অহিংসা সহসা জোর করিয়া চাপানো যাইতে পারে না, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে বাধা আরও বেশী। এই কারণে অহিংসার সাধককে এই সকল ক্ষেত্রে খুব সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে, যেখানে যে বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে উহার সহিত পদক্ষেপ মিলাইয়া লইতে হইবে। ভারতের মৃত্তিকায় সত্যাগ্রহরূপী অহিংস আয়ুধের কিরূপে বিকাশ হইয়াছে এবং বাস্তবে উহা কিভাবে রূপায়িত হইয়াছে সত্যাগ্রহ-সম্পর্কিত অধ্যায়ে উহার বিবরণ গ্রথিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ভিন্নদেশীয়রা ভারতের অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হইতে পারিবেন। ভারতীয় রাজনৈতিক কর্মীর নিকট হইতে সত্যাগ্রহ অধিকন্তু হিসাবে যে আদর্শবাদ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা দাবি করে পরবর্তী অধ্যায়ে পাঠক উহার ব্যাখ্যান খুঁজিয়া পাইবেন

গ্রন্থের বাদ-বাকী অংশে বিভিন্ন বিষয়ে গান্ধীজীর মতামত সংকলিত হইয়াছে। সপ্তদশ পর্বে আছে ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক সম্পর্কে অভিমত; অপরপক্ষে অষ্টাদশ পর্বে বিধৃত হইয়াছে বিবাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণার বিবরণ। সমাজে নারীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত তদ্বিষয়ক ভাবনারও স্থান হইয়াছে এই পর্বটিতে। শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা ইহার পরের পর্বে আসিয়াছে। সর্বশেষ পর্বে আছে শিল্পকলা, সংগীত, স্বদেশী, সর্বসাধারণের সংস্থাসমূহের পরিচালন-ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা।

এইরূপে সংক্ষিপ্ত পরিসরের ভিতর গ্রন্থটিতে ব্যাপক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। পাঠক উহার পাঠে যত অগ্রসর হইবেন তত তাঁর নিজ কৌতূহলের বিষয়ে প্রায়শঃ আরও বেশী তথ্য জানিবার জন্য তাঁর মনে তৃষ্ণার সঞ্চার হইবে। কিছুকাল যাবৎ নবজীবন পাবলিশিং হাউস এক-একটি বিষয় ধরিয়া গান্ধীজীর রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। আগ্রহী পাঠক পূর্ণতর জ্ঞানের জন্য ঐ গ্রন্থপর্যায়ের অবশ্যই শরণ লইবেন, বিশেষতঃ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কিংবা 'হরিজন'-এর ফাইল যদি তাঁর আয়ত্তের মধ্যে না থাকিয়া থাকে। ঐ দুই পত্রিকায় যে অগণিত রচনা রহিয়াছে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাঠক যা পাইতে পারেন বর্তমান সংকলনে তারই একটি আভাসমাত্র ধরিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, উহার অধিক কৃতিত্ব বর্তমান সংকলন দাবি করে না।......

৩৭, বোসপাড়া লেন,
কলিকাতা ৩
২৬-১-১৯৫০

নির্মলকুমার বসু

প্রকাশকের নিবেদন

অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু সংকলিত 'Selections from Gandhi' গ্রন্থখানি বহুলপ্রচারিত। এই বইয়ের একখানি বাংলা অনুবাদ প্রকাশের প্রয়োজন অনেকদিন যাবৎ অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। ওই প্রয়োজন-পূরণচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে 'গান্ধী-রচনা-সংকলন' প্রকাশিত হইল। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে ইহাতে মূলের পূরাপূরি অংশ গৃহীত হয় নাই। কিছু কিছু অংশ বর্জিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থখানি আগাগোড়া অনুবাদ করিয়া পরিবেশন করিতে গেলে পুস্তকের আয়তন বৃহৎ হইত এবং মূল্যও তদনুপাতে অধিক হইত। সেই সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য মূলের কেবলমাত্র সেই সকল অংশ অনুবাদের জন্য ধার্য হইয়াছে যা গান্ধী-দর্শনের সামগ্রিক ধারণা লাভের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান এবং যা কোনমতেই সংকলন হইতে বাদ দেওয়া যাইত না। তাহাতেও অনুবাদের আকার যথেষ্ট বড় হইয়াছে—ইহাপেক্ষা অধিক সংকোচন সম্ভব হইল না।

অধ্যাপক বসুর অনুমোদনক্রমে মূলের এই প্রয়োজনীয় সংক্ষেপিতকরণ করিয়াছেন শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, পর্ব বা অধ্যায় বিভাগে এবং সংকলিত অনুচ্ছেদগুলির ক্রমিক বিন্যাসে সংখ্যার ধারাবাহিকতা নাই। পূর্বোক্ত সংক্ষেপিতকরণের জন্যই এইরূপ হইয়াছে। অর্থাৎ, ইংরাজী গ্রন্থে যেমন-যেমন ক্রমিক সংখ্যা আছে বাংলা সংকলনেও সেইরূপ রাখা হইয়াছে, নূতন করিয়া ক্রম সাজানো হয় নাই। মূলের সহিত অনূদিত গ্রন্থের অভিন্নতা রক্ষার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে, বলাই বাহুল্য। ইতি ২রা অক্টোবর ১৯৬৬।

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)-র প্রকাশিত অন্যান্য বই

মহাত্মা গান্ধী

মোহনমালা

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

নারী ও সামাজিক অবিচার (৩য় সংস্করণ)

সত্যই ভগবান (২য় সংস্করণ)

গীতাবোধ

পঞ্চায়েত রাজ

পল্লী-পুনর্গঠন

সর্বোদয়

আমার সমাজবাদ

অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি

উৎপাদক শ্রম

অছিবাদ

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

কর্মের সন্ধান

সর্বোদয়ের পথ

আত্মকথা (যন্ত্রস্থ)

পরিচিতি

[যে সকল গ্রন্থ, দৈনিক পত্রিকা বা সাময়িক পত্র হইতে মহাত্মাজীর রচনা সংকলিত হইয়াছে উহাদের পূর্ণতর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল]

অমৃতবাজার পত্রিকা—*The Amrita Bazar Patrika.*

আত্মকথা বা আত্মচরিত—*An Autobiography* or *The Story of My Experiments with Truth* by M. K. Gandhi. Navajivan Press, Ahmedabad, Second Edition, May 1940.

ইণ্ডিয়াস কেস ফর স্বরাজ—*India's Case for Swaraj* by Mahatma Gandhi, Edited and Compiled by W. P. Kabadi, February 1932.

ইয়ং ইণ্ডিয়া—*Young India,* 1919-1932.

এম. কে. গান্ধী : স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস—*M. K. Gandhi : Speeches and Writings.* Ganesh & Co., Madras, 1918.

কংগ্রেসের ইতিহাস—*History of the Congress* by Pattabhi Sitaramaiyya. All India Congress Committee, Allahabad, 1935.

গঠনকর্মের ধারা—*Constructive Programme : Its Meaning and Place* by M. K. Gandhi. Navajivan Press, Ahmedabad, 1944.

চরকায় স্বরাজ—*Swaraj through Charkha* by M. K. Gandhi. Compiled by Kanu Gandhi. All India Spinners' Association, Sevagram, Wardha, 15-9-1945.

ঠাকুর—*Young India* 1919-22. Published in book form by Tagore & Co. Madras, 1922.

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—*Satyagraha in South Africa* by M. K. Gandhi. First Edition, S. Ganesan, Madras, 1928. Second Edition, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1950.

নারী ও সামাজিক অবিচার—*Women and Social Injustice* by M. K. Gandhi. Navajivan Publishing House, Ahmedabad, Second Edition, 1945.

নীতিধর্ম—*Ethical Religion* by M. K. Gandhi. S. Ganesan, Triplicane, Madras S. E. 1930.

বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি—*Visva*-Bharati Quarterly, New Series, Published from Shantiniketan, West Bengal.

ভারতের গ্রামে গান্ধীজী—*Gandhiji in Indian Villages* by Mahadev Desai. S. Ganesan, Triplicane, Madras, 1937.

মডার্ন রিভিয়্যু—*The Modern Review*, October 1935.

যারবেদা মন্দির—*From Yervda Mandir* by M. K. Gandhi. Navajivan Press, Ahmedabad, 2nd edition, 1935.

শিক্ষার নবংববিধান—*Educational Reconstruction*, Hindustani Talimi Sangh. Segaon, Wardha, Second Edition, March 1939.

সরকারের সহিত পত্রালাপ—*Gandhiji's Correspondence with the Government* 1942-44. Navajivan Publishing House, Ahmedabad, Second Edition, September 1945.

সবরমতি—Sabarmati-1928. Being the Report of the First Annual Meeting of the Federation of International Fellowships held at the Satyagraha Ashram, Sabarmati. Jan. 13th to 15th, 1928. Published by the Federation of International Fellowships.

সিংহলে গান্ধীজীর সহিত—*With Gandhiji in Ceylon* by Mahadev Desai. S. Ganesan, Triplicane, Madras, 1928.

স্বাস্থ্যের উপায়—*A Guide to Health* by Mahatma Gandhi. Translated from the Hindi by Rama Iyer. M. A. S. Ganesan, Triplicane, Madras.

স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অব মহাত্মা গান্ধী—*Speeches and Writings of Mahatma Gandhi*, Fourth Edition. G. A. Natesan & Co., Madras.

হরিজন—*The Harijan* (1933 onwards)

হিন্দ্ স্বরাজ—*Hind Swaraj or Indian Home Rule* by M. K. Gandhi, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1944,

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড—*The Hindusthan Standard.*

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

পরমেশ্বর

১। সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, যে জীবনবিধাতার নির্দেশে এই বিশ্বসংসার চলিয়াছে, অটল বিশ্বাসে তাঁহাকে আশ্রয় না করিলে পরিপূর্ণভাবে বাঁচা সম্ভব নয়।

[হরিজন, ২৫-৪-৩৬, ৮৪]

ঈশ্বরই সত্য এবং প্রেম

২। এক অনির্বচনীয়, রহস্যময় শক্তি সর্বভূতে সঞ্চারিত হইতেছে। সে শক্তি আমি দেখিতে পাই না কিন্তু অনুভব করিতে পারি। এই অদৃশ্য শক্তি অনুভব করিতে পারা যায় কিন্তু যুক্তিপ্রমাণে জানা যায় না, কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তু হইতে ইহা স্বতন্ত্র। বুদ্ধি দিয়া এই রহস্য বুঝা যায় না। তবে বুদ্ধির ও যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিয়ৎপরিমাণে বুঝানো সম্ভব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-১০-২৮, ৪০]

৪। বর্ণনা বা সংজ্ঞার অতীত ঈশ্বরকে আমরা অন্তরে অনুভব করিতে পারি কিন্তু জানিতে পারি না। আমার হৃদয়ে ভগবান সত্য ও প্রেমরূপে প্রকট হন—ভগবানই নীতি, তিনিই ধর্ম। ভগবান নির্ভীকতারূপে প্রকাশ পান। আলোক ও প্রাণ ভগবানের দান কিন্তু তিনি ইহাদের অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছেন। ভগবান বিবেকরূপে আমাদের অন্তরে অবস্থিত। তিনিই নাস্তিকের নিরীশ্বরবাদ। বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে বুঝিয়া ফেলা যায় না। যাঁহারা তাঁহার স্পর্শের জন্য ব্যাকুল তাঁহাদের কাছে তিনি ব্যক্তিস্বরূপে প্রকাশিত হন। সকল সারের

তিনি সার। যাহারা তাঁর উপর ভরসা করিয়া আত্মসমর্পণ করে তাহাদের কাছে একমাত্র তিনিই আছেন। আমাদের জন্য তিনি অনেক সহ্য করেন। তিনি সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল আবার তিনি ভয়ঙ্কর। তিনি আমাকে যত স্বাধীনতা, যত অধিকার দিয়াছেন তাহার সীমা নাই আবার তাঁহার প্রভুত্বের তুলনা নাই। তিনিই কেবল আছেন। আমাদের অস্তিত্ব নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৩-২৫, ৮১]

৫। কেন আমি ঈশ্বর ও সত্যকে এক বলিয়া মনে করি জান? অনেকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। হিন্দুদের ধর্মপুস্তকে ঈশ্বরের যে সহস্রনাম আছে বাল্যকালে তাহাই বারবার উচ্চারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি বুঝিয়াছি এই সহস্রটি নামেই ঈশ্বরের নাম শেষ হয় নাই। আমরা বিশ্বাস করি, এবং আমি ইহা সত্য বলিয়া মানি, যে, সংসারে যত জীব আছে ঈশ্বরের তত নাম। তাই আমরা বলি ঈশ্বরের কোন নাম নাই; ঈশ্বর অসংখ্য আকারে বিরাজমান রহিয়াছেন, তাই আমরা বলি ঈশ্বর নিরাকার; কত না ভাষায় ঈশ্বর আমাদের কত কিছু বলেন, তাই আমরা বলি তিনি নির্বাক্। আমি ইসলাম ধর্ম বুঝিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম সেখানেও ঈশ্বরের অনেক নাম। যাঁরা বলেন ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, তাঁদের সহিতে আমি বলি ঈশ্বর ও প্রেম অভিন্ন। ঈশ্বর প্রেমময়। আমার অন্তরের গভীরে আমি বুঝি—ঈশ্বর হয়তো ঈশ্বরই কিন্তু সর্বোপরি ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। ভাষায় যদি ঈশ্বরের বর্ণনা করা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, আমার নিজ বিশ্বাসমতে ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করাই উচিত। দুই বৎসর পূর্বে আমি আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিয়াছি, 'সত্যই ভগবান'। 'ভগবান সত্যস্বরূপ' ও 'সত্যই ভগবান' এই দুই উক্তির মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধান লক্ষ্য করা উচিত।

একাদিক্রমে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নিরন্তর সত্যের সন্ধানে অবিচলিত প্রয়াসের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি। ইহাও

বুঝিয়াছি যে, অন্ততঃ ইংরেজী ভাষায় 'প্রেম' (love) শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহার হয়। মানুষের প্রিয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ বুঝাইতে যে 'প্রেম' শব্দ ব্যবহার হয় তাহা আমাদের অধঃপতনও ঘটাইতে পারে। অহিংসা অর্থে যে 'প্রেম' শব্দ ব্যবহৃত হয় জগতে সে 'প্রেমের' অনুরাগী লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু 'সত্য' এই শব্দটি এক ছাড়া দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই। নিরীশ্বরবাদীরাও সত্যের শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। সত্যকে খুঁজিয়া পাওয়ার আকুল আগ্রহে তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেও দ্বিধা করেন নাই। তাঁদের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁরা যথার্থ কাজই করিয়াছেন। এই যুক্তির বলেই আমি বুঝিয়াছি 'ভগবান সত্যস্বরূপ' না বলিয়া 'সত্যই ভগবান' বলা উচিত।

এই বিচারে চার্লস ব্র্যাড্‌ল'র নাম উল্লেখ করিতেছি। তিনি নিজেকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া প্রচার করিতে পছন্দ করিতেন। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানি তাহাতে আমি তাঁকে নাস্তিক বলি না। যদি তাঁকে বলি "ব্র্যাড্‌ল মহাশয়, আপনি ঈশ্বরবিশ্বাসী নহেন বটে, কিন্তু আপনি সত্যবিশ্বাসী", তিনি নিশ্চয়ই খুব সংকোচ অনুভব করিবেন। তারপর 'সত্যই ভগবান' এই যুক্তিতে আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অনেক উৎসাহী যুবক এই যুক্তিতে তর্কে নিরস্ত হইয়াছেন।

এ ছাড়া আরও ভাবিবার আছে। কত লক্ষ লক্ষ লোক ঈশ্বরের দোহাই দিয়া মানুষের উপর কতই না অত্যাচার করিয়াছে। বিজ্ঞান-সাধকেরাও সত্য ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া অনেক অমানুষিক নিষ্ঠুরতা করেন—যেমন জীবন্ত প্রাণীর দেহচ্ছেদ করিয়া নানা পরীক্ষা করা।

ঈশ্বরকে যেমন করিয়া হউক বর্ণনা করিতে গেলেই নানা বিপত্তি ঘটে। মানুষের মন সীমাবদ্ধ। আমরা যতই প্রয়াস করি না কেন, আমাদের সীমাবদ্ধ মন দিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে গেলে এই সসীমতা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই সংকীর্ণতা হইতে মুক্তির ইঙ্গিত হিন্দু দর্শনে

রহিয়াছে ; সেখানে বলা হইয়াছে, কেবল ঈশ্বরই আছেন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ইসলামের 'কলেমা' এই সত্য সবিস্তারে সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে। সেখানে বলা হইয়াছে 'কেবল ঈশ্বরই আছেন, আর কিছুই সত্য নয়।' সংস্কৃত শব্দ 'সত্য' বা 'সৎ' বলিতে 'আছে' মাত্র বুঝায়। এইসব কারণে এবং আরও অনেক কারণে আমি বুঝিয়াছি 'সত্যই ভগবান'। এই চিন্তাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সত্যস্বরূপ ভগবানকে জানিবার একমাত্র পথ—প্রেম বা অহিংসা। আমার বিশ্বাস সাধনের পথ ও সিদ্ধি একই ব্যাপার। ঈশ্বরকে প্রেম-স্বরূপ বলিতে আমি দ্বিধা করি না।

এখন প্রশ্ন হইল, সত্যের প্রমাণ কি ? প্রশ্নটি জটিল। আমার জীবনে আমি এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছি কিরূপে তাহাই বলি।

আমার অন্তরাত্মা যাহা বলেন তাহাই সত্য। প্রশ্ন হইতে পারে বিভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী সত্য উপলব্ধি করে কেমন করিয়া ? ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রত্যেকে স্বতন্ত্র মনোভাব লইয়া চিন্তা করে এবং সকল লোকের মন একই পর্যায়ে আসে নাই। ইহার ফলে এরূপ ঘটিতেছে যে একজনের কাছে যাহা সত্য, অপরের কাছে তাহা অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বিষয়ে যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, সত্যের পরীক্ষার জন্য কয়েকটি বিশেষ নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। বিজ্ঞানের গবেষণা করিবার পূর্বে তাহার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করিবার শিক্ষা করা প্রয়োজন এবং যথাযোগ্য পন্থায় গবেষণা চালানো দরকার। সেইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সত্য নির্ণয় করিতে হইলে বহু আয়াসে সংযম অভ্যাস দ্বারা যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। একই নিয়মের বলে অন্তরাত্মার বাণী শুনিতে হইলে তাহার পূর্বে যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া লইতে হইবে।

বহু সাধকের প্রজ্ঞা হইতে এই ধারণা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি সত্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভজনা করিবেন তাহাকে কয়েকটি

ব্রত পালন করিতে হইবে। তার এক দিকে সত্যনিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য—কারণ সত্য ও ঈশ্বরের একান্ত নিষ্ঠার বদলে অন্য দিকে আকর্ষণ থাকিলে সাধন ব্যাহত হইবে। অপর দিকে প্রয়োজন অহিংসা, দারিদ্র্য, ক্লেশ এবং অপরিগ্রহ। যদি কেহ এই পঞ্চব্রত গ্রহণ করিতে না পারে তাহা হইলে সত্যের সন্ধানে না যাওয়াই ভালো। এ ছাড়া আরও কিছু কিছু নিয়ম মানা প্রয়োজন হয়। তার আলোচনা এখানে না করাই ভালো। এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সকলেই অন্তরাত্মার বাণী শুনিতে পায় এ কথা ঠিক নয়। অধুনা প্রত্যেক মানুষই নিজের মনকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, যার ফলে মোহগ্রস্ত মনুষ্যসমাজ অসত্যের ধোঁকায় দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিতেছে। বিনীতভাবে আমি এইটুকু নিবেদন করিতে চাই যে, অপরিসীম নম্রতা না থাকিলে সত্যের সাধনে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। যদি সত্যসাগরে ভাসিয়া থাকিতে চাও, লঘুতা অর্জন করিবার জন্য নিজেকে একেবারে 'কিছু-না' অবস্থায় আনিতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩১-১২-৩১, ৪২৭]

ভগবান সত্যস্বরূপ ও নীতিস্বরূপ

৬। ঈশ্বরকে আমি ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না। আমার বিচারে সত্যই ভগবান। ভগবান ও তাঁর বিধান এই দুইকে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবা যায় না। জাগতিক ক্ষেত্রে রাজা ও তাঁর নীতি দুটি স্বতন্ত্র বস্তু। ভগবান চিন্ময়, স্বয়ং নীতি। এইজন্য ঈশ্বর নিজের বিধান লঙ্ঘন করিতেছেন, এরূপ হইতে পারে না। আমাদের কাজের বিধান স্থির করিয়া দিয়া তিনি দূরে অবস্থান করিতেছেন, এরূপ অবস্থাও সম্ভব নয়। যখন আমরা ঈশ্বরের দোহাই দিয়া বলি যে, 'ঈশ্বর যাহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছি' তখন আমরা মানুষের মত ঈশ্বরে কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলি। অথচ ঈশ্বর ও তাঁর বিধান সর্বত্র বিরাজমান এবং সকল কিছুই পরিচালিত

করিতেছেন। আমি বিশ্বাস করি না যে, সর্বক্ষেত্রে আমাদের সকল ক্ষুদ্র ইচ্ছা পূরণ করিতে তিনি ব্যস্ত—যদিও তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তৃণটি জন্মে না, গাছের পাতাটি নড়ে না।

বহুলোক যখন একটি জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রপথে চলিতে থাকে, তাহাদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তির সেই অবস্থায় যেটুকু ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে, সংসারে আমাদের স্বাধীনতা তার চেয়ে বেশী প্রবল নয়।

"ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করিলে আপনি কি অধিকতর স্বাধীনতা বোধ করেন?"

—অবশ্যই করি। জাহাজে বহু যাত্রীর মধ্যে থাকিয়া যে নিঃসহায় ভাব আসে তার তুলনায় অনেক বেশী মুক্ত বলিয়া মনে হয়। যদিও আমি জানি যে জাহাজের একজন যাত্রীর যেটুকু স্বাধীনতা থাকে, আমার প্রকৃত স্বাধীনতা তার চেয়েও কম; তবুও গীতার যে মূল উপদেশ আমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, মানুষের সামান্য স্বাধীনতারও যথাযোগ্য ব্যবহার করিবার যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে। তাহারই গৌরবে বিশ্বাস করি, মানুষ নিজের ভাগ্য নির্ণয় করিতে পারে। কিন্তু ফলে আমাদের অধিকার নাই। যে মুহূর্তে মানুষ মনে করে যে ফলে তাহার অধিকার আছে, সেই মুহূর্তেই তাহার পতন অনিবার্য।

[হরিজন, ২৩-৩-৪, ৫৪]

সত্যের প্রকৃতি

৮। সত্য নিজেকে প্রকাশিত করে। অজ্ঞানের আবরণ সত্যকে ঢাকিয়া রাখে। আবরণ মোচন করা মাত্রই সত্য নিজের প্রভায় প্রকাশিত হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৫-২৬, ১৮৯]

কোন্ পথে সত্যকে জানা যায় ?

১০। আমাদের জীবনের গতি বড়ই জটিল। সত্য ও অহিংসার সাধনে নানা সমস্যা আসিয়া দেখা দেয়, যাহার সমাধান খুবই দুরূহ। অটল সাধনা ও ঈশ্বরে নীরব আত্মসমর্পণের দ্বারাই সত্যকে জানা যায় ও সেই সত্যকে প্রকট করার জন্য সত্যাগ্রহ বা অধ্যাত্মশক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। সুহৃদ্‌বর্গকে এইটুকু মাত্র নিবেদন করিতে পারি যে, সত্যের অনুসরণে কোন চেষ্টাই আমি বাকি রাখি না। সত্যের সাধনে যে দীর্ঘ মনোরম পথে সকলে চলিয়া থাকে, বহু প্রযত্ন ও নীরব প্রার্থনা এই দুইয়ের সহায়তায় সেই পথে চলিয়াছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৬-২১, ১৭৪]

আত্মবিশ্বাসের স্বীকৃতি

১৩। কায়মনোবাক্যে পূর্ণ সত্যে ও পূর্ণ অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইবার বাসনায় আমার দীন আত্মা ব্যাকুল হইয়া সর্বপ্রযত্ন করিতেছে, কিন্তু যে আদর্শকে আমি সত্য বলিয়া জানি সেই আদর্শে পৌঁছাইতে পারিতেছে না। এই সংগ্রামে কষ্ট অনেক, কিন্তু সে কষ্টও আমার পক্ষে সুখদায়ক। সাধনপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই পথ চলিবার শক্তি বাড়িয়া যায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৪-২৫, ১২৬]

১৬। আমি শুধু আভাসে এইটুকু মাত্র বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, অনন্ত ভগবৎসত্তার কাছে পূর্ণ আত্মনিবেদনের দ্বারা আমি সেই অসীমশক্তিসম্পন্ন কুম্ভকারের হাতে মাটির তালের মত হইতে চাহিয়াছি, আমার মধ্যে যে অধম জীবাত্মা আছে তাহা যেন সেবার কাজে আর বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে, আমি যেন ক্রমে পূর্ণ সেবার অধিকারী হইয়া উঠিতে পারি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-১১-২১, ৩৭৭]

১৯। কেবলমাত্র বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়া যে ভগবানকে বুঝা যায় (যদি ভগবানকে এরূপে বুঝা সম্ভবও হয়) সে ভগবানকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা সম্ভব নয়। আমাদের হৃদয়ের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের সমগ্র অন্তরকে পবিত্র ও ধন্য করেন। সাধকের প্রতিটি কার্যে প্রতিটি মিলনে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়া আমরা যতটুকু জানিতে পারি তার চেয়ে বহুগুণে তীব্র বহুগুণে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারাই এরূপ ঘটা সম্ভব ; ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা অনুভব করি তাহা যতই প্রকৃত বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হউক না কেন তাহা ভ্রান্ত হওয়া সম্ভব, অনেক সময় হয়ও। ইন্দ্রিয়াতীত সেই পরম উপলব্ধি লাভ করিলে আর ভুল হওয়ার ভয় থাকে না। এই সত্য প্রমাণ করিতে বাহিরের সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হয় না ; যাঁরা অন্তরে যথার্থ ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁদের চরিত্র ও আচরণের মহিমায় ও মাধুর্যে তাঁদের উপলব্ধি উচ্ছলিত হয়। পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জনসমাজে যে ধ্যানী, জ্ঞানী ও সাধকের ধারা বহিয়া আসিতেছে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই সত্যের প্রমাণ রহিয়াছে। এই পরম প্রমাণ উপেক্ষা করিলে মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করা হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-১০-২৮, ৩৪০]

পূর্ণতা ঘটা সম্ভব নয়

২০। যতদিন আমরা মর্ত্য দেহে আবদ্ধ হইয়া আছি ততদিন পূর্ণসত্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কেবল কল্পনায় সত্যকে অনুমান করিতে পারি মাত্র। এই ক্ষণস্থায়ী মরদেহের সহায়তায় পরমসত্যের অনন্তরূপ মুখোমুখি দেখা সম্ভব নয়। এই কারণেই আমাদের শেষ ভরসা ঈশ্বরে বিশ্বাসই আমাদের প্রকৃত অবলম্বন।

যারবেদা মন্দির হইতে, ৭]

২৩। আমাদের এই যে দেহ ধারণ করা এ তো ক্ষণিকের জন্য। অনন্তকালের তুলনায় আমাদের শতবর্ষের জীবন কতটুকু। কিন্তু যদি আমরা অহমিকার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মহামানবতার সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ি তাহা হইলে আমরা ইহার মহত্ত্বের অংশীদার হইতে পারি। যদি মনে করি আমি নিজেই একটা মূল্যবান কিছু তাহা হইলে ঈশ্বর ও আমার মধ্যে একটি অন্তরায় গড়িয়া তুলি। অহমিকা লোপ পাইলে তবে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করা সম্ভব। জলবিন্দু যখন সমুদ্রে মিশিয়া যায় তখনই সে বিরাটের মহিমার অংশ পায় কিন্তু সে মহিমা জলবিন্দু উপলব্ধি করিতে পারে কি? বিন্দু যদি নিজ স্বাতন্ত্র্যের গৌরবে একাকী চলিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে সে ক্ষণিকেই শুকাইয়া যায়। জীবনকে বুদ্‌বুদের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে—তাহাতে সত্যের অপলাপ হয় না।

সেবার জীবনে নম্রতাই সম্বল। যিনি সেবার উদ্দেশ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত, নিজের জন্য স্বর্গ কামনা করার সময়ও তিনি পান না। জড়তাকে নম্রতা বলিলে ভুল করা হয়, হিন্দুধর্মে এ ভুল ঘটিয়াছে। সদাজাগ্রত কর্মপ্রচেষ্টা দিয়া কেবল মানবতার সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োগ করিতে পারিলে তবে যথার্থ নম্রতা অর্জন করা সম্ভব। ঈশ্বর ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়া সততক্রিয়াশীল। যদি আমরা ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করিতে বা তাঁহার সাযুজ্যলাভ করিতে চাই তাহা হইলে তাঁর মতই অবিরাম কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলবিন্দুর ক্ষণিকের বিরাম সম্ভব কিন্তু মহাসাগরের অঙ্গীভূত হইলে আর বিরতি থাকে না। আমাদেরও সেইরূপ ঘটে। যে মুহূর্তে আমরা মহামানবতার স্বরূপ বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরকে আশ্রয় করি, আর আমাদের কোন বিরাম থাকে না, বিরতির প্রয়োজনও থাকে না। আমাদের নিদ্রাও কাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় কারণ নিদ্রাকালেও আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরচিন্তা জাগরূক থাকে। এই বিরামহীনতাই

যথার্থ বিরাম। এই অন্তহীন আত্মনিবেদনই পরম শান্তির উপায়। পূর্ণ আত্মনিবেদনের যে চরিতার্থতা তাহা বর্ণনা করা যায় না কিন্তু উপলব্ধি করা সম্ভব। সে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন বহু আত্মত্যাগী সাধক, আমরাও সেই পরমার্থ লাভ করিতে পারি। এই লক্ষ্য সাধনের জন্যই সত্যাগ্রহ আশ্রমে আমরা সকলে প্রযত্ন করিতেছি। আমাদের সকল বিধি সকল প্রয়াস আমাদিগকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য রচিত হইয়াছে। সত্যের সাধন করিতে থাকিলে আমাদের অজ্ঞাতসারে একদিন আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া যাইব।

[যারবেদা মন্দির, ৬৮]

নিজের উপলব্ধি

২৬। ঈশ্বরের বিধান আমার দৃষ্টিতে কোনো বিশেষরূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আমার বিশ্বাস ঈশ্বর প্রতিটি দিন প্রতিটি মানুষের কাছে প্রকট হইতেছেন; কিন্তু অন্তরলোকের সেই ক্ষীণ সংগীত আমরা শুনিতে চাহি না। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ অহরহ আমাদের সম্মুখে বিরাজমান রহিয়াছে, আমরা চক্ষু মুদিয়া থাকি বলিয়া দেখিতে পাই না। সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে আমি সর্বদাই অনুভব করিতেছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৫-২১, :৬২]

আমার চিন্তা উপস্থিত সমস্যা লইয়া

২৮। আমাদের চারিদিকের দুর্ভেদ্য অন্ধকার দূরের কিছু দেখিতে দেয় না, কেবল অতিনিকটের, একেবারে বর্তমানের সামান্য কিছু লইয়া বাঁচিতে হয়, এ অভিশাপ নয়—উহা ভগবানের আশীর্বাদ। ভগবান আমাদের যে শক্তি দিয়াছেন তাহার বলে আমরা কেবল এক পা মাত্র অগ্রসর হইতে পারি। যদি ঈশ্বরের জ্যোতি সম্মুখের এই একপদ ভূমিমাত্রই আলোকিত করিয়া আমাদের যাত্রা সহজ করিয়া

দেয় তাহাই যথেষ্ট হইবে। নিউম্যানের সঙ্গে সুর মিলাইয়া আমরাও যেন গাহিতে পারি—

করিবার যেইটুকু রহিয়াছে সম্মুখে আমার
সাধি যেন সেই মাত্র, পরে অন্য আর।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলিয়া দিতেছে, পরবর্তী পদক্ষেপ কোথায় করিব তাহা আবার যথাসময়ে দেখিতে পাইব। ইহাও বলা যায়, চারিদিকের যে অন্ধকারকে আমরা দুর্ভেদ্য বলিয়া মনে করি তাহা তত দুর্ভেদ্য নয়। কেবল যখন আমরা বর্তমানে মনোনিবেশ না করিয়া দূর ভবিষ্যতের জন্য খুবই ব্যস্ত হইয়া পড়ি তখনই আমাদের দিগ্‌ভ্রম ঘটে।

[হরিজন, ২০-৪-৩৪, ৭৮]

জীবন ও মৃত্যু

২৯। জীবনকে ঘেরিয়া মৃত্যু বিরাজ করিতেছে। নিজের অভীষ্ট সাধনে ব্যাকুল হইয়া প্রযত্ন করিয়া কী লাভ যখন আমরা জানি যে চক্ষের পলকে আমাদের সকল গড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, অথবা ক্ষণিকে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবন মৃত্যুতে পরিসমাপ্ত হইতে পারে? আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? যদি আমরা সগৌরবে অন্তর হইতে বলিতে পারি "আমরা ভগবানের আদেশে তাঁরই কাজ করিতেছি" তাহা হইলে আর ভয় নাই—আমরা নিরাপদে সকল বিপদ অতিক্রম করিব। তাঁর কাজ, তাঁর সেবা অমর। তাঁর কাজে মৃত্যু হয় অলীক। কেবল তাঁরই কাজে ধ্বংস ও মৃত্যুর অস্তিত্ব লোপ পায়। সেখানে ভয়ের ভীষণতা থাকে না; কারণ অক্ষয় জীবনে মৃত্যু আর মারে না, পরিবর্তন ঘটায় মাত্র।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-৯-২৬, ৩৩৩]

প্রার্থনা

৩১। প্রার্থনা সকল ধর্মের সার, সকল সাধনের প্রাণস্বরূপ। তাই মানুষের জীবন হইয়া উঠুক প্রার্থনাময়, ধর্মই মানুষের অবলম্বন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১-৩০, ২৫]

৩৪। মানুষের সেবার জন্যই আমাদের জন্ম; খুব সজাগ না থাকিলে সার্থক সেবা করা সম্ভব নয়। আমাদের মনে সর্বদা আলোতে ও অন্ধকারে, ভালোতে ও মন্দে সংগ্রাম চলিয়াছে—অন্ধকার ও মন্দের প্রভাব এড়াইবার একমাত্র উপায় হইল প্রার্থনা। যিনি ঈশ্বরে ভরসা রাখেন তিনি শান্তি দিবেন ও শান্তি পাইবেন। আর যে ব্যক্তি প্রার্থনায় নত হইতে জানেন না তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে দুঃখ। তিনি সংসারে আরও দুঃখ সৃষ্টি করেন। প্রার্থনা করার ফলে পরলোকে কি লাভ হয় জানি না; তবে এই পৃথিবীতে প্রার্থনার সুফল অশেষ। জীবনের দৈনন্দিন কাজে শৃঙ্খলা, শান্তি ও আরামের একমাত্র উপায়, জীবন প্রার্থনাময় করা। আমরা সত্যের সন্ধানে সত্যনিষ্ঠ হইয়া এই আশ্রমে সমবেত হইয়াছি। প্রার্থনায় আমরা বিশ্বাস করি এই কথাই বলিয়া থাকি, কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রার্থনাকে জীবনের মূলে স্থান দিতে পারি নাই। অন্যান্য বিষয়ে আমরা যত মন দিয়াছি প্রার্থনাতে তাহার অংশ মাত্রও দিই নাই। অবশেষে একদা মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম আমরা এই কর্তব্য পালনে প্রচুর অবহেলা করিয়াছি। তখন আমি কঠোর বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করার প্রস্তাব করিলাম। আশা করি ইহাতে সুফল হইয়াছে। মূল কাজের দিকে মন দিলে প্রাসঙ্গিক সকল কিছু আপনা হইতে সুবিন্যস্ত হইয়া যায়। এ কথা বুঝা কিছু শক্ত নয়। বর্গক্ষেত্রের এক কোণ সমকোণ করিতে পারিলে চারি কোণই সমান হইয়া যায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১-৩০, ২৬]

ঈশ্বরের বিধান

৩৫। "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না" এ কথা বলা কিছুই কঠিন নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারি। তিনি দেখেন আমাদের কাজ। কাজের ক্ষেত্রে যদি বিচ্যুতি ঘটে তাহা হইলে তাঁহার বিধান কঠোর বিচার করিতে কার্পণ্য করে না। এ শাস্তি তিনি দেন রোষের বশে নয়, আমাদিগকে শোধন করিবার জন্য।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৯-২৬, ৩৩৩]

ঈশ্বরের কৃপা

৩৬। পৃথিবীতে ঈশ্বরের চেয়ে কঠোরতর প্রভু আর নাই। অন্তরের গভীরতম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি বিচার করেন। যখন মনে হইবে তোমার বিশ্বাস হারাইতেছ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহন তোমার দেহ তোমাকে ভ্রষ্ট করিতেছে, তুমি ব্যর্থতায় ডুবিয়া যাইতেছ, তখন সহসা দেখিবে তোমার অজ্ঞাতে তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। তখন বুঝিবে, তোমার বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে—তাঁর কল্যাণ হস্তে তিনি তোমাকে নিকটে টানিয়া লইবেন। কার জন্য? তোমার জন্য নয়—তাঁর বিধানের মহিমার জন্য।

[স্পীচেস্ অ্যাণ্ড রাইটিংস অব্ মহাত্মা গান্ধী, নটেশন, ১০৭৯]

পথে চলিয়া আমরা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বা সত্যের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি। দুঃখ তো থাকেই, শান্তিও বাড়ে। মনে সাহস আসে, নূতনের সন্ধানে মন ছুটিয়া চলে। ক্রমে এই ক্ষয়শীল সংসারে অক্ষয় বস্তুগুলি বাছিয়া লইতে শেখা যায়; আমাদের স্বার্থবোধ ও অহমিকা চলিয়া যায়, তার স্থলে শ্রদ্ধা আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়; সংসারের মোহ-বন্ধন ক্ষয় পায়, তার সঙ্গে সঙ্গে মনের পাপও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

[যারবেদা মন্দির, ১০]

নির্ভয়

৪৭। জীবমাত্রেই ভয়ের বশ। ব্যাধির ভয়, আঘাত বা মৃত্যুর ভয়, ধন হারানোর ভয়, প্রতিষ্ঠা হারানো বা অন্যের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়—নানা ভয়ের বিড়ম্বনা লইয়া আমরা বাঁচিয়া থাকি। এই সকল বাহ্য ভয় হইতে মুক্তি পাইলে তবেই নির্ভয় হওয়া যায়।

[যারবেদা মন্দির, ৪]

৪৮। বাহিরের এই যে ভয়—এই ভয় পরিহার করিতে হইবে। কিন্তু অন্তরে যে সকল বৈরী বাসা বাঁধিয়া আছে তাদের সব সময়েই ভয় করা দরকার। ষড়রিপু, যারা মুহূর্তও আমাদিগকে ছাড়ে না, তাদের ভয় করাই ধর্ম। আমাদের ঘরের শত্রুকে বশ করিতে পারিলে বাহিরের ভয় আপনিই চলিয়া যাইবে। এই সব ভয় আমাদের দেহ-বুদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দেহের জন্য মোহ মমতা চলিয়া গেলে এরাও আমাদের ছাড়ে। বিচার করিলে বুঝা যায়, বাহিরের এই সকল ভয় আমাদের মনেরই ভিত্তিহীন রচনা মাত্র। যখন ধনের জন্য, গৃহপরিবারের জন্য, নিজ দেহের জন্য মমতা থাকে না তখন অন্তরে আর ভয়ের স্থান থাকে না। সংসারে কিছুই আমার নিজস্ব নয়। কারণ আমরা নিজেরাও ভগবানের দানমাত্র। যখন আমরা সকল মালিকানা বিসর্জন দিয়া নিজেকে ধরণীর ধূলিবৎ জ্ঞান করিয়া ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণ নিযুক্ত করিতে

পারিব তখন ক্ষণিকের কুয়াসার মত ভয়ের মেঘ কাটিয়া যাইবে। সাক্ষাৎ সত্যনারায়ণের দেখা পাইয়া পরমাশান্তির স্নিগ্ধ আলোকে বিচরণ করিব।

[যারবেদা মন্দির, ৪৩]

৪৯। সত্যের অনুসরণেই পূর্ণ ভক্তি প্রকট হয়। এই পথেই ভগবানের সাক্ষাৎ মেলে, তাই এই পথে ভয়ের কিছুই নাই, পরাজয়ের ভয়ও থাকে না। এই রক্ষাকবচ হাতে থাকিলে মৃত্যুও অমৃতলোকের দ্বারস্বরূপ হয়।

[যারবেদা মন্দির, ৫]

৫০। হিংসার লড়াইয়ের জন্য শিখিতে হয় মারণ-বিদ্যা—মরিবার বিদ্যাই অহিংস সংগ্রামের কৌশল। ভয়ের কারণ সেই ভয়ংকরকে নষ্ট করাই হিংসার লক্ষ্য; ভয় হইতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা সে করে না। অহিংসা সেই ভয়কেই ঘুচায়, তাই তার কাছে সেই ভয়ংকরের অস্তিত্বই নাই। মনের ভয় দূর করার জন্য অহিংসার সাধককে সর্বোত্তম ত্যাগের শক্তি অর্জন করিতে হয়। তার ধন, সম্পত্তি বা প্রাণ গেলেও সে পশ্চাদ্‌পদ হয় না। যিনি সকল ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই তাঁর পক্ষে পূর্ণ-অহিংসা পালন করা সম্ভব নয়।

[হরিজন, ১-৯-৪০, ২৬৮]

অপরিগ্রহ

৫১। অহিংসাকে ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলে সংসারে দীনতম ব্যক্তিও যাহা না পায় এমন কিছু কামনা করা উচিত হইবে না।

[সিংহলে গান্ধীজীর সহিত, ১০২]

৫২। আগামী কালের জন্য লোকে সঞ্চয় করে। যিনি সত্যান্বেষী, যিনি প্রেমের বিধান মানিয়া চলেন, তিনি আগামী কালের জন্য সঞ্চয় করিতে চাহিবেন না। ঈশ্বর তো সঞ্চয় করেন না। বর্তমানে যেটুকু প্রয়োজন, তিনি সেই পরিমাণই সৃজন করেন। যদি আমরা ঈশ্বরের

দয়াতে বিশ্বাস রাখি তাহা হইলে ইহাও আমাদিগকে মানিতে হইবে যে, যখন যেটুকু আমার প্রয়োজন তাহা তিনিই যোগাইবেন। যখন আমরা পাখীর মত গৃহের আশা করিব না, পরের দিনের খাদ্য বা বস্ত্রের জন্য চিন্তা করিব না, তখনই পূর্ণ অপরিগ্রহ বা অ-সংগ্রহ সাধন হইবে। মানুষের আহারের প্রয়োজন হইবেই, কিন্তু তার ভাবনা ভগবানের— তিনিই তার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

[যারবেদা মন্দির, ৩৪]

৫৪। প্রেম ও সম্পত্তি-বুদ্ধি এ দুইয়ের মধ্যে একটা বিরোধ রহিয়াছে। তত্ত্ববিচারের দিক্ দিয়া দেখিলে, যেখানে প্রেম পূর্ণতা লাভ করে সেখানে মালিকানার প্রশ্ন একেবারে থাকে না। আমাদের শেষ সম্বল এই দেহ। মানুষ যেখানে মানুষের সেবায় এই দেহকে উৎসর্গ করিতে পারে সেখানেই পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ অসংগ্রহের সম্ভাবনা ঘটে।

তত্ত্ববিচারের দিক্ দিয়া এরূপ সম্ভব। বাস্তব জীবনে পূর্ণ প্রেমের সম্ভাবনা কোথায়? সকল সম্পত্তি ছাড়া সম্ভব, দেহকে তো ত্যাগ করা যায় না। কোনোদিনই মানুষ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তবুও তাহার ধর্ম পূর্ণতার জন্য প্রয়াস করা। সুতরাং যতদিন জীবন আছে ততদিন প্রেমে ও ত্যাগে পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও আমাদিগকে সেই অসম্ভবের আশায় ছুটিতে হইবে।

(মডার্ন রিভিউ, ১৯৩৫, ৪১২)

প্রেমের জন্য দুঃখ বরণ

৫৫। সত্যাগ্রহ প্রয়োগের গোড়াতেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সত্যের অনুসরণ করিয়া চলিলে বিপক্ষকে কোন আঘাত করা চলে না। ধৈর্য ও ভালোবাসা দিয়া তাহার ভ্রম সংশোধন করাই উচিত।

আমার কাছে যাহা সত্য অন্যের কাছে তাহা সেরূপ প্রতীয়মান না হইতে পারে। আর ধৈর্য মানেই কষ্ট সহ্য করা। এই বিচারে প্রমাণ

হয় যে সত্যকে প্রকট করিতে বিপক্ষকে দুঃখ দেওয়া বিধি নয়, নিজেকেই দুঃখ বরণ করিতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, নভেম্বর ১৯১৯]

৫৬। সত্যাগ্রহী নিজ চরিত্রের দুঃখবরণের শক্তিতে বিপক্ষকে স্বমতে আনিতে চায়। সত্যাগ্রহীর চরিত্র যত শুদ্ধ হইবে, তাহার তপস্যা যত বেশী হইবে—কাজ তত দ্রুত সম্পন্ন হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৯-২৪, ৩০৬]

৫৮। যে আমাকে ভালোবাসে তাকে আমি ভালোবাসি, এ তো অহিংসা নয়। যে আমাকে ঘৃণা করে, হিংসা করে, তাকে ভালোবাসাই অহিংসা। প্রেমের এই নীতি পালন করা যে কত কঠিন তাহা আমি জানি। যা কিছু মহৎ, যা কিছু কল্যাণকর, তার সাধন কঠিন না হইয়া পারে না। যে আমাকে ঘৃণা করে তাকে ভালোবাসাই সবচেয়ে কঠিন। ভগবানের কৃপা লাভ করিলে, যদি আমরা কঠিন কাজও করিতে চাহি তাহা হইলে সে কাজও সহজ হইবে।

[৩১-১২-৩৪ তারিখের ব্যক্তিগত পত্র হইতে]

আত্মসংযম

৬২। স্ত্রী-পুরুষের প্রেমে সৌন্দর্য আছে, মহত্ত্ব আছে, এতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু এর সার্থকতা কেবল সন্তানলাভে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহার করিলে ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হয়—মানুষের প্রতিও অন্যায় করা হয়।

[হরিজন, ২৮-৩-৩৬, ৫৩]

৬৪। যে ব্যক্তি তার সকল চেষ্টা স্বার্থলেশহীন সত্যের অনুসরণে নিয়োগ করিতে চায়, সন্তান উৎপাদন ও পরিবার প্রতিপালনের মত স্বার্থপর কাজের সময় সে কোথায় পাইবে?

[যারবেদা মন্দির, ১৪, ৬০০-৬০৭]

নিজ নিজ বিবেকের নির্দেশে চলিলে কল্যাণ হইবে। জোর করিয়া নিজের পথে অন্যকে আনিতে গেলে সকলের নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী চলার পথে দুঃসহ বাধা সৃষ্টি হইবে মাত্র।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৯-২৬, ৩৩৪]

৭১। অহিংসার সর্বপ্রথম শিক্ষাই হইল বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি ভদ্র আচরণ করা এবং তাঁহাদের মত সাগ্রহে বুঝিতে চেষ্টা করা।

[হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২০-৭-৪৪]

৭২। সত্যের প্রতি নিষ্ঠাই আমাকে অন্যের সহিত আপোষ করিয়া চলিতে শিক্ষা দিয়াছে। এর ফলে আমার জীবন বিপন্ন হইয়াছে, বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু সত্য পাথরের চেয়ে কঠিন, আবার ফুলের মত কোমল।

[আত্মকথা, ১৮৪]

সত্যের প্রচার

৭৩। প্রশ্ন—যেহেতু আমরা মানিয়া লইয়াছি যে সত্যের প্রতীতি সীমাবদ্ধ, সুতরাং সত্যের অনুসরণ নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া জনসাধারণ্যেও প্রচার না করাই ভালো নয় কি ?

উত্তর—চেষ্টা করিয়াও সত্যকে খুশিমত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আটকাইয়া রাখা যায় না। সত্যের প্রতিটি প্রকাশের মধ্যেই স্বতঃপ্রচারিত হওয়ার বীজ নিহিত রহিয়াছে। সূর্য ইচ্ছা করিলেও নিজের আলোক ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

[মডার্ন রিভিউ, ১৯৩৫, ৪১৩]

৭৪। আমরা চাই বা না চাই, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রভাব আমাদের জীবনে ক্রিয়া করে। হয়তো বাক্যে তাহা প্রকাশিত হয় না। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রচার বাক্যদ্বারা সুষ্ঠুভাবে হওয়াও সম্ভব নয়। উপলব্ধির গভীরতা চিন্তার অপেক্ষাও বেশী।

[সবরমতি, ১৯২৮, ১৯]

জীবনবিধানের ধারণা

৭৫। এই পরিবর্তনশীল, মরণশীল সংসারে, আধ-আলো, আধ-অন্ধকারে দেখার মত, এক স্থির চৈতন্যশক্তিকে আমি অস্পষ্ট দেখিতে পাই ; যিনি সকলকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি সৃষ্টি করিতেছেন, লয় ঘটাইয়া আবার সৃজন করিতেছেন। সেই জ্ঞান-স্বরূপ শক্তি বা চৈতন্যই ঈশ্বর। ইহা ছাড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুই স্থির থাকে না বা থাকিতে পারে না, তাই একমাত্র তিনিই আছেন।

এই শক্তি কি কল্যাণময় না অকল্যাণ বিধাতা ? আমার বিচারে পরম কল্যাণময়ের প্রকাশই দেখিতে পাই, মৃত্যুর মধ্যে জীবনপ্রবাহ চলিয়াছে, অসত্যের মধ্যে সত্য চিরবিরাজমান, অন্ধকারের মধ্যে অনির্বাণ জ্যোতিপুঞ্জ আলো দিতেছে। তাই আমি জানিয়াছি ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, তিনিই সত্য, তিনিই আলোক, তিনিই প্রেম, তিনি পরম মঙ্গলময় প্রভু।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-১০-২৮, ৩৪০]

৭৭। আজও যে জগতে এত লোক বাঁচিয়া আছে ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, সংসার হিংসাশক্তির ভরসায় বাঁচে না—সংসারের আশ্রয় সত্য বা প্রেম। বহু ভীষণ যুদ্ধের পরেও পৃথিবীতে মানুষ বাঁচিয়া থাকিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ দিতেছে যে, সত্য বা প্রেমই সংসারের প্রভু।

বহু সহস্র, হয়তো বা বহু লক্ষ লোক এই চৈতন্যশক্তির ক্রিয়াশীল অস্তিত্বের ভরসাতেই বাঁচিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাত এই প্রেমশক্তির বিধানে মুছিয়া যাইতেছে। শত শত জাতি শান্তিতে বাস করিতেছে। ইতিহাস এই কাহিনী বলে না বা বলিতে পারে না। যখন এই প্রেমশক্তির বা অধ্যাত্মশক্তির সুবিন্যস্ত ক্রিয়া ব্যাহত হয়, ইতিহাস কেবল সেই দুর্দিনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে। দুই ভাই বিবাদে মাতিল। একজন অনুতাপবিদ্ধ হইয়া অপরের প্রেমশক্তি জাগাইয়া তুলিল। আবার দুইজনে শান্তিতে

বাঁচিতে থাকিল। এ কাহিনী কোন ঐতিহাসিক লিখিয়া রাখে না। যদি ঘটনা এরূপ না হইয়া উকিল বা অন্য লোকের পরামর্শে বা অন্য কোন কারণে বিবদমান দুই ভাই অস্ত্রধারণ করিত অথবা বিচারপ্রার্থী হইয়া আদালতে যাইত (সেও একপ্রকার পশুশক্তির আশ্রয় গ্রহণ), তাহা হইলে সে কাহিনী ছাপা হইয়া ছড়াইয়া পড়িত। দেশের লোক সে সম্বন্ধে বলাবলি করিত, হয়তো ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে কাহিনী স্থান পাইত। পরিবারে বা সমাজের বেলায় যাহা ঘটে জাতির ব্যাপারেও সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। তাই বলি ইতিহাস কেবল সেই ঘটনাই লিখিয়া রাখে যখন স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে। অধ্যাত্মশক্তি স্বাভাবিক ব্যাপার, তাই তার কথা ইতিহাসে লেখা হয় না।

[হিন্দ্‌ স্বরাজ, ৪৫]

ইতিহাসের মূলতত্ত্ব

৭৮। আমার বিশ্বাস সমগ্র মানবজাতির কর্মপ্রচেষ্টার ফলে আমাদের অধোগতি হইতেছে না, আমরা উন্নতি লাভ করিতেছি। জগৎসংসারে যে প্রেমের নীতি ক্রিয়াশীল হইয়া রহিয়াছে, আমরা বুঝিতে না পারিলেও তাহার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য প্রেমের বিস্তার।।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-৩১, ৩৫৫]

৮০। মানুষের ইতিহাস সুদূর অতীত হইতে আজ পর্যন্ত যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা বিচার করিলে ইহাই বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য জাতি ধীরে ধীরে অহিংসার সাধনে অগ্রসর হইতেছে। বহু পূর্বে মানুষে মানুষকেই খাইয়া ফেলিত। তারপরে এক দিন আসিল যখন মানুষ খাওয়া ত্যাগ করিয়া মানুষ পশুশিকারে মন দিল। ক্রমে এমন একদিন আসিল যখন মানুষ পশুশিকারে ও যাযাবরবৃত্তিতে ক্লান্ত হইয়া অতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। তখন সে মাতা ধরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঘর বাঁধিল ও মাটিতে ফসল ফলাইয়া খাদ্য সংগ্রহে

প্রবৃত্ত হইল। জননী ধরণী তাহাদের আহার যোগাইতে লাগিল। এইরূপে যাযাবরের জীবনযাত্রা ত্যাগ করিয়া মানুষ বসতি করিল গ্রামে, পরে শহরে। গৃহপরিবার মিলাইয়া মানুষ গড়িল সমাজ, সমাজ হইতে আসিল জাতির বিস্তৃততর বন্ধন। এই বিবর্তনের ধারার লক্ষ্য, দেখা যাইতেছে হিংসার ক্ষয় ও অহিংসার বিস্তার। যদি লক্ষ্য বিপরীত হইত তাহা হইলে এত দিনে মনুষ্যজাতি লয় পাইত, যেমন অনেক জাতির প্রাণী ইতিমধ্যে লোপ পাইয়া গিয়াছে। মহাপুরুষ এবং অবতারগণ, কেহ বেশী কেহ কম, এই অহিংসার শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন; কেহই হিংসা করিতে শিখান নাই। অবশ্য এর বিপরীত ঘটা সম্ভবও নয়। হিংসা শিখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। মানুষ যেখানে পশু, সেখানে তার ধর্ম হিংসা; মানুষ যেখানে চৈতন্যশক্তির ধারক ও বাহক, সেখানে তার ধর্ম অ-হিংসা। যে মুহূর্তে মানুষের মধ্যে চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে সেই মুহূর্ত হইতে সে আর হিংসা লইয়া চলিতে পারে না। হয় অহিংসার সাধনে তাহাকে আগাইয়া যাইতে হইবে অথবা হিংসা তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে। তাই মহাপুরুষ ও অবতারগণ অন্তর্দৃষ্টিতে জানিয়া মানুষকে শিখাইয়াছেন—সত্য, প্রেম, নীতি ইত্যাদি অহিংসারই ধর্ম।

এই বিচারে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মানুষ অহিংসাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহা হইলে সেই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে আরও অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সংসারে কিছুই স্থির নয়, সব কিছুই চলিতেছে। যদি সম্মুখে অগ্রসর না হই তবে পিছনে হটিয়া আসিতে হইবে। এই চলমান জগতের বাহিরে যাওয়ার অধিকার আমাদের নাই। একমাত্র ঈশ্বর এই জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াও তাহাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন।

[হরিজন, ১১-৮-৪০, ২৪৫]

৮৩। প্রশ্ন—আপনি কেন স্বীকার করিতেছেন না যে, যতদিন সম্পত্তি থাকিবে ততদিন সকল বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া লোকে

সম্পত্তি রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবে? সুতরাং আপনি যে বলেন, 'কোন অবস্থাতেই হিংসার প্রয়োগ চলিতে পারে না', এ বিচার অযুক্তিযুক্ত ও একেবারে অচল। এমন হইতে পারে যে মাত্র বিশেষ কয়েক জনের জন্য অহিংসার সাধন সম্ভব।

উত্তর—আজ পর্যন্ত যদিও মানুষ জানিয়া বুঝিয়া অহিংসাকে সমাজগঠনের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করে নাই, সারা পৃথিবীতে মানুষ বাঁচিয়া আছে এবং মানুষ নিজের নিজের সম্পত্তি দখল করিয়া রাখিতে পারিতেছে কেবল পরস্পরের সম্মতি আছে বলিয়া। যদি তারা স্বেচ্ছায় এ অবস্থা স্বীকার করিয়া না লইত তাহা হইলে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ কয়েকজন ছাড়া আর কেহ বাঁচিয়া থাকিত না। কিন্তু সেরূপ তো ঘটে নাই। গৃহ-পরিবার প্রেমের বন্ধনে টিকিয়া থাকে, সেইরূপ সভ্যজগতে যাহাকে জাতি বলে সেই বৃহত্তর জনসমাজও প্রেমের শক্তিতে বজায় থাকে। কেবল তারা অহিংসার শক্তিকে বুঝিয়া জানিয়া স্বীকার করে নাই, অহিংসাকে কল্যাণশক্তির শীর্ষদেশে স্থাপন করে নাই, এই ভ্রান্তিটুকু রহিয়া গিয়াছে। এই যুক্তি হইতে ইহা বলা যায় যে, তাহারা প্রেমের শক্তির পরিচয় পায় নাই, তার যে অসীম সম্ভাবনা রহিয়াছে সে তথ্যের দিকে কোন পরীক্ষা করে নাই। এতদিন পর্যন্ত কেবল আলস্য (যাহাকে জড়তা বলিলেও বলা যায়) বশতঃ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, কেবল যাহারা অসংগ্রহ ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছে তাহাদের পক্ষেই অহিংসার সাধন সম্ভব। এ কথা অবশ্য সত্য যে, কেবল একনিষ্ঠ সাধকরাই কর্মক্ষেত্রে অহিংসার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে সক্ষম; মানুষের ইতিহাসে তাঁহারাই মাঝে মাঝে প্রেমের বিধানের বিজয়-বার্তা মানুষের চোখে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, যদি বিধির সকল বিধানের মত প্রেমের বিধান মনুষ্য-জীবনে ক্রিয়াশীল হইতে পারে তাহা হইলে সর্বক্ষেত্রে সকল অবস্থায় তাহা ফলপ্রসূ হইবে। যেখানে আমরা এই নীতির ব্যর্থতা দেখিতে

পাই সেখানে বুঝিতে হইবে দোষ নীতির নয়, প্রয়োগকারীর ত্রুটি বশতঃ নীতি ব্যর্থ হইতেছে। তারা বোঝে নাই যে, স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সকলে এই নীতির বশে চলিয়াছে ও চলিতে বাধ্য। মা যখন পুত্রের কল্যাণে প্রাণ বিসর্জন দেন, তিনি হয়তো জানেন না যে তিনি প্রেমের নীতির বশে এরূপ করিতেছেন। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরিয়া আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি যে, স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এই নীতিকে স্বীকার করিয়া যত ভুলই হউক না কেন, সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নিষ্ঠা সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই নীতির প্রয়োগফল পরীক্ষা করিয়া যে আশ্চর্য সুফল পাইয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস বহুগুণে দৃঢ়তর হইয়াছে। আজ আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে নিরন্তর অহিংসা আচরণের ফলে আমরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারি যখন ন্যায়সঙ্গত মালিকানাকে সকলে স্বেচ্ছায় সম্মান করিয়া চলিবে। অবশ্য যেন অসদুপায়ে অর্জিত ধন না হয়। সংসারে সর্বত্র বৈচিত্র্য বিরাজ করিতেছে এ বৈষম্য চিরন্তন, কিন্তু ধনবৈষম্যের রূঢ়তা লোপ পাইলে কাহারও ধন দেখিয়া অপরে পীড়া অনুভব করিবে না। যেক্ষেত্রে ধন অসদুপায়ে, নীতিবিগর্হিতভাবে সংগৃহীত হয় সেক্ষেত্রেও অহিংসার সাধকের বিচলিত হইবার কিছু নাই। তাঁহার হাতে আছে পরম অস্ত্র সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ। বলপ্রয়োগের পরিবর্তে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে, সততার সহিত প্রয়োজনানুরূপ প্রয়োগ করিতে পারিলে সর্বত্র সুফল পাওয়া যায়। অহিংসা-বিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ করিয়া বলিয়া দিতে পারিব এমন আমি বলি না। এরূপ চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নয়। কোন জড়বিজ্ঞান, এমনকি যাথার্থ্যের চূড়ান্ত যে শাস্ত্রে—সেই অঙ্কশাস্ত্রও চূড়ান্ত মীমাংসা আনিয়াছে এমন বলা যায় না। আমি একজন সত্যানুসন্ধানী মাত্র। কত ব্যক্তি এইরূপে সত্যকে জানিয়া রহস্যভেদের প্রয়াসে নিযুক্ত রহিয়াছে।

[হরিজন, ২২-২-৪২, ৪৮]

ঐক্যই জীবন

৮৫। অধ্যাত্মশক্তি কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ মার্গে কাজ করে এমন যুক্তি আমি মানিতে পারি না। বরঞ্চ এর বিপরীত অর্থাৎ সাধারণ জীবনে, সকল ক্ষেত্রেই ইহা ক্রিয়াশীল বলিয়া আমি বুঝিয়াছি। কারণ আমাদের আর্থিক সামাজিক রাজনৈতিক ইত্যাদি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই চৈতন্যশক্তি সদাই কাজ করিতেছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-৯-২৫, ৩০৪)

ঈশ্বর ও মানুষের সেবা

৮৭। হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাওয়াই মানুষের সকল চেষ্টার লক্ষ্য। তার সামাজিক রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক সকল প্রয়াসই যাহাতে তাহাকে ঈশ্বরের সমীপে আগাইয়া দেয় সেইভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে সংসার পরিচালিত হইলে আমাদের সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে মানুষের সেবায় এখনই লাগিয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরের সৃষ্ট সংসারে তাঁকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত একাত্ম হওয়াই ঈশ্বরকে পাওয়ার একমাত্র পথ। সকলের সেবা করিয়া তবে সংসারের সঙ্গে মিলন ঘটানো যায়। আমি সমগ্র জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র—সমগ্র মানবসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইব না। আবার দেশের লোক আমার নিকটতম প্রতিবেশী। তারা এত নিঃসহায়, এত নিঃসম্বল, এত জড়তাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাদের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ না করিলে উপায় নাই। যদি আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে হিমালয়ের গুহায় গেলে ঈশ্বরকে পাইব তাহা হইলে আমি সেখানেই ছুটিতাম। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি— মানুষ হইতে কিছুমাত্র দূরে গেলে তাঁকে আর পাইব না।

[হরিজন, ২৯-৮-৩৬, ২২৬]

মানুষ এক

৯২। আমি নিজে অধ্যাত্মক্ষেত্রে আগাইয়া যাইব আর আমার চতুষ্পার্শ্বের জনতা জড়তায় দুঃখ পাইবে, এরূপ সম্ভাবনায় আমি বিশ্বাস করি না। আমি অদ্বৈত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি—সকল মানুষ মূলতঃ এক। শুধু মানুষ কেন, সকল জীবিত প্রাণী মাত্রেই সেই অদ্বৈত একের প্রকাশ। এই কারণে আমি মানি যে, একজন লোকও যদি আত্মোপলব্ধিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে সকল জীব তাহার সঙ্গে আগাইয়া যায়, আবার যদি একজনও ব্যর্থ হয় সকলেই সেই পরিমাণে ব্যর্থতার অংশীদার হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-১২-২৪, ৩৯৮]

ব্যক্তির মাহাত্ম্য

৯৬। সরকারের হাতে যত বেশী শক্তি যায় আমার ভয়ও তত বাড়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, শোষণ কমাইয়া সরকার সাধারণের মঙ্গল করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, শক্তি সরকারের হাতে গেলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়; ব্যক্তিত্বই সকল অগ্রগতির মূলে।

[মডার্ন রিভিউ, ১৯৩৫, ৪১৩]

৯৭। যাঁদের অন্তরে বিশ্বাসের অনির্বাণ আগুন জ্বলিয়াছে এমন কয়েক জন মাত্র সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া চেষ্টা করিলে মানুষের ইতিহাসের ধারা বদলাইয়া যাইবে।

[হরিজন, ১৯-১১-৩৮, ৩৪৩]

মনুষ্যত্বে আস্থা

১০০। সপ্রেম মহৎ সেবায় যে-কোন মানুষের অন্তর সাড়া দিবেই দিবে। সত্য মানুষকে টানিবে না ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৮-২০]

১০২। অহিংসা নীতির সার্থক প্রয়োগ করিতে হইলে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, মানুষ মাত্রেই—সে যত ভ্রষ্টাচারী হউক না কেন—প্রেমপূর্ণ ও দক্ষ আচরণে সুপথে ফিরিয়া আসিবে।

[হরিজন, ২২-২-৪২, ৪৯]

বুদ্ধি ও হৃদয়

১০৪। সকল ধর্মের সকল উক্তিকে আজ আবার নূতন করিয়া মানুষের বিচারে উত্তীর্ণ হইয়া জগতের সম্মতি লাভ করিতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-২-২৫, ৭৪]

১০৫। যুক্তিবাদী লোকদের আমি বহু সম্মান করি। কিন্তু নিছক যুক্তিবাদ যখন সর্বজ্ঞ হইয়া বসে তখন সে দানবের আকার ধারণ করে। গাছ পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা যদি পৌত্তলিকতা হয় তাহা হইলে বুদ্ধিকে সর্বজ্ঞ জ্ঞান করা আরও ঘোর পৌত্তলিকতা। বুদ্ধিকে হেয় করিতে চাই না, কিন্তু যে শক্তি বুদ্ধিতে ধী সঞ্চার করেন তাঁহাকে স্বীকার করিয়া বুদ্ধি পরিচালনা করাই আমি কামনা করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-১০-২৬, ৩০৯]

নির্বুদ্ধিতার স্থান নাই

১০৮। জ্ঞান ও শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানকে আরাধনা করিতে পারে কেবল মানুষ। যার ঈশ্বরে ভক্তি আছে কিন্তু যার ভক্তি বোধ-শূন্য, সে মোক্ষলাভ করিতে পারে না, মোহমুক্তি না হইলে পূর্ণ আনন্দ লাভ হয় না।

[সুস্বাস্থ্যের উপায়, ১২৯]

১১০। অহিংসার সার্থক সাধন করিতে হইলে চাই সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তার সঙ্গে সদাজাগ্রত বিবেক। এ কথা ভুলিবে চলিবে না।

[হরিজন, ৮-৯-৪০, ২৭৪]

১১৩। যদি শুধু যন্ত্রের শক্তি যোগাইবার জন্যই কোন যন্ত্র চালনায় অভ্যস্ত হওয়া যায় তাহা হইলে সে কাজ মনে ও চেতনায় কেবল জড়তাই আনিয়া দিবে। বোধবিহীন কাজ মৃতদেহের মত, যে দেহ হইতে চৈতন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

[হরিজন, ৩-৭-৩৭, ১৬১]

আদর্শবাদ

১১৭। জীবনে কখনো কখনো নিজ অন্তরের বিশ্বাস ও আচরণের বিরোধ ঘটে ; কেন ? বিরোধ যে আছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। জীবন দীপশিখার মত উর্ধ্বমুখে উঠিতে চায়। আত্মোপলব্ধির ফলে পূর্ণতা লাভ করিয়া জীবন্মুক্তিই জীবনের গতি। নিজের দুর্বলতা বা ত্রুটি আছে বলিয়া আদর্শকে খাটো করা অনুচিত। নিজের দুর্বলতার ও ত্রুটির জন্য আমি নিজে দুঃখ পাই। সত্যের দুয়ারে নীরবে কাঁদিয়া প্রার্থনা জানাই, "আমার ত্রুটি, আমার অপরাধ ঘুচাও।" ভীষণদর্শন দস্যু বা নরহত্যাকারীকে আমি যেমন ভয় করি, তেমনি আমি সাপ, বিছা, সিংহ, বাঘ, প্লেগরোগবাহী ইন্দুর ও মাছিকে ভয় করি—এ কথা স্বীকার করিতেছি। এদের ভয় করা আমার উচিত নয়। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা ভয় নিবারণ হয় না। এ কাজ করিতে পারে আমার হৃদয়। অন্য সকল ভয়কে বিতাড়িত করিয়া কেবল পরমেশ্বরের ভয়টুকু জাগ্রত রাখিতে পারে যে হৃদয়—সে হৃদয় মহামহীরূহের ন্যায় দৃঢ়। আমার দুর্বলতা আছে বলিয়াই বোরসাদের (গুজরাটের একটি তালুক বোরসাদে প্লেগের প্রতিরোধ-কল্পে ইন্দুর ও মাছি ধ্বংস করা হইয়াছিল) লোকদের মারাত্মক ইন্দুর ও মাছি মারিয়া ফেলিতে নিষেধ করিতে পারি নাই। কিন্তু অন্তরে আমি বুঝিয়াছি, মানুষের দুর্বলতার জন্যই এই ত্রুটি মানিয়া লইতে হইয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণে যত পার্থক্য, হিংসায় বিশ্বাস ও অহিংসায় বিশ্বাস

এ দুইয়ের মধ্যেও ততখানি তফাৎ। যিনি অহিংসাকে আশ্রয় করিয়াছেন, প্রেমের পথ বাছিয়া লইয়াছেন—দিনের পর দিন তাঁর হিংসার বিস্তার সংকুচিত হইবে, প্রেমের পরিধি বাড়িয়াই চলিবে। যিনি হিংসাকেই পথ ভাবিতেছেন, তাঁর অন্তরে বাহিরে বিরোধ বাড়িয়াই চলিবে আর দিনের পর দিন তাঁর চারিদিকে ধ্বংস ও বিদ্বেষের ক্ষেত্রও বাড়িয়া চলিবে। বোরসাদের বাসিন্দাদের আমার একান্ত আপন ইন্দুর ও মাছি ধ্বংস করার কাজে যদিও আমি উৎসাহ দিয়াছি তবু আমি বিশ্বাস করি আমি তাদের নিকট সর্বজীবে প্রেমের সনাতন নীতিই ব্যক্ত করিয়াছি। এ জীবনে প্রেমের নীতি সর্বদা পালন করিতে অক্ষম হইলেও আমার নিষ্ঠা বাড়িতেই থাকিবে। প্রতিটি ব্যর্থতা আমাকে সার্থকতার দিকে আরও অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

[হরিজন, ২২-৬-'৩৫, ১৪৮]

হিংসা কাহারও কল্যাণ করিতে পারে না

১২০। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এ সংসারে পশুশক্তির রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে। সেই রাজত্বে তিক্ত ফল যে কত ফলিয়াছে তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। ভবিষ্যতে এই রাজত্বে কোন সুফল ফলিবে এমন আশা করা যায় না। অন্ধকার হইতে যেমন আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হওয়ার আশা কেহ করে না তেমনি এই হিংসার শাসনে প্রেম উৎসারিত হইবে তাহা ভাবা যায় না।

[দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ২৮৯]

অহিংসা

১২২। (ক) মানুষের পক্ষে যতটা আত্মশুদ্ধি সম্ভব অহিংসার সাধনে তার সবটুকুই প্রয়োজন হয়।

(খ) দুইজনের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, একজন যদি

অহিংসার আশ্রয় লয় তাহা হইলে সে পশুশক্তির সাহায্যে যে পরিমাণ জোরে আঘাত করিতে পারিত তত জোরে সে অহিংস শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে। শুধু আঘাত করিবার ইচ্ছাশক্তিই এখানে পরিমাণ নির্ধারণ করে।

(গ) সকল ক্ষেত্রেই হিংসার চেয়ে অহিংসা অধিক কার্যকর হয়। দেখা যায় যে, বিরোধের ক্ষেত্রে হিংসার আশ্রয় লইলে যে শক্তি কাজ করে অহিংসা অবলম্বন করিলে তার চেয়ে অধিক শক্তি ধারণ করা যায়।

(ঘ) অহিংসার প্রয়োগে হারিয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। পশুশক্তি প্রয়োগের ফলে পরাজয় সুনিশ্চিত।

(ঙ) অহিংসার চরম লক্ষ্য সুনিশ্চিত জয়, যদি অবশ্য অহিংসা প্রসঙ্গে হারজিত কথাটি গ্রাহ্য হয়। বাস্তবিক, অহিংসার সংগ্রামে কেহ হারে না কেহ জেতে না।

[হরিজন, ১২-১০-৩৫, ২৭৬]

অহিংসার ফল

১২৫। সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধ করার সঙ্গে আত্মিক শক্তির কোনই তুলনা হয় না। ভীতি প্রদর্শন, দুর্বলের উপর অত্যাচার, অসংগত সম্পত্তি লাভ, দৈহিক সুখভোগের জন্য অদম্য প্রয়াস—এর কোনটিই আত্মশক্তির সহায়ক নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৫-২৬, ১৬৪]

১২৮। যেখানেই সামাজিক অবিচার হউক না কেন তাহার বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে কেহ সক্রিয় অহিংসাপন্থী বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।

[হরিজন, ২০-৪-৪০, ৯৭]

১২৯। সমাজের সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে অহিংসার প্রয়োগ সম্ভব। অহিংসা বিশ্বজনীন নীতি, কোনপ্রকার বিরুদ্ধ আবেষ্টন ইহার গতি

রোধ করিতে পারে না। ফলতঃ কেবল বিরুদ্ধতার মধ্যেই ইহার সুফল পরিলক্ষিত হয়। যদি কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টির ভরসায় থাকিতে হয় তাহা হইলে অহিংসার কোন মূল্যই থাকে না।

[এখানে ভারতে ইংরাজ শাসনের বিষয় বলা হইয়াছে]

[হরিজন, ১২-১১-৩৮, ৩২৬]

১৩১। কয়েকজন বন্ধু বলিতেছেন যে, রাজনীতি ও সাংসারিক ব্যাপারে সত্য বা অহিংসার কোন স্থান নাই। এই মতে আমি সায় দিতে পারি না। ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের জন্য এ সবের কোন প্রয়োজন হয় না। চিরদিনই আমি দৈনন্দিন জীবনে সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি।

[অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০-৬-৪৪]

১৩২। সত্য ও অহিংসার সাধন নিজের জন্য নয়, শুধু নিজেকে লইয়াও হয় না; এ সাধনের ক্ষেত্র পরিবার, সমাজ, দেশ এবং সারা সংসারকে লইয়া। অন্ততঃ আমি এইরূপ কল্পনা করি। আমি যতদিন বাঁচিব এই সাধন করিতে থাকিব এবং এই সাধনায় সিদ্ধির জন্য প্রাণ দিব। নিষ্ঠার শক্তিতে আমি নিত্য নূতন সত্য আবিষ্কার করিতেছি। অহিংসা আত্মারই প্রকাশ, তাই সকল ব্যাপারে সকল লোকে ইহারই চর্চা করিবে। যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে অহিংসার সাধন না চলে তাহা হইলে ইহার কোন মূল্যই নাই।

[হরিজন, ২-৩-৪০, ২৩]

অপ্রতিরোধ বলিতে কি বুঝায়?

১৩৩। এতদিন পর্যন্ত 'বিপ্লব' শব্দটি বলপ্রয়োগের ধ্যানের সহিত জড়িত ছিল। সেই কারণে কর্তৃপক্ষ কোনোদিনই ইহাকে সহ্য করেন নাই। কিন্তু এই অসহযোগ আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহ নয়। এ একপ্রকার বিশেষ ধারাতে মনুষ্যসমাজের ক্রমবিকাশকে পরিচালিত করার

আন্দোলন। এও বিপ্লব বটে, তবে এর মধ্যে হানাহানি নাই। এ আন্দোলন চিন্তায় ও অধ্যাত্মজগতে পরিবর্তন ঘটানোর আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনকারীর নিজের চরিত্রশুদ্ধির উপর এ আন্দোলনের সার্থকতা নির্ভর করে ; কাজেই তাঁর ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য। এ আন্দোলন রোধ করিতে গেলে জোর করিয়া চরখার প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। মদ্যপান নিবারণী আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিতে গেলে স্বতঃই জনতা ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র-ধারণ করিতে পারে। কারণ অপ্রত্যক্ষ উপায়ে বিদেশী বস্ত্র পরিতে বাধ্য করিলে বা মদের দোকানে যাইতে উৎসাহিত করিলে কে না রুষ্ট হয়! আমাদের সাফল্য নির্ভর করে এই অবস্থায় ধৈর্য রক্ষার উপর, এই উত্তেজনা ও মূর্খতায় সাড়া না দেওয়ার উপর। আমাদিগকে অটল হইয়া স্থির থাকিতে হইবে, প্রতিবাদ করা চলিবে না। আমাদের অনড়তায় সরকারের পাগলামি ঘুচিবে। বাধা দিলেই অত্যাচার বাড়িবে, লড়াই চলিতে থাকিবে। সে লড়াইয়ে হয় আইন-অমান্য-কারীকে নতি স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে প্রতিবাদে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতিটি কর্মীর প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তারা যেন সর্ব-অকল্যাণ এই সরকারকে পূর্ণ অসহ-যোগের দ্বারা একঘরে করিয়া তোলেন—সরকার সম্বন্ধে কোন আলোচনাও করিবেন না, সরকারের দানবসুলভ প্রকৃতি যদি বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহার কাছে নতি স্বীকার না করিয়া সর্বপ্রকার সহযোগ বর্জন করিবেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৩-২১, ৯৭]

১৩৯। যদি আমাকে কেহ গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে গালি দিলে লাভ হইবে না। একটি মন্দ কাজের উত্তরে আর একটি মন্দ কাজ করিলে সংসারে মন্দের পরিমাণ বাড়িয়াই যাইবে, কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই। হিংসার প্রতিদানে কঠোরতর হিংসা দিয়া প্রতিবাদ করিলে হিংসার অবসান ঘটিতে পারে না এই নীতি সর্ববাদীসম্মত ;

হিংসার শাস্তি করিতে পারে অহিংসা বা অপ্রতিরোধ। এই অপ্রতি-রোধের তত্ত্বকে লোকে ভুল বুঝিয়াছে, অনেক সময় ইহার কদর্থও করিয়াছে। অপ্রতিরোধের অর্থ এমন নয় যে আক্রমণকারীর হিংসার ভয়ে ভীত হইয়া প্রতিরোধের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইবে। হিংসাকে হিংসা দ্বারা বাধা না দিয়া প্রাণ গেলেও হিংসার ভয়ে নতি স্বীকার না করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে অকুতোভয়ে দাঁড়ানোই প্রকৃত অপ্রতিরোধ।

[হরিজন, ৩১-৩-৪৭, ৮৫]

ক্রমবিকাশ না বিপ্লব?

১৪০। প্রশ্ন—ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করিয়া জাতিসমূহ কেমন করিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহা দেখিয়াছেন কি? আপনারা কি বুঝিয়াছেন যে মানুষের উন্নতি হয় ধীরে ধীরে; তিলে তিলে অগ্রগতি গড়িয়া তুলিতে হয়, আকস্মিক বিপ্লব বা ধ্বংসের দ্বারা কোনো উন্নতি হয় না? ভগবান প্রকৃতির মাধ্যমে কেমন করিয়া অতি ধীরে সৃষ্টি ঘটাইতেছেন উপলব্ধি করিয়াছেন কি? উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ কত ধীরে ঘটিতেছে। এই অগ্রগমন ঘটিতেছে বিবর্তনের দ্বারা, বিপ্লবের ফলে নয়। আকাশে তারকাপুঞ্জের গতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় কোটি সূর্য তারকা অনন্তকাল ধরিয়া একই ভাবে চলিয়াছে, গতি আছে বলিয়া বুঝাই যায় না। উচ্চ পর্বতশিখরে আরোহণ করিতে হইলে ধীর পদক্ষেপে বহুশ্রমে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু দ্রুত অবতরণ করিতে হইলে ঝুঁকিয়া পড়া কোন প্রস্তর-খণ্ড হইতে লাফ দিলেই নিমেষে নীচে পৌঁছানো যায়।

উত্তর—পৃথিবীর জাতিসমূহের উন্নতি ঘটিয়াছে বিবর্তন ও বিপ্লব দুইয়েরই সাহায্যে। এই দুইটির কোনোটিকেই বাদ দিয়া এই উন্নতি ঘটে নাই। জন্ম ও দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধিকে বিবর্তন বলিলে মৃত্যুকে বিপ্লব বলা যায়। মানুষের বাঁচিয়া থাকার জন্য শুধু জীবনের

প্রয়োজন হয় না—মৃত্যুরও প্রয়োজনীয়তা আছে। ভগবানের মত বিপ্লবী কেহ দেখে নাই, দেখিবে না। তিনি পৃথিবী প্লাবিত করিয়া বিপ্লব ঘটান। শান্ত আকাশে অকস্মাৎ ঝড় আনিয়া পৃথিবীকে মথিত করেন। পরমাশ্চর্য কৌশলে, অসীম ধৈর্য সহকারে যে পর্বত তিনি রচনা করেন, নিমেষে আবার তাহার লয় করেন। আকাশ আমি দেখি—আকাশ দেখিয়া আমার মন বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া ওঠে। কি ভারত কি ইংলণ্ডের নীল আকাশে মেঘসঞ্চার হওয়া দেখিয়াছি—সেই মেঘবাহিনীর বিপুল গর্জন বর্ষণ দেখিয়া আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছি। ইতিহাস বলিয়াছে অগণিত অভূতপূর্ব বিপ্লবের কাহিনী, যাকে আমরা সুনিয়ন্ত্রিত অগ্রগতি বলি ইতিহাস তাহার হিসাব রাখে নাই—বিশেষ করিয়া ইংরাজের ইতিহাস। পত্রলেখকের জ্ঞাতার্থে ইহাও নিবেদন করি যে, দুর্গম পর্বতে আরোহণ করার দুঃখ আমি দেখিয়াছি, তদুপরি অতি দ্রুত শূন্যপথে বহু দূরে মানুষকে যাইতে দেখিয়াছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-২-২২, ৭৮]

স্বরাজ ও স্বাধীনতা

১৪৪। যথার্থ স্বরাজ হইল নিজের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করা। ইহাকে বলা যায় মোক্ষ, বলা যায় স্যাল্‌ভেসন্ (salvation) বা মুক্তি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-২০]

১৪৫। জাতির স্বরাজ বলিতে বুঝি, সেই জাতির মানুষদের স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্বের যোগফল।

[হরিজন, ২৫-৩-৩৯, ৬৪]

১৪৭। ক্রমবিকাশে যে পরিবর্তন ঘটায় তার মধ্যে অনেক অনিশ্চয়তা থাকে। কোনোটা কাজে লাগে কোনোটা লাগে না। অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে ভুলও থাকে—আবার ভুল সংশোধন

করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যা কিছু সত্যই কল্যাণকর, সেগুলি ভগবান অন্তরালে তৈয়ারী করিয়া সাজাইয়া পাঠাইয়া দেন নাই। আমাদের ভালো আমাদেরই গড়িয়া লইতে হয়—বহু প্রয়াসে, বহু ব্যর্থতার মধ্য দিয়া। ব্যক্তি সম্বন্ধে এই চিত্র যেমন সত্য, সমাজ বা দেশ সম্বন্ধেও তেমনই সত্য। সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ক্রমবিকাশ ভুলের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হয়। এই ভুল করার অধিকার, এই পরীক্ষামূলক প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা মৌলিক সত্য। জগৎসংসারের বিকাশের ধারা এই নিয়মের অধীন।

[এম. কে. গান্ধী : স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস, গনেশ (১৯২১), ২৪৫]

পথ ও লক্ষ্য

১৪৯। পথের সঙ্গে বীজের তুলনা করা যায়, লক্ষ্য হইল বৃক্ষ। কারণ ও কার্যের মধ্যে, উপায় ও ফলের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাকে বীজ ও বৃক্ষের সম্পর্ক দিয়া বুঝা যায়।

[হিন্দ্ স্বরাজ, ৩৯]

১৫২। অনেকে মনে করেন, সর্বাগ্রে আদর্শ বা লক্ষ্য কি এ বিষয়ে প্রাঞ্জল বর্ণনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এ সম্বন্ধে একবার সিদ্ধান্তে আসিয়া গেলে তাহার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমি মনে করি নাই। যত বিশদ্‌ভাবেই এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হউক বা সূত্র রচনা করা হউক না কেন, তদ্দারা আমরা লক্ষ্যের দিকে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব না। পথের সন্ধান করিয়া সেই পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছিবার অন্য কোন উপায় নাই। এই কারণে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় আবিষ্কার এবং ধাপে ধাপে তাহার প্রয়োগবিধি অনুধাবনের দিকেই আমি বেশী চিন্তা করি। আমি নিশ্চিত যে পথের বিষয়ে অবহিত হইলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সুনিশ্চিত। এও বুঝি যে, উপায় যত শুদ্ধ, যত কল্যাণময়

হইবে, লক্ষ্যের দিকে আমাদের গতিও তত দ্রুত হইবে, আমরা সেই পরিমাণে লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া যাইব।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এ উপায়ে লক্ষ্যে পোঁছিতে বিলম্ব হইবে, অতি-বিলম্ব হইতে পারে। আমি স্থির বুঝিয়াছি, এই সবচেয়ে সোজা।

[অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭-৯-৩৩]

অধিকার ও কর্তব্য

১৫৩। কর্তব্য পালন হইতে অধিকারের সৃষ্টি হয়। যদি আমরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করি অধিকার আপনিই হাতের কাছে আসিয়া যাইবে। যদি করণীয়কে অবহেলা করিয়া আমরা কেবল অধিকার খুঁজিয়া বেড়াই তাহা হইলে মরীচিকার পিছনে ছোটাই সার হইবে। যত ছুটিব ছবি ততই সরিয়া যাইবে। এই শিক্ষাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অমর শ্লোকে বলিয়াছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

কর্মেই শুধু তোমার অধিকার, ফলে কদাচ নহে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১-২৫, ১৫]

সর্বোত্তম কল্যাণ

১৫৪। হিতবাদীরা বলেন "সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক যে কাজে সর্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত হন তাহাই সর্বোত্তম কল্যাণ।" অহিংসার সাধক ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। অহিংসা চাহে সকলের জন্য শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। সেই কল্যাণের প্রচেষ্টায় অহিংসার সাধক নিজ প্রাণও বিসর্জন করিতে প্রস্তুত। সকলের সেবার মধ্য দিয়া সে নিজের সেবাও করে, তাই প্রাণ দিয়া সে সকলের ও তৎসহ নিজের কল্যাণ সাধন করে।

সকলের মঙ্গলের ধ্যানের মধ্যেই "সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক"

লোকের মঙ্গলকামনা নিহিত রহিয়াছে। কাজেই অনেক বিষয়ে হিত-বাদীর সঙ্গে অহিংস সাধকের মিল আছে। এই পথে উভয়ে চলিতে থাকিলে ক্রমে এমন অবস্থা আসিবে যখন উভয়ে আর একত্র চলিতে পারিবে না—হয়তো দুজনকে বিপরীতমুখে চলিতে হইবে। হিতবাদী যদি নিজের যুক্তিমত চলে, কখনই নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারিবে না। পরম ঐক্য যাঁরা সন্ধান করেন তাঁরা প্রাণ দিয়া সাধন সার্থক করিবেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-১২-২৬, ৪:২]

সভ্যতা বনাম আত্মসংযম

১৫৫। বিপুল ভোগ্যসম্ভার সৃষ্টি করিয়া মানুষের অভাব বাড়াইয়া তোলা প্রকৃত সভ্যতা নয়। স্বেচ্ছায় অভাববোধকে সংযত করাই সভ্যতার পরিচায়ক। সংযমের দ্বারাই প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাওয়া সম্ভব। সংযমের দ্বারাই মানুষের কর্মশক্তি বাড়িয়া যায়।

[যারবেদা মন্দির, ৩৬]

১৫৭। যতক্ষণ কোন বিশেষ বস্তু কাজে লাগে ও অন্তরে আরাম দেয় ততক্ষণ সেই বস্তুকে ত্যাগ করা উচিত নয়—তাহাকে সযত্নে রাখা উচিত। যদি আত্মোৎসর্গের উৎসাহে অথবা কঠোর কর্তব্যজ্ঞানে তাহাকে ত্যাগ কর তাহা হইলে মনের গভীরে সেই বস্তু কামনা করিতে হইবে—আর সেই অভাববোধ তোমাকে বিপাকে ফেলিবে। একমাত্র যখন তোমার মনে অবস্থান্তরের আগ্রহ এত প্রবল হইবে যে তোমার জীবনধারা ভিন্ন খাতে বহিতে চাহিবে, পুরাতন সম্পদ্ আর মূল্যবান বলিয়া মনে হইবে না, এমনকি পুরাতন কামনাকে বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইবে—অন্য সম্পদের সন্ধানে মন ছুটিবে—তখন পুরাতন কামনা লোপ পাইলে পুরাতন সম্পদের প্রয়োজন আপনিই খসিয়া পড়িবে।

[বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি নব পর্যায় ২য় পর্ব ২য় খণ্ড, ৪৬]

অর্থনৈতিক আদর্শ

১৫৮। রাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট' পড়িয়া গান্ধীজী ১৯০৪ সালে নিম্নলিখিত ভাবত্রয় আহরণ করেন—

(১) সকলের কল্যাণের মধ্যে ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত।

(২) ক্ষৌরকারের কাজের যে মূল্য, একজন ব্যবহারজীবীর কাজের ঠিক সেই মূল্য। কারণ প্রত্যেকেরই কাজ করিয়া নিজ নিজ জীবিকা সংগ্রহ করিবার সমান অধিকার রহিয়াছে।

(৩) শ্রমভিত্তিক জীবন অর্থাৎ কৃষকের ও কারিগরের জীবন একমাত্র আদর্শ জীবন।

[আত্মকথা, ৩৬৫]

১৫৯। প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচিবার অধিকার রহিয়াছে এবং সেই কারণে আহার বস্ত্র বাসস্থান সংস্থানের উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহের অধিকারও তাহার রহিয়াছে।

[স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অব্ মহাত্মা গান্ধী, নটেশন, ৩৫০]

১৬০। আমার মতে ভারতের তথা সারা পৃথিবীর অর্থনীতির কাঠামো এমন হওয়া উচিত যাহাতে অন্ন ও বস্ত্রের অভাব আছে এমন কোনো লোক থাকিবে না। অন্যভাবে বলিলে বলা যায়—প্রত্যেক লোকেরই এমন পরিমাণ কাজ থাকিবে যাহার দ্বারা সে তার অন্ন বস্ত্রের অভাব দূর করিতে পারিবে। সারা পৃথিবীতে এই অবস্থা ঘটানো সম্ভব হইত যদি অন্ন-বস্ত্র আদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনের উপায়গুলি জনসাধারণের হাতে থাকিত, ভগবানের দেওয়া জল বাতাসের মত সহজে পাওয়া সম্ভব হইত। উৎপাদনের উপায়গুলি এখন শোষণের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। যদি কোন দেশ, দল বা ব্যক্তি সেগুলি দখলে রাখিয়া থাকে তাহা অন্যায়। এই অতি সরল নীতির ব্যতিক্রম ঘটার জন্যই আজ আমরা শুধু দীন ভারতে নয় পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও প্রচুর অভাব দেখিতে পাইতেছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১১-২৮, ৩৮১]

১৬২। প্রশ্ন—যাহা কেবল বলপ্রয়োগে পাওয়া যায় তাহা কি অহিংসার শক্তিতে রক্ষা করা সম্ভব ?

উত্তর—পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বলপ্রয়োগে যাহা অর্জিত হইয়াছে, অহিংসা ধর্মে সে ধন রক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না, বরং সেই দুষ্ট ধন ত্যাগ করাই প্রয়োজন।

প্রশ্ন—প্রকাশ্য বা গোপন বলপ্রয়োগ ছাড়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া মূলধন গঠন করার অন্য কোনো উপায় আছে কি ?

উত্তর—হিংসা ছাড়া অন্য উপায়ে ব্যক্তির পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাজশক্তির পক্ষে অহিংস উপায়ে অর্থ সঞ্চয় সম্ভব শুধু নয়, বাঞ্ছনীয়ও বটে।

প্রশ্ন—মানুষ বাহিরের বা অন্তরের সম্পদ্ যাহাই সংগ্রহ করুক তাহাই সমাজের অন্যান্য লোকের সাহায্যে ও সহযোগে সংগ্রহ করে। ইহাই যখন প্রকৃত অবস্থা তখন সেই ব্যক্তি কি নিজের সুবিধার জন্য সেই ধন ব্যয় করিতে পারে ?

উত্তর—না, পারে না।

[হরিজন, ১৬-২-৪৭, ২৫ (সংশোধিত)]

অর্থনীতি ও ধর্মনীতি

১৬৪। যে অর্থনীতি মানুষের নৈতিক মূল্য স্বীকার করে না তাহা সর্বৈব ভ্রান্ত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগের ফলে মানুষের নৈতিক মূল্যবিচার দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১২-২৪, ৪২১]

সামাজিক আদর্শ

১৬৬। আমার চেষ্টাই হইল প্রতিটি মানুষকে সমান মর্যাদা দেওয়া। বহু শতাব্দী ধরিয়া যাহারা শ্রমের দ্বারা বাঁচে তাহাদের

স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে, ছোটো করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের বলা হইয়াছে শূদ্র, যার অর্থ হইতেছে ক্ষুদ্র বা ছোট। আমি চাই তাঁতির ছেলে, চাষীর ছেলে বা শিক্ষকের ছেলের মধ্যে মর্যাদার কোনো তফাৎ থাকিবে না।

[হরিজন, ১৫-১-৩৮, ৪১৬]

রাজনৈতিক আদর্শ

১৬৭। আমার কাছে রাজনীতি বা রাজশক্তির নিজস্ব কোন সার্থকতা নাই। মানুষ যাহাতে জীবনের সকল বিষয়ে নিজেদের প্রগতি ঘটাইতে পারে, রাজশক্তিও সেই কাজে কিছু সাহায্য করিতে পারে। যখন সমাজ পূর্ণস্বনিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিতে পারিবে তখন আর ভোট দিয়া সরকার গঠন করার প্রয়োজন থাকিবে না। সে অবস্থাকে বলা যায় আত্মজ্ঞানী নৈরাজ্য। এই রাজ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে শাসন করে এবং এমনভাবে শাসন করে যে সে প্রতিবেশীর অন্তরায় হয় না। এ জ্ঞানদীপ্ত সমাজে রাজশক্তির প্রয়োজন হয় না বলিয়া সরকার থাকে না। কিন্তু এই আদর্শ অবস্থা হয়তো কোনোদিনই পুরাপুরি ঘটিবে না। সুতরাং থোরো (Thoreau) যে মহৎ সূত্র রচনা করিয়াছেন—সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যে সরকার সবচেয়ে কম শাসন করে—এই বাণীই আমাদিগকে পথ দেখাইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২–৭৩১, ১৬২]

১৬৮। সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমি ভয় পাই। কারণ সরকার নিজ ক্ষমতাবলে শোষণ বন্ধ করিয়া জনতার উপকার সাধন করে বটে, কিন্তু সকল ক্ষমতা সরকারের হাতে যাওয়ার ফলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা জন্মে। সকল উন্নতির মূলে আছে এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

হিংসাশক্তি ঘনীভূত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া রাজশক্তিরূপে মূর্ত হয়। রাজশক্তির স্রষ্টা হিংসাশক্তি—ব্যক্তির স্রষ্টা চিন্ময় ভগবান।

ব্যক্তির আত্মশক্তি জাগ্রত হইলে হিংসা ঘুচিয়া যায়। রাজশক্তি হিংসা ছাড়িতে পারে না—হিংসার বাহিরে তার অস্তিত্ব নাই।

আমি পরিষ্কার বুঝিয়াছি যে, সরকার যদি বলপ্রয়োগে ধনপতিদের ধন কাড়িয়া লয় তাহা হইলে ধন ও হিংসার জটিল জালে আবদ্ধ হইয়া সরকার কখনই হিংসার পথ ত্যাগ করিতে পারিবে না।

ধনপতিদের ধন কাড়িয়া সরকার সকল ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত না করিয়া ধনপতিদের 'ন্যাসপতি'তে পরিবর্তিত করাই শ্রেয়। আমার ধারণা, ব্যক্তিগত মালিকানার অপেক্ষা সরকারের অহিংস কর্তৃত্ব অধিক বিপজ্জনক। তবে যদি সরকারের কর্তৃত্ব নিবারণ করা আদৌ সম্ভব না হয় তাহা হইলে যত কম সম্পদ সরকারের হাতে যায় তাহার চেষ্টা করাই উচিত হইবে।

হিংসা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সরকারকে আমি প্রশংসা করি না, স্বেচ্ছায় গঠিত প্রতিষ্ঠান যত বেশী গড়িয়া ওঠে ততই ভালো।

[মডার্ন রিভিউ ১৯৩৫, ৪১২]

গণতন্ত্র

১৭০। হিংসায় অর্জিত স্বরাজ হিংস্র হওয়াই স্বাভাবিক। সে স্বরাজ ভারত ও পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৭-২৪, ২৩৬]

১৭১। আমি মনে করি বলপ্রয়োগ দ্বারা গণতন্ত্র স্থাপন করা যায় না। বাহির হইতে গণতন্ত্রের আদর্শ চাপানো সম্ভব নয়। অন্তর উহার প্রতিষ্ঠাভূমি।

[পট্টভি সীতারামায়া-কৃত কংগ্রেসের ইতিহাস, ৯৮২]

১৭৩। আমি মনে করি, কেবল পূর্ণ অহিংসার দ্বারাই ব্যক্তিকে স্বাধীন করা যায়। অহিংসার ভিত্তিতেই শুধু সমগ্র পৃথিবীর মিলনসৌধ গড়িয়া তোলা সম্ভব। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পশুশক্তির কোনো স্থানই থাকিতে পারে না।

[পত্রাবলী, ১৭৫]

১৭৫। আমার দেশের সেই স্বাধীনতা আমি কামনা করি, যে স্বাধানতা পাইয়া আমার দেশ অন্য সকল দেশের আদর্শ হইয়া উঠিতে পারে, আমার দেশের সম্পদ্ মনুষ্যজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে। যেমন দেশপ্রেম শিক্ষা দেয় যে, প্রতিটি মানুষ তার পরিবারের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে, প্রতিটি পরিবার তার গ্রামের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে, প্রতিটি গ্রাম তার জেলার জন্য প্রাণ দিবে, জেলাগুলি প্রদেশের জন্য মরিতে পারিবে, প্রদেশগুলি দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করিবে—তেমনই প্রতিটি দেশই যেন স্বাধীন হইয়া স্বেচ্ছায় মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য যেন মরিতেও দ্বিধা না করে। তাই আমার স্বজাতির প্রতি প্রেম বা জাতীয়তাবোধ এই কথাই বলে যে, আমার দেশ এমন স্বাধীনতা অর্জন করুক যাহাতে মনুষ্যজাতির স্বাধীনতার জন্য এই জাতি আমরণ প্রয়াস করিতে পারে। এর মধ্যে পরজাতিবিদ্বেষের কোনো স্থান নাই। আমাদের জাতীয়তাবোধ যেন এই আদর্শে গড়িয়া ওঠে।

[ইণ্ডিয়ান ভিলেজ, ১৭০]

আন্তর্জাতীয়তার আদর্শ

১৭৬। আমার ধর্ম কোনো ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নয়। যদি ধর্মে আমার বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে ভারতের মধ্যে আমার প্রেম সীমাবদ্ধ থাকিবে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-২০]

১৭৭। প্রত্যেক জাতি যদি কেবল নিজের দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লালায়িত হয় তাহাতে বিশ্বের সকল দেশের স্বাধীনতা আসিবে না। সকল দেশ পরস্পরের স্বাধীনতা কামনা করিয়া সেইমত প্রয়াস না করিলে বিশ্বের স্বাধীনতা সম্ভব নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৭-২৪, ২৩৬]

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা

১৭৯। কেহ যদি বলেন আত্মোন্নতির চেষ্টায় আমি সমগ্র-জাতিকে বিপন্ন করিয়াছি, এ উক্তিতে আমি সায় দিতে পারি না। কারণ আত্মোন্নতি ও জাতির উন্নতির মধ্যে কোনো বিরোধ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। বরং ব্যক্তির উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতি হইতে পারে না। এই সঙ্গে এও আমি সত্য বলিয়া মানি যে, জাতির উন্নতি না হইলে ব্যক্তির উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৩-৩১, ৫০]

গান্ধীজীর জীবনাদর্শ

১৮২। যদি মানবগোষ্ঠীকে আমি বুঝাইতে পারি যে প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীলোক, সে যতই সামান্য হউক না কেন, প্রত্যেকেই তাহার নিজের আত্মসম্মান ও স্বাধীনতার রক্ষক, তাহা হইলে আমার জীবনের করণীয় সাধিত হইবে। এই রক্ষাকবচ যার থাকিবে, সমগ্র পৃথিবী বিরূপ হইলেও সে পরাজয় স্বীকার করিবে না।

[হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৬-৮-৪৪]

রাজনীতি কেন

১৮৪। যদি মনে হয় যে আমি রাজনীতি চর্চায় লিপ্ত হইয়াছি, তার কৈফিয়ৎ দিতে হইলে বলিতে হয়, আজ রাজনীতির নাগপাশে সকলেই আমরা এমন আবদ্ধ হইয়া গিয়াছি যে শত চেষ্টাতেও তাহার কবল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। তাই আমি সেই মহানাগের সহিত যুদ্ধে নামিয়াছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৫-২০]

১৮৫। সমাজসংস্কারের কাজ রাজনৈতিক প্রচেষ্টার তুলনায় কম মূল্যবান নয় অথবা আমার সমাজসেবা রাজনৈতিক প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না। বস্তুতঃ আমি যখন বুঝিলাম যে আমার

সমাজসেবার কাজ রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা না পাইলে বহুপরিমাণে বাধা পাইবে, তখনই আমি রাজনীতিতে হাত দিয়াছি এবং ততটাই প্রয়াস করিয়াছি যাহাতে সমাজসেবার কাজে সাহায্য হয়। আমি এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সমাজসেবা বা আত্মশুদ্ধি যাহাই বলুন না কেন, সেই কাজ নিছক রাজনৈতিক প্রচেষ্টা যাকে বলা হয় তার চেয়ে বেশী মূল্যবান।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৮-৩১, ২০৩]

১৮৬। আমার জীবনের বিভিন্ন দিক আলাদা আলাদা করিয়া দেখিলে ভুল হইবে। আমার জীবনের সামগ্রিক গতির লক্ষ্য এক। বিভিন্ন দিকে আমার যে প্রয়াস, সকলগুলিরই গতি সেই লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত সুতরাং পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আমার সকল কাজের প্রেরণা মানুষের প্রতি অফুরন্ত প্রেম।

[হরিজন, ২-৩ ৩৪, ২৪]

আদর্শ ও বাস্তব

১৮৭। প্রাণবন্ত সত্তার বিচার করিতে হইলে নীরস ন্যায়ের বিধিমাত্র অবলম্বন করিয়া চলিলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে, কখনও কখনও মারাত্মক সিদ্ধান্তে পোঁছিতে হয়। মানুষের জীবনে কত যে অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ ক্রিয়াশীল রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিচারকালে তাহাদের একটি তথ্যও বাদ পড়িলে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইতে বাধ্য। এই কারণে চরম সত্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, কেবল গড় বা মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় মাত্র। সেও যদি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বিবেচনা করা হয় তবেই সেরূপ ধারণা করা সম্ভব।

[হরিজন, ১৪-৮-৩৭, ২১২]

১৮৯। অহিংসাকে কংগ্রেসের হাতে তৎকালীন উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্ররূপে তুলিয়া দিয়া আমি ভুল করি নাই, এ বিশ্বাস আমার আছে। রাজনীতিতে অহিংসার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় ছিল। দক্ষিণ

আফ্রিকাতেও আমি অহিংসাশক্তিকে কাজে লাগাইয়াছি। সেখানে এ কাজ সার্থক হইয়াছিল কারণ সেখানে বিরোধী দল ছিল অল্প-সংখ্যক আর ক্ষেত্র ছিল স্বল্পপরিমিত স্থানে সীমাবদ্ধ, সেই জন্য পরিচালনার সুবিধা ছিল। সে তুলনায় ভারতে বিশাল ভূখণ্ডে অগণিত মানুষ ছড়াইয়া আছে। তাই কার্যপ্রণালী সুসংবদ্ধ হইতে পারে নাই—জনতাকে প্রস্তুত করিবার সুযোগও ছিল কম। তবু যে সাড়া পাওয়া গিয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। আন্দোলনে আরও বেশী সাড়া পাওয়া যাইতে পারিত এবং ফলও অনেক বেশী কার্যকর হইতে পারিত। যেটুকু ঘটানো সম্ভব হইয়াছে তাহাতে আমি হতাশ হই নাই। যাহারা অহিংসাকে ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে কেবল তাহাদের লইয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হইলে হয়তো আমাকে একলাই কাজে নামিতে হইত। আমার নিজের বহু ত্রুটির সম্বন্ধে আমি অচেতন তাই আমার মত দোষে গুণে গড়া বহু নরনারীকে লইয়া অকূল সমুদ্রে অজ্ঞাত পথে বাহির হইয়াছিলাম। বাঞ্ছিত ধামে পৌঁছিতে পারি নাই কিন্তু ঝড়তুফানে তরী যে ডোবে নাই সে ঈশ্বরের দয়া।

[হরিজন, ১২-৪-৪২, ১১৬]

ব্যক্তিগত

১৯২। আমি যে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছি এমন দাবী আমি করিতে পারি না। ঈশ্বরপ্রেরিত কোন মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হওয়ার অধিকার আমার নাই। নিজেকে মাত্র দীন সত্যান্বেষী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি এবং প্রাণপণে তাঁহাকেই খুঁজিতেছি। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য আমার যথাসর্বস্ব দিতে আমি উন্মুখ। আমার যত কিছু প্রয়াস—সামাজিক, রাজনৈতিক, জনসেবামূলক বা নীতিধর্ম পালন—সবই সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। যেহেতু আমি জানি, বড় ও শক্তিমানের অপেক্ষা দীনহীনের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী

দেখা সম্ভব, তাই আমি দীনতার সাধনে বহু যত্ন করিতেছি। তাদের সেবা করাই একমাত্র পথ, তাই যাহারা সবার নীচে অবনমিত তাদের সেবার জন্য আমার এত ব্যাকুলতা। রাজনীতিতে প্রবেশ না করিলে এ সেবা করা হয় না। তাই রাজনীতির সংগ্রামেও যাই। রাজনীতির চর্চা আমি স্বেচ্ছায় বাছিয়া লই নাই—আমার পরম-সাধনে প্রয়োজন বলিয়াই রাজনীতির চর্চা করি—এতে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন নাই। ভারতের তথা বিশ্বমানবের সেবকের দলে আমি একজন অতি দীন জ্ঞানহীন অকিঞ্চন সেবক মাত্র।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৯-২৪, ২৯৮]

১৯৫। প্রশ্ন—আপনি কি সুখে আছেন?

উত্তর—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ—আমি সম্পূর্ণ সুখী।

প্রশ্ন—যখন আপনি গ্রামে ছিলেন না, তার চেয়ে কি এখন বেশী সুখে আছেন?

উত্তর—এর উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের বাহিরে। আমার সুখ বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না।

[হরিজন, ৮-৮-৩৬, ২০১]

চতুর্থ পর্ব

কাজই ধর্ম

১৯৮। একবার কল্পনা করিয়া দেখুন—কাজ না থাকার জন্য আমাদের দেশের ত্রিশ কোটি লোকের কী দুরবস্থা হইয়াছে—প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক কাজের অভাবে আত্মসম্মান হারাইয়া অধঃপতিত হইতেছে—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইতেছে। ঐ যে কুকুর, উহাকে ভগবানের কথা শুনাইলে যে ফল হইবে এই ক্ষুধিত জনতাকে ভগবানের কথা বলিলে তার চেয়ে বেশী কিছু হইবে না। এদের একমাত্র দেবতা—ক্ষুধার অন্ন। এই জনতাকে উপযুক্ত কাজ দিতে পারিলেই এদের ভগবানের বাণী শোনানো হইবে। সকালের আহার সারিয়া সুস্থভাবে বসিয়া আমরা ভগবানের কথা আলাপ করিয়া আনন্দ পাই—আমাদের দ্বিপ্রহরের আহার যথাসময়ে পাইব এ ভরসা মনে আছে। যারা দিনে দুইবার খাইতে পায় না তাদের ভগবানের কথা কেমন করিয়া শুনাইব? তাদের ভগবান কেবল অন্নের আকারেই দেখা দিতে পারেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১০-৩১, ৩১০]

২০০। ভক্ত হনুমান বক্ষ দ্বিধাভিন্ন করিয়া দেখাইয়াছিলেন হৃদয়ে জাগিয়া আছে কেবল রামনাম। হনুমানের মত বক্ষ চিরিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই কিন্তু ইহা সত্য যে যদি কেহ আমার বক্ষ ভিন্ন করিয়া পরীক্ষা করে, সেখানে রামের প্রতি প্রেম ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। সেই রামকে আমি লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু নরনারীর মধ্যে সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৩-২৭, ৯৩]

ভিক্ষার প্রয়োজন নাই, শোষণ বন্ধ কর

২০৩। দানে দরিদ্র বাঁচিবে না। কেবল দুই শ্রেণীর লোকের অধিকার আছে দানে বাঁচিয়া থাকার। প্রথম ব্রাহ্মণ—যার কিছুই

নাই, ধর্মকথা শুনানোই যাঁর ব্রত। দ্বিতীয়, অন্ধ আতুর ব্যক্তি। কর্মক্ষম লোকদের কাজ না দিয়া বৃত্তিভোগী করিয়া রাখা বড় লজ্জার, বড় দুঃখের ব্যাপার। এ লজ্জা দূর করিবার জন্যই আমি চরখার বাণী বহন করিয়া দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-২-২৭, ৫৮]

২০৬। অনেকে হয়তো বলিবেন, "অন্নের জন্য শ্রম করার প্রয়োজন আমার নাই—আমি চরখায় সুতা কাটিব কেন?" তাদের আমি বলিব, বিনা পরিশ্রমে যিনি নিজের অন্নবস্ত্রের অভাব মোচন করেন, তিনি অন্যকে—নিজের দেশের লোককে, শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকেন। তাঁর সম্পদের প্রতিটি পয়সা কোথা হইতে আসে তা সন্ধান করিলে আমার উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

ধনগর্বে অন্ধ হইয়া আমার বহু মূল্যবান পরিত্যক্ত বস্ত্র বস্ত্রহীনকে দান করিয়া যদি আত্মপ্রসাদ লাভ করি তাহা হইলে দরিদ্রকে অপমান করা হইবে। তাহাদের প্রয়োজন কাজ, খাটিয়া অন্ন বস্ত্র অর্জন করাই তাহাদের একমাত্র কাম্য। তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া পরিত্যক্ত বস্ত্র ও খাদ্য দিলে তাহাদের কল্যাণ হইবে না; বরঞ্চ আমরা ধনীরাই যে তাহাদের দারিদ্র্য ঘটানোয় সহায়তা করিয়াছি ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু আছে তাহাই তাহাদিগকে দেওয়া উচিত এবং তাহাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই আমাদের একমাত্র করণীয় হইবে।

ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পরিশ্রমের দ্বারা তাহার অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য। যে শ্রম না করিয়া আহার করে তাহার চুরি করা হয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-২১, ৩২৫]

২০৮। যে সকল কাজ প্রকৃতিদত্ত ও প্রয়োজনীয় সেগুলি করাও সহজ। কেবল অভ্যাস করিলেই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়,

একই কাজ বার বার করা প্রয়োজন হয়। বার বার একই কাজ করিতে পারাই স্বরাজ। ইহাকেই বলে যোগ। পাঠক যেন কাজের এই অনিবার্য পুনরাবৃত্তির জন্য ভীত না হন। প্রকৃতির ধর্মই পুনরাবৃত্তি। সূর্য প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সকালে দেখা দিবেই। মনে করুন হঠাৎ সূর্য ক্লান্ত হইয়া কাজে ইস্তফা দিয়া খেলায় মন দিল, তখন এই সৌরজগতের অবস্থা কী হইবে? এই যে কাজের পুনরাবৃত্তি, এরও রকমফের আছে। একরকম বার বার করা কাজ আমাদের বাঁচাইয়া রাখে, আবার আর একরকম একঘেয়ে কাজ আছে যা মানুষকে নষ্ট করে। আমাদের নিত্যকার প্রয়োজনীয় কাজ বার বার করিলে তাতে উৎসাহ বাড়ে, পরমায়ুও বাড়ে। শিল্পী অক্লান্তভাবে শিল্প সৃষ্টি করিয়াও থামিতে চাহে না। যে কাটুনী সুতা কাটায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছে, সে ক্লান্ত না হইয়া দীর্ঘকাল সুতা কাটিতে পারে। অভ্যস্ত কাটুনী চরখার ঘর্ঘরে আনন্দলাভ করে, কাটার ছন্দও সে ঐ আওয়াজে টের পায়। ভারত যখন বহু দিনের বহু চেষ্টার ফলে স্বরাজ লাভ করিবে সে একটি পরম রত্ন পাইবে, যে পাওয়ার আনন্দ অনন্তকাল তাহাকে শান্তি দিবে। কিন্তু চরখা ছাড়া সে স্বরাজ আনিতে পারে না। সেই কারণে আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিক্ষা চরখা চালানোর বিচারের মধ্যেই আছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৮ ২১, ২৬২]

উৎপাদক শ্রম

২১১। প্রজা সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা তাহাদিগকে যজ্ঞধর্ম প্রদান করিলেন, বলিলেন, "এই যজ্ঞের দ্বারা তোমাদের কল্যাণ হইবে—যজ্ঞ তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ করুক।" গীতা বলেন, "যে যজ্ঞকর্ম সম্পাদন না করিয়া আহার করে সে চুরি করিয়া খায়।" বাইবেলে আছে—"মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিবে।" যজ্ঞ অনেক প্রকার হইতে পারে, তার মধ্যে অন্নের জন্য

শ্রম অন্যতম। যদি প্রত্যেকেই নিজ অন্নের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হইত তাহা হইলে সকলেই যথেষ্ট অন্ন পাইত, অবকাশও পাইত প্রচুর। দেশে লোক বাড়িয়া গেল বলিয়া কেহ ব্যস্ত হইত না, রোগ অন্তর্হিত হইত, আমাদের চতুর্দিকে যত দুঃখ দেখিতে পাই তাহা দূরীভূত হইত, অন্নবস্ত্রের জন্য এই শ্রমই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই শ্রম ছাড়াও মানুষ দেহ ও মন দিয়া আরও অনেক কাজ করার সুযোগ পাইবে। সেগুলি হইবে তাহার প্রেমের দান অথবা সর্বভূতের কল্যাণের কাজ। এই প্রকার অবস্থা আনিতে পারিলে কেহ ধনী কেহ নির্ধন, কেহ উচ্চ কেহ নীচ, কেহ স্পৃশ্য কেহ বা অস্পৃশ্য এরূপ ভেদ আর থাকিবে না।

"লোক কি বুদ্ধির কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে না?"

—না, তাহাতে মঙ্গল নাই। দৈহিক প্রয়োজন মিটাইতে দৈহিক শ্রম। এখানে বাইবেলের উক্তি প্রযোজ্য—"যাহা সীজারের প্রাপ্য তাহা সীজারকে দাও।"

কেবলমাত্র মনের বা বুদ্ধির কাজ আত্মার জন্যই করা উচিত— সে কারণে কাজই তাহার নিজের পুরস্কার। এ কাজের জন্য মূল্য চাওয়া উচিত নয়। সমাজে আদর্শ অবস্থা আনিতে পারিলে ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি বুদ্ধিমান লোক সমাজের কল্যাণের জন্যই কাজ করিবেন, নিজের লাভের জন্য নয়। অন্নের শ্রমের ধর্ম মানিয়া চলিলে সমাজে একটি নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়া যাইবে।

[হরিজন, ২৯-৬-৩৫, ১৫৬]

শরীরশ্রম বনাম বৌদ্ধিক শ্রম

২১৩। প্রশ্ন—রবীন্দ্রনাথ বা রমনের মত লোককে শরীরশ্রমের দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিতে হইবে এ যুক্তির তাৎপর্য কি? এরূপ

মনীষীদের শরীরশ্রম করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে না কি? যাঁরা বুদ্ধি দিয়া কাজ করেন আর যাঁরা শরীরশ্রম করেন উভয়েই সমাজের প্রয়োজন সাধন করেন।

উত্তর—বুদ্ধির কাজ মূল্যবান; সমাজজীবনে বুদ্ধির বিশেষ স্থান আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে শরীরশ্রম না হইলে চলিতে পারে না এই কথাই আমি বলি। সেইজন্যই শ্রমধর্ম পালন করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এ ধর্ম পালন করিলে বুদ্ধির কাজেরও উন্নতি হইবে। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধিক চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের যাবতীয় শ্রমও সাধন করিতেন, এই কথাই আমরা বলি। যদি তাঁরা তাহা নাও করিয়া থাকেন আধুনিক কালে শরীরশ্রম অপরিহার্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই সূত্রে মহামতি টলস্টয়ের জীবনকাহিনী উল্লেখ না করিয়া পারি না। রাশিয়ার কৃষক বণ্ডারেফ্ যে অন্ন-শ্রমের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন টলস্টয় কেমন করিয়া সেই তত্ত্বের বহুলপ্রচার করিয়াছেন তাহা সকলের জানা উচিত।

[হরিজন, ২৩-১-৪৭, ৩৬]

২১৪। প্রশ্ন—সকল সময়েই আপনি দান করার বিরোধিতা করিয়াছেন এবং কোন লোকই শরীরশ্রম হইতে রেহাই পাইতে পারে না, এই তত্ত্বই প্রচার করিতেছেন। যে সকল লোক বৌদ্ধিক শ্রমে অভ্যস্ত, বিশেষ করিয়া যাঁহারা বিগত (নোয়াখালির) দাঙ্গাহাঙ্গামায় সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কী করিতে বলেন? তাঁহারা কি নিজের বাসভূমি ত্যাগ করিয়া যেখানে তাঁদের অভ্যস্ত কাজ যোগাড় করিতে পারিবেন সেখানে গিয়াই বসবাস করিবেন, অথবা সকলকেই অন্নের জন্য শরীরশ্রম করিতে হইবে—এই যে আদর্শ আপনি প্রচার করেন তদনুযায়ী জীবনের ধারা পরিবর্তন করিবেন? তাঁরা জীবনে যে কুশলতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার কি কোন মূল্যই থাকিবে না?

উত্তর—এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী স্বীকার করিয়াছিলেন যে, বহুকাল হইতে তিনি দয়ার দান বলিতে যাহা সাধারণতঃ বুঝায় সেইরূপ সাহায্য লইয়া বাঁচিয়া থাকার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন এবং বহুকাল হইতে অন্নের জন্য শরীরশ্রমের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া যাইতেছেন। এই সূত্রে গান্ধীজী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জামান সাহেব এবং জনৈক পুলিস অফিসার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। উদ্বাস্তুদের খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার বিষয়ে তাঁর মত তাঁরা বুঝিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই তাঁরা স্থির করিয়াছিলেন যে, কচুরীপানা উদ্ধার, রাস্তা মেরামত, গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ অথবা নিজের নিজের বাস্তু ও কৃষি জমি সংস্কারের কাজে শরণার্থীরা নিযুক্ত হউন। যাঁরা এই সব কাজে নিযুক্ত হইবেন তাঁরা খয়রাতি সাহায্য পাইবার যোগ্য। গান্ধীজীর মতে এ প্রস্তাব অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু আদর্শবাদী হইলেও গান্ধীজী বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন না, এজন্য তিনি সহসা উদ্বাস্তুদের এই সকল কাজ করিতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর মতে শরণার্থীদের জন্য রকমারি কাজ উপস্থিত করা প্রয়োজন এবং তাঁহাদের এক মাস সময় দিয়া ইহা বলা উচিত যে, যদি তাঁরা এই সময়ের মধ্যে এর কোন একটি কাজ করিতে প্রস্তুত না হন অথবা অন্য কোন প্রকার যোগ্য কাজের প্রস্তাব উপস্থিত না করেন এবং শারীরিক অসুস্থতা না থাকা সত্ত্বেও যদি কাজে বিরত থাকেন, তাহা হইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহা বলিয়া দিতে হইবে যে এক মাস অন্তে তাঁহাদিগকে আর খয়রাতি সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে না। তিনি শরণার্থী ও তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ দিয়াছিলেন যে তাঁরা যেন এই বিষয়ে সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করেন। কোন ব্যক্তির পক্ষেই বিনাশ্রমে খয়রাতি সাহায্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

[হরিজন, ২-৩-৪৭, ৪৭]

চরখা

২১৬। বহুকাল হইতে ভারতে মানুষ খাইতে না পাইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। পৃথিবীতে এমন দেশ আর কোথাও নাই। কাজেই এই সমস্যাও আর কোথাও নাই। সুতরাং এই সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থাও অপর দেশের নকল করিয়া হইতে পারে না। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কেমন করিয়া এই বিপুল দুর্গতি ঘটিল তাহা জানা দরকার। এ দেশে এই দুর্গতির কারণ হইল খাদ্যাভাব। খাদ্যাভাব ঘটে হয় অনাবৃষ্টি, নয় অতিবৃষ্টি ও বন্যার জন্য। এ দেশের লোকের কৃষি ভিন্ন অপর কোন কাজও নাই। এজন্য তারা সব সময়ই বেকার। এই কর্মহীনতা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে যে তারা আলস্যে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার লোক বাধ্য হইয়া এই খাদ্যাভাব ও কর্মহীনতা লইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে। হয়তো বন্যা নিবারণের উপায় করা সম্ভব কিন্তু সে কাজে বহু বৎসর লাগিবে। কৃষকদের বুঝাইয়া পড়াইয়া উন্নততর কৃষিব্যবস্থা হয়তো করা যায়, সে কাজে আরও বেশী সময় লাগিবে। যখন আমরা বন্যা নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিব এবং কৃষকরাও উন্নত ধরনের চাষ করিতে থাকিবে তখনও দেখা যাইবে কৃষিকাজ করার পরেও বহু সময় কৃষকদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে অনাহারে নষ্ট হইয়া যাওয়া কেমন করিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তর হইল—'চরখার সাহায্যে'।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩১-১০-২৪, ৩৫৭]

২১৯। ভারতের এই ক্রমবর্ধমান নিদারুণ দারিদ্র্য ঘুচাইতে পারে সকল কুটিরশিল্প নয়, কেবল একটি মাত্র—সেটি চরখা। এই একটি কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিলে আবার বহু কুটিরশিল্প তাহার সঙ্গে জাগিয়া উঠিবে। চরখাকে ভিত্তি করিয়া আমি বুনিয়াদী গ্রাম রচনা করিতে চাই। চরখাকে কেন্দ্র করিয়া

গ্রামের বিচিত্র জীবন তারই চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া উন্নীত হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৫-২৫, ১৭৭]

২২২। ভারতের গ্রামে কল্যাণকর বা প্রয়োজনীয় যত শিল্প আছে তার একটিকেও বাদ দিয়া চরখা চালানোর কথা বলা দূরে থাক, আমি সেরকম প্রস্তাব মনেও ভাবি নাই। চরখা-ভাবনার মূল ভিত্তি ভারতের কোটি কোটি অর্ধ-বেকারের অস্তিত্বের উপর স্থাপিত। এ কথা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যে ভিত্তির উপর চরখা-ভাবনাকে স্থাপন করিয়াছি তাহা যদি ভ্রান্ত হয় তবে এ ভাবনার কোন স্থান নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৫-২৬, ১৯১]

২২৪। যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের প্রতিটি নর ও নারী তার চরখা নিয়মিত না চালায়, আমি ক্ষান্ত হইব না। যদি এর চেয়ে বেশী ভালো কিছু পাওয়া যায় তাহা হইলে চরখা পুড়াইয়া ফেলাই উচিত হইবে। ভারতের কোটি কোটি লোক যেখানে যে আছে সেখানে থাকিয়াই যে কাজে নিজের উপকার করিতে পারে তাহা হইল এই সুতাকাটা।

দুর্ভাগ্য যে, বস্ত্রবিষয়ে আমরা রুচি পরিবর্তন করিতে পারিতেছি না। তাই আমাদের কোটি কোটি স্বদেশবাসী সারা বছরের কাজ পায় না। বছরে অন্ততঃ চার মাস তারা অনিচ্ছাকৃত ছুটি ভোগ করে। এ তথ্য আমি নিজের কল্পনার জোরে আবিষ্কার করি নাই। এ আবিষ্কার বহু ইংরাজ রাজকর্মচারীর, যাঁরা এ দেশের লোকদের মধ্যে থাকিয়া শাসনকার্য চালাইয়াছেন। এঁদের কথা ফেলিয়া দেওয়ার উপায় নাই। যদি এই টাকার থলি লইয়া গিয়া অনাহারী ভগ্নীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিই তাহাতে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। বরঞ্চ এই ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদের আত্মা কলুষিত হইবে, তারা

সত্যই ভিক্ষুক হইয়া পরের দয়ায় বাঁচিতে শিখিবে। যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক অথবা যে জাতি ভিক্ষা লইয়া বাঁচিয়া থাকে তাহারা ঈশ্বরের কৃপালাভ করিতে পারে না। তাহাদের দুর্গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। আমরা কি করিতে পারি? গৃহস্থের বাড়ীর মা বোনেদের কিছু কাজ দিতে পারি। এ কাজে কোন চাতুরী নাই, তাদের আত্মসম্মান হানি হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই, তদুপরি কাজটায় অপছন্দ করার কিছু নাই। হয়তো এক আনা পয়সা আপনার কাছে কিছুই নয়। দুই তিন চার বা পাঁচ মাইল হাঁটার শ্রমটুকু না করিয়া আলস্যবশতঃ অনেক এক আনা আমরা নষ্ট করি। কিন্তু যখন এই এক আনা দরিদ্র মা বোনেদের হাতে যায় তখন তার দাম অনেক বাড়িয়া যায়। চরখায় খাটিয়া তিনি এই পয়সার বিনিময়ে আমাদের দেন তাঁর মঙ্গল হস্তের দান এই সুন্দর সূতা, যে সূতা তাঁর ভালোবাসার সঙ্গে জড়িত। এই সুতায় কাপড় বুনিয়া পরিলে রাজা মহারাজারও গৌরব বাড়িবে। এর সঙ্গে জড়িত আছে জীবনের ইতিহাস।

একই কথা বার বার নানাভাবে বলিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাহি না—যদিও এই কথাই সকল সময়ে আমার মনে জাগিয়া থাকে, এই কথাই আমার পরম প্রিয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৯-২৭, ৩১৩]

২২৯। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামনে আমি চরখার অর্থনীতির দিক্‌টি তুলিয়া ধরিতে চাই না। চরখার ধর্ম কি তাহাই তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন। চরখায় সূতা কাটিয়া ও খাদি ব্যবহার করিয়া তাঁহারা দরিদ্রের প্রতি তাঁহাদের সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারিবেন। দরিদ্রদের আর্থিক উপকার করিলে তাহাদের আধ্যাত্মিক উপকার করা হয়। এই প্রকার সাহায্য দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়েই তাঁদের অন্তর স্পর্শ করা যায় না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৫-২৭, ১৪২]

খাদির কাজ ব্যবসা নয়

২৩২। গ্রামের সেবা শহরের লোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে এ অবস্থা কাম্য নয়। গ্রামের লোকেদের এ বিষয়ে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরা বুঝিয়া লইয়া নিজেদের শক্তিতে তাহার সমাধানের জন্য প্রয়াস করে। নূতন নূতন কাপড়ের কল গড়িয়া দেশের লোকের জন্য কাপড় সৃষ্টি করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে সরকারী ব্যবস্থায় কাপড়ের দাম কমাইয়া রাখাও সম্ভব। ইহাতে দেশের লোককে শোষণ করার সুযোগ থাকিবে না—মিলশ্রমিকরা যথেষ্ট বেতনও পাইতে পারে। খাদির বিশেষ দাবী হইল—আজ আমাদের দেশের জনসাধারণ যে আলস্য ও জড়তায় নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে সেই দুর্দশা হইতে একমাত্র খাদিই তাহাদের উদ্ধার করিতে পারে এবং খাদিই তাহাদের নব বলে বলীয়ান করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইতে সমর্থ করিবে।

প্রশ্ন—সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া খাদির মূল্য কি এইটুকু দাঁড়ায় যে, যারা বছরে কয়েক মাস ধরিয়া বেকার থাকিতে বাধ্য হইয়া চরম দুর্দশায় রহিয়াছে খাদি তাদের জীবিকা উপার্জনের একটি অভিনব উপায়মাত্র হইবে?

উত্তর—খাদি এ কাজ নিশ্চয়ই করিবে, কিন্তু খাদির দাবী এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত স্বরাজের ভিত্তি খাদির সূতা দিয়া রচিত হইবে।

[চরখায় স্বরাজ, ৮]

খাদির নয়া পরিকল্পনা, স্বরাজ ও অহিংসা

২৩৪। খাদির কার্যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি তাহাতে ইহা বুঝিয়াছি যে, শহরে ও গ্রামে খাদিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে যাহাতে কেবল সুতার পরিবর্তে খাদি পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজকাল প্রতি এক টাকার খাদির জন্য

মাত্র এক আনা মূল্যের সূতা জমা দেওয়ার নিয়ম রহিয়াছে। প্রথম অবস্থায় এরূপ চলিতে পারে। যখন জনসাধারণ এই নূতন নিয়মের অর্থ বুঝিতে পারিয়া সূতাকাটায় অভ্যস্ত হইবে তখন কেবল মাত্র চরখার সূতার পরিবর্তে খাদি কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থাই সংগত। কালক্রমে এমন হওয়াই উচিত যে জনসাধারণ সূতার পরিবর্তে খাদি বস্ত্র লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। যদি এরূপ না ঘটে, লোকে সূতাকাটা পছন্দ না করে, তাহা হইলে অহিংস উপায়ে স্বরাজ পাওয়া সম্ভব হইবে না।

এই নূতন নিয়মের বিরুদ্ধে যত প্রবল যুক্তি উপস্থিত হইয়াছে তার মধ্যে একটি হইল যদি শহরের লোকেরাও নিজের প্রয়োজনমত সূতা কাটিতে থাকে তাহা হইলে আজ যে খাদি সঙ্ঘ গরীব গ্রামবাসীকে কিছু পরিমাণ সাহায্য করিতে পারিতেছে, সে সুবিধা লোপ পাইবে। সেই সঙ্গে গ্রামবাসীরা একদিন যে নিজের কাপড় নিজেরাই করিয়া লইবে সে আশা কল্পনাতেই রহিয়া যাইবে। তর্কের খাতিরে না হয় ধরিয়া লইলাম যে, আক্রোশ বশতঃ বা আলস্য বশতঃ শহরের লোক খদ্দর ব্যবহার করা ত্যাগ করিল। ফলে সূতা কাটিয়া ও খাদি বুনিয়া যে মজুরা পাওয়া যাইত তাহা না পাইয়া গ্রামের লোক খাদির কাজ ছাড়িতে বাধ্য হইল—ইহাতে কি লোকসান হইবে? গ্রামের গরীব লোকেরা অন্য কোন উপায়ে রোজগার করিয়া বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ লোক এইভাবে বাঁচার চেষ্টা করিতে পারে কিন্তু কোটি কোটি লোক এভাবে বাঁচিতে পারে না। বিড়ি বাঁধিয়া লোকে চরখা কাটার চারগুণ কি তারও বেশী রোজগার করে। মিলে কাজ করিয়া অনেক লোক ধনী হইয়া গিয়াছে। এই সকল তত্ত্ব বিচার করিলে এই ছবিই ফুটিয়া ওঠে যে, যাহারা আজ বাধ্য হইয়া উপবাস করিতেছে তাহারা উপবাস করিয়াই মরিবে আর অল্প কয়েকজন যাহারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছে তাহারা নির্ধনকে শোষণ করিতেই থাকিবে।

ভারতের কলকারখানা ও তার সঙ্গে শহরের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন জনতার অবস্থার উন্নতি হওয়ার কোনই আশা নাই। বরঞ্চ তার ফলে বেকারের দারিদ্র্য বাড়িবে, খাইতে না পাইয়া রোগও বেশী হইতে থাকিবে। এই অবস্থা দেখিয়াও শহর-বাসীরা যদি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে তাহা হইলে আর বলার কিছু থাকে না। তাহা হইলে ভারতে প্রবলেরই রাজত্ব কায়েম হইবে, সত্য ও অহিংসার কোন ভাবনা থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, এ রাজ্যে খাদির কোনই স্থান থাকিবে না। সেই অবস্থায় সামরিক শিক্ষা হইবে বাধ্যতামূলক। এই অবস্থার কথা চিন্তা না করিয়া আমাদের দেশবাসী কোটি কোটি বুভুক্ষু নরনারীর ভাবনাই ভাবা প্রয়োজন। যদি এই অধঃপতিত ভারতবাসীর সুখ বিধান করিতে হয়, যদি ইহাদের বাঁচাইয়া রাখা কাম্য হয়, তাহা হইলে চরখাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে—সকলকে স্বেচ্ছায় সূতা কাটিতে হইবে। হিংসার ক্ষেত্র সংকুচিত হইলে অহিংসার প্রয়োগক্ষেত্র লোপ পাইতে পারে। সূতার পরিবর্তে খাদি পাওয়ার নিয়ম প্রচলন করিতেই হইবে এবং এই প্রথা যাহাতে বহুল প্রচলিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এমন হইতে পারে যে ইহার ফলে অনেক 'খাদি ভাণ্ডার' বন্ধ হইয়া যাইবে, খাদি-বোনা তাঁতিকে খাদি ছাড়িতে হইবে, তবুও ইহাতে সত্যের জয় হইবে। প্রমাণ হইবে যে, লোকের মনে অহিংসায় বিশ্বাস নাই, খাদি পরিলেই স্বরাজ পাইব, কেবল এই মিথ্যা আশায় তাহারা খাদি পরে। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, এই খাদিতে স্বরাজ আসিতে পারে না—যদি কোনো রকমে স্বরাজ পাওয়াও যায় তাহা হইলে সে স্বরাজ ত্যাগ করাই শ্রেয় হইবে। তাহা হইলে কেমন করিয়া আমি জানিয়া শুনিয়া জনসাধারণকে এই ভুল পোষণ করিতে বলিব? এরূপ অবস্থা হইলে স্বর্গত শ্রীচিন্তামণির ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া যাইবে। তিনি বলিয়াছিলেন "গান্ধীজীর মৃত্যুর পরই গান্ধীজী ও তাঁর চরখার প্রতি

লোকের বিরাগ ফাটিয়া পড়িবে, তারা চরখা দিয়া তাঁর চিতা সাজাইয়া দুইটিকেই ভস্মে পরিণত করিবে।" চরখার সূতা যদি অহিংসার প্রতীক না হয় তাহা হইলে জীবিতকালেই আমি আমার সারা জীবনের ভুল সংশোধন করিয়া চরখা গড়িয়া কাঠের অপব্যয় করা বন্ধ করিতে পারিব। কিন্তু আমি ঐ ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভারতের কোটি কোটি লোকের স্বরাজ হিংসার দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না এ সত্য লোকে বুঝিয়াছে। ভারত আজ পৃথিবীর লোকের কাছে মূল্যবান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারত আরও মহান্ হইতে পারে কিন্তু সে কেবল অহিংসার দ্বারা। ভারতের কোটি কোটি লোক যদি অহিংসার কার্যকারিতা প্রমাণ করিতে চায় তাহা হইলে চরখাকে সকল প্রচেষ্টার মূলে রাখিতে হইবে। শহরের লোক স্বরাজ লাভের জন্য বেশী ব্যাকুল তাই তাঁদের উচিত এই সত্যটিকে উপলব্ধি করিয়া সূতা কাটা ও খাদি পরার মাধ্যমে অহিংস স্বরাজ লাভ করা।

[চরখায় স্বরাজ, ৫]

পঞ্চম পর্ব

মনুষ্যসমাজে শিল্পের স্থান—নূতন ও পুরাতন

শিল্পসর্বস্ববাদ (Industrialism)

২৩৫। যতদূর আমি বুঝিতে পারিয়াছি, শিল্পপরায়ণতা মানুষের অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইবে—এ আশঙ্কাই প্রবল হইতেছে। বর্তমান অবস্থায় কোনো দেশের শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে অন্য দেশকে শোষণ করিবার সুযোগের উপর—অন্য দেশের বাজার দখল করিয়া সেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজ দেশের শিল্পসম্ভার বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে শিল্পের সার্থকতা ঘটে। ভারত শিল্পসর্বস্ব হইবার চেষ্টা করিলে অন্য দেশকে শোষণ করিবার চেষ্টা তাহাকে করিতেই হইবে। তখন ভারত শোষিত দেশের অভিশাপ স্বরূপ হইয়া পৃথিবীর বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। অন্য দেশকে শোষণ করার জন্য ভারত শিল্পসর্বস্ব হউক এ কামনা করিবার কোন হেতু নাই। এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতা কোথায়, ভাবিয়া দেখুন। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটি লোকের কর্মসংস্থান করাই আমাদের সমস্যা। ইংলণ্ডের তিন কোটি লোকের কর্মসংস্থানের সমস্যা এতই গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে, ইংলণ্ডের মত উন্নত দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরাও তাহার সমাধান করিতে পারিতেছেন না। (১৯৩১ সালের অবস্থা)। শিল্পায়িতকরণের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃত শিল্পসজ্জা গড়িয়া তুলিয়া এখন ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হইতে চলিয়াছে। ভারতে কয়েকটিমাত্র কারখানা গজাইয়া উঠিয়া সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়াছে। আজ ভারতে গণজাগরণ হওয়ায় বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতে যেরূপ হইয়াছে সেইরূপ জাগরণ আফ্রিকাতে হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ্, খনিজ সম্পদ্ ও লোকবল অনেক বেশী। শক্তিশালী ইংরাজ জাতিও আফ্রিকার

জনশক্তির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কালক্রমে আমাদের চোখের সামনে আফ্রিকার বর্বর জাতিদের মহত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইবে। যখন ইউরোপের শিল্পপণ্য কয়েক বৎসরের অন্তে আর আফ্রিকার বাজারে বিক্রয় হইবে না তখন প্রমাণ হইবে, তারা বর্বর নয়, সত্যই মহৎ। ইউরোপের শিল্পসর্বস্ববাদ আজ দুর্দিনের সম্মুখীন হইয়াছে—এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে শিল্পপরায়ণতা ভারতের মঙ্গল করিবে এমন সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-৩১, ৩৫৫]

২৩৭। এ কথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, পাশ্চাত্য জগৎ শিল্পপরায়ণতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে এবং ধরণীকে প্রভূততম মাত্রায় শোষণও করিতেছে। প্রকৃত অবস্থা যাহা বর্তমানে প্রকট হইয়াছে তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই শিল্পসভ্যতা মানুষের একপ্রকার ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে কারণ ইহার ফল হইতেছে অকল্যাণকর। মনোহারী প্রশস্তি বচনে বা বিভ্রান্তিকর বাক্যজালে কত আর মানুষকে ভুলাইতে পারা যাইবে? বাষ্পীয় পোত বা টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য নয়। শিল্পসর্বস্ব মনোভাব ও তার আনুষঙ্গিক পাপগুলি ঘুচিয়া যাইবার পরও যদি টেলিগ্রাফ বা বাষ্পীয় পোত থাকিয়া যায় তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই সকল যন্ত্রই মুখ্য বস্তু নয়। মানুষের স্থায়ী কল্যাণের জন্য এগুলি অপরিহার্য নয় বলিয়াই জানি। এতদিনে আমরা স্টীম ও বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার সম্যক্ জানিয়াছি। যখন তাদের সাহায্যে মানুষের মঙ্গল ঘটিবে তখন তাদের ব্যবহার করা আমাদের উচিত। বিশেষতঃ যখন আমরা শিল্পের প্রতি অহেতুক আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিব তখন স্বাধীনভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারা উচিত। আপাততঃ আমাদের লক্ষ্য হইবে এই শিল্পসর্বস্ব মনোভাব বর্জন করা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-১০-২৬, ৩৪৮]

মূল কারণ

২৩৯। আজ মানুষের যে দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহা সহ্যাতীত। এই দীনতা ঘুচাইতে হইবে কিন্তু শিল্পায়িতকরণে এ দুর্গতি দূর হইবার কোন আশা নাই। সনাতন কর্মপদ্ধতি—যেমন গরুর গাড়ী —এ দুর্গতির জন্য দায়ী নয়। এই দুর্গতির মূলে আছে আমাদের স্বার্থপরতা এবং প্রতিবেশীর জন্য দরদ না থাকা। যদি আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি কোন মমতা না থাকে, কোন অভিনব বৈপ্লবিক ব্যবস্থাই কল্যাণের কাজে লাগিবে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-১০-২৬, ৩৪৮]

২৪১। যে মূল সমস্যা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি তার সমাধান এত জরুরী যে তার তুলনায় রেল টেলিগ্রাফ ব্যবহার করা উচিত কি অনুচিত এ সমস্যা তুচ্ছ। আমি নিজে এই যন্ত্রগুলির সুবিধা নিতে কার্পণ্য করি না। ভারতের সকল লোক এই সব যন্ত্রের ব্যবহার ত্যাগ করিবে এরূপ আশাও করি না, অথবা স্বরাজ আসিলে এদের ব্যবহার কমিবে এরূপ আশাও করি না। স্বাধীন ভারতকে আমি এইটুকু বুঝিয়া দেখিতে বলিব যে, কেহ যেন মনে না করে যে এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার মানুষের নৈতিক উন্নতির কিছুমাত্র সাহায্য করে অথবা এই যন্ত্র না হইলে আমাদের বাস্তব উন্নতি অসম্ভব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-১১-২১, ৩৬৮]

যন্ত্রের ব্যবহার

২৪৩। আমাদের জীবনে যন্ত্রেরও স্থান আছে—তাড়াইয়া দিলেও যন্ত্র যাইবে না। কিন্তু যন্ত্র মানুষের শ্রম কাড়িয়া লইবে এরূপ ঘটিতে দেওয়া কদাচ উচিত নয়। উন্নত লাঙ্গল উপকার করিতে পারে, কিন্তু যদি কোন কৌশলী যন্ত্রী এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করে যাহার সাহায্যে এক জনেই ভারতের সকল জমি চষিয়া দিবে তাহা হইলে সকল ফসলের মালিকানা তাহারই করায়ত্ত হইবে। ফলে

যদি ভারতের কোটি কোটি কৃষিজীবী অপর কোন কাজ না পায়, উপবাস করিবে। অলস হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়া তাহারা যেমন নির্বোধ হইয়াছে ক্রমে তারা সকল বোধই হারাইবে। যত দিন যাইতেছে, ভারতের আরও অনেক মানুষ অতিক্রুত সেই অবাঞ্ছিত অবস্থায় আসিতেছে।

গ্রামীণ শিল্পের যন্ত্রে যদি কোন উন্নতি সাধিত হয় আমি সাগ্রহে তাকে বরণ করিয়া লইব। কিন্তু এ কথা সব সময়ে মনে রাখা দরকার, যখন যন্ত্রচালিত টেকোতে সূতা কাটিয়া গরীবের চরখা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় অথচ কোটি কোটি গ্রামবাসীকে অপর এমন কোন কাজ দেওয়া হয় না যা তারা ঘরে বসিয়া করিতে পারে, তখন বুঝিতে পারি গুরুতর অধর্ম ঘটিতেছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১১-২৫, ৩৭৭]

২৪৪। যখন যন্ত্র সকলের মঙ্গল ঘটায় তখনই যন্ত্রের ব্যবহার সার্থক।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৪-২৬, ১৪২]

২৪৫। যদি যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের দৈন্য ও তার ফলে যে কর্মহীনতা ঘটে তাহা দূর করা যায় তাহা হইলে আমি অতি জটিল বিরাট্ যন্ত্রকেও সাদরে গ্রহণ করিব। ভারতের দারিদ্র্য দূর করার জন্য এবং কাজ ও আয়ের একান্ত অভাব ঘুচাইবার জন্য আমি সূতাকাটার প্রস্তাব করিয়াছি। চরখাও ক্ষুদ্র একটি যন্ত্র কিন্তু মূল্যবান যন্ত্র। আমার ক্ষুদ্র সাধ্যে যেটুকু পারি, ভারতের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চরখার উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করিয়াছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১১-২১, ৩৫০]

২৪৬। অনেকে প্রশ্ন করে "আমি কি সকল যন্ত্রেরই বিরোধী ?" উত্তরে বলিতে হয়—না, তা নয়। নির্বিচারে যন্ত্র বাড়াইয়া যাওয়া আমি ভালো মনে করি না। আপাতদৃষ্টিতে যন্ত্রের গৌরব বাড়িয়া চলিলেও আমি তাহাতে মুগ্ধ হইতে পারি না। যে যন্ত্র মানুষকে

নষ্ট করে তাহার বিরুদ্ধতা করাই উচিত মনে করি। ছোটখাটো হাতিয়ার এবং সহজে চালানো যায় এমন যন্ত্র, যার সাহায্যে মানুষের মেহনত কমে এবং গ্রামীণ দরিদ্র ব্যক্তি উপকৃত হয়, এমন যন্ত্র গ্রহণ করিতে আমি আগ্রহী।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৬-২৬, ২১৮]

২৪৭। যন্ত্রের প্রতি মানুষের যে অন্ধ আকর্ষণ সেটাই দূষণীয়; যন্ত্রের প্রতি আমার কোন বিরাগ নাই। সকলে ব্যস্ত হইয়া খুঁজিতেছে বিনা মজুরে বা কম মজুরে যন্ত্রের সাহায্যে কেমন করিয়া উৎপাদন বেশী করা যায়। এইভাবে মানুষের শ্রমের পরিবর্তে কলের সাহায্যে কাজ করিতে গিয়া হাজার হাজার লোক বেকার হইয়া না খাইয়া মরিতেছে। হয়তো বিশেষ কয়েক জন এই উপায়ে মানুষের শ্রম কমাইয়া লাভবান হয় কিন্তু আমার চেষ্টা সকল লোকের সুবিধা হউক। সকল সম্পদ্ মাত্র কয়েক জনের হাতে চলিয়া যাউক এমন আমি কামনা করিতে পারি না। যাহাতে সকলে ধনী হয় এমন ব্যবস্থাই হওয়া উচিত। আজ যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকজন লোক বহুজনকে খাটাইয়া লাভবান হইতেছে। তার কারণ সমগ্র গতিটাই লোভ হইতে জন্মিয়াছে, মানুষের উপকারের উদ্দেশ্যে নয়। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমি সর্ব শক্তি পণ করিয়াছি।

"তাহা হইলে আপনার বিরোধ যন্ত্রের সঙ্গে নয়? আজ যন্ত্রের যে অপব্যবহার হইতেছে তার বিরুদ্ধেই আপনার সংগ্রাম?"

—এ প্রশ্নের উত্তরে সম্মতি জানানো হয়তো সম্ভব কিন্তু তার সঙ্গে এও বলিতে হয় যে, সর্বাগ্রে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের সত্যকে মানুষের লোভ চরিতার্থ করার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তাহা হইলেই মজুরের খাটুনি কমিবে এবং যন্ত্র মানুষের অকল্যাণ না করিয়া তাহার মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হইবে। আমার লক্ষ্য যন্ত্রের বিলোপ নয়, যন্ত্রের প্রয়োগ সীমিত করা।

"আপনার যুক্তি অনুসরণ করিয়া বিচার করিলে শক্তিচালিত জটিল যন্ত্রগুলিকে বাদ দিতে হয়।"

—হয়তো তাহার প্রয়োজন হইবে। এর মূল লক্ষ্য হইতেছে মানুষ ও তাহার কল্যাণ। যন্ত্র বজায় রাখিয়া মানুষকে অক্ষম করা কখনই উচিত নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি দু-একটি সার্থক যন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি। যেমন সিঙ্গারের সেলাই কল। জনহিতকর যন্ত্রের মধ্যে এটি অন্যতম। এই কলের জন্মের ইতিহাস একটি স্মরণীয় প্রেমের কাহিনী। সিঙ্গার যখন দেখিলেন তাঁর স্ত্রী বহু কষ্ট করিয়া ও বহু সময় ব্যয় করিয়া সেলাই করিতেছেন, মনে ব্যথা পাইলেন। এর মূলে ছিল স্ত্রীর প্রতি তাঁর অকৃপণ প্রেম। তাঁরই শ্রম কমানোর জন্য এই যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছিল। ভালোবাসায় যার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই কল আজ ঘরে ঘরে মেয়েদের কাজ হালকা করিয়া দিতেছে।

"তাই যদি আপনি স্বীকার করেন তাহা হইলে সেই সেলাই কল গড়িবার জন্য কারখানা গড়িয়া তুলিতে হয় এবং সেই কারখানা শক্তিচালিত না হইয়া উপায় নাই—যেমন অন্যত্র হইতেছে।"

—এ প্রয়োজন আমি স্বীকার করি। সমাজবাদ (Socialism) অনুসারে অন্ততঃ এইটুকু আমি মানি যে, আমার মতে ঐ কারখানাগুলি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। ঐ কারখানার সকল অঙ্গ অতি সুব্যবস্থিত ও সুন্দর করিতে হইবে, যাহাতে শ্রমিকরা মনোরম পরিবেশে শান্তিতে কাজ করিতে পারে। সেগুলি পরিচালিত হইবে মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য, লাভের জন্য নয়। কাজের মূলমন্ত্র হইবে প্রেম—লোভ নয়। শ্রমিকদের অবস্থা পরিবর্তনের এই নীতি প্রচলিত করিতে চাই। মানুষ যে অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া সর্বদা ছুটিয়া চলিতেছে তাহার শান্তি করিতে হইবে। প্রতিটি শ্রমিক যেন বুঝিতে পারে তাহার অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের কোন অভাব হইবে না। তার দৈনন্দিন কাজও বিরক্তিকর না হইয়া যাহাতে তাহার সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটায় তাহারও

ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই পরিবেশে যন্ত্র-সাহায্যে যে ব্যক্তি কাজ করিবে শুধু তার পক্ষে নয়, যন্ত্রের মালিক, সে সরকারই হউক বা ব্যক্তিই হউক, সকলের পক্ষে যন্ত্র কল্যাণের সহায়ক হইবে। যন্ত্র ব্যাপারে এইরূপ যন্ত্রের কথাই বিশেষভাবে আমার মনে আসে। এই সেলাই কল, ইহার সৃষ্টির পিছনে ছিল প্রেম। আমাদের সকল ভাবনা হউক মানুষকে ঘেরিয়া। একটি শ্রমিকের শ্রম লাঘব করাই আমাদের আদর্শ হউক। কাজের প্রেরণা হউক লোভ নয়—মানবকল্যাণ। লোভের পরিবর্তে প্রেমকে অবলম্বন করিলে সব কিছুর পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১১-২৪, ৩৭৮]

২৪৮। "আপনি কি ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ করিতে চাহেন না?" —শিল্পসমৃদ্ধ বলিতে আমি যাহা বুঝি তদনুযায়ী হইলে অতি অবশ্যই চাহিব। গ্রামসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। ভারতের গ্রামগুলি ভারতের শহরের সকল প্রয়োজন যোগাইত। যখন আমাদের শহরগুলি বিদেশী মালের বাজারে পরিণত হইল তখন সেগুলি সস্তা মনোহারী বিদেশী মাল বিক্রয় করিয়া গ্রামগুলিকে শোষণ করিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিবে।

[হরিজন, ২৭-২-৩৭, ১৮]

কেন্দ্রীভূত বহুল উৎপাদন এবং আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা

২৪৯। আজ আমাদের কাপড়ের কলগুলি আমাদের কাপড়ের চাহিদা যোগাইতে পারে না। যদি তারা চাহিদা মিটাতেও পারিত তাহা হইলেও তাহারা বাধ্য না হইলে কাপড়ের দাম কমাইবে না। এ কথা কাহারও অজানা নাই যে, তাহারা লাভের জন্য কাপড় তৈয়ারী করে। তাই জাতির প্রয়োজনমত মূল্য ধার্য করিবার দায়িত্ব তাহারা লইতে পারে না। হাতে সূতা কাটিয়া কাপড় তৈয়ারী করিলে

দেশের কোটি কোটি টাকা দরিদ্র গ্রামবাসীর হাতে যাইবে। প্রত্যেক কৃষিপ্রধান দেশে চাষীরা ঘরে বসিয়া করিতে পারে এমন কোন শিল্পকাজ প্রচলিত থাকা প্রয়োজন। ভারতে বস্ত্রশিল্প এই কাজই যোগাইয়া আসিয়াছে। এক কালে ভারতের অপূর্ব বস্ত্রশিল্প পৃথিবীর সকল দেশের ঈর্ষার কারণ ছিল। আমাদের দেশের শিল্পবোধ এই শিল্পে নানা কারুকার্যে প্রকাশিত হইত। আজ সেই শিল্প চলিয়া গিয়া ভারতবাসী মূঢ় দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। সেই প্রাচীন বহু-অভ্যস্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাওয়া কি দোষণীয় কিংবা নিছক কল্পনাবিলাস মাত্র?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-২-২১, ৫০]

২৫০। শুধু উৎপাদনের সুষ্ঠু উপায় অবলম্বন করিলেই জাতীয় শক্তি সুসংহত হয় না—উৎপাদনের সঙ্গে উৎপন্ন বস্তুর যথোপযোগী বণ্টনব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৭-২০, ৫৪৪]

২৫১। বিশেষ কয়েক জনের হাতে ধন জমিয়া গেলে ভারতের মঙ্গল হইবে না। উনিশ শত মাইল দীর্ঘ ও প্রস্থে পনের শত মাইল, এই দেশের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামে সকল সম্পদ্ বন্টিত হইলে তবে ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৩-২১, ৯৩]

খাদি অর্থনীতি

২৫৬। খাদির ব্যবসা-বিজ্ঞান বলে—উৎপাদন ও বণ্টন উভয়কে বিকেন্দ্রীকৃত করিতে হইবে। যেখানে খাদি জন্মাইবে তাহার অতি নিকটে খাদির চাহিদাও থাকিবে।

[হরিজন, ২-১১-৩৫, ৩০০]

২৫৭। খাদির মূলতত্ত্ব হইল—প্রতিটি গ্রাম অন্নে ও বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৭-২৪, ২৩৪]

২৫৮। স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদির সার্থক ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রতি কাটুনীকে নিজের তুলা জন্মাইয়া লইতে হইবে অর্থাৎ প্রতি গ্রামেই তুলা জন্মিবে। এর অর্থ দাঁড়ায়—খাদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইলে তুলার চাষও বিকেন্দ্রীকৃত করিতে হইবে।

[হরিজন, ২৭-৭-৩৫, ১৮৮]

ভারতের গ্রাম পুনর্গঠিত হউক

২৬১। আমার মতে ভারতের গ্রাম যদি ধ্বংস হয় ভারত ধ্বংস হইবে। ভারত আর ভারত থাকিবে না। পৃথিবীকে ভারত যা দিতে পারে তাহাই যদি নষ্ট হইল তাহা হইলে ভারতের ভারতীয়তা থাকিল কোথায়? যখন গ্রামকে শোষণ করা বন্ধ হইবে তখন গ্রামকে বাঁচানোর সম্ভাবনা দেখা দিবে। বিস্তৃত শিল্পায়িতকরণের ফলে দেখা দিবে প্রতিযোগিতা করিয়া বাজার দখল করার সমস্যা; ফলে গ্রামবাসীরা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে শোষিত হইতে থাকিবে। এই জন্যই আমাদের গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি গ্রামই যাহাতে নিজের প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য নিজে গড়িয়া লইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে তাহার উত্তম করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে গ্রামের লোকেরা যদি কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি নিজেরা তৈয়ারী করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে পারে তাহাতে কোন বাধা নাই। কেবল নজর রাখা দরকার সে যন্ত্র যেন অপরকে শোষণ না করে।

[হরিজন, ২৯-৮-৩৬, ২২৬]

বহুল উৎপাদন বনাম বহু লোকের দ্বারা উৎপাদন

২৬২। আমার দৃঢ়-বিশ্বাসমতে আমি দ্ব্যর্থবিহীন স্পষ্ট ভাষায় বলিব, আজ পৃথিবী যে সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে তার জন্য এই বহুল-উৎপাদনের মনোভাবই দায়ী। ধরিয়া লইলাম কলকারখানা মানুষের সকল অভাব মিটাইতে পারে, তাহা হইলেও উৎপাদন বিশেষ বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইতে বাধ্য, যার জন্য উৎপাদিত

বস্তুসম্ভার বণ্টন করিতে হইলে বহু জটিল পথ দিয়া দূর-দূরান্তরের বাজারের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে হইবে। পরন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদিত হইলে বণ্টনব্যবস্থা স্থানীয় ক্ষেত্রের দ্বারাই নিরূপিত হইবে—বঞ্চনা বা ফাটকাবাজীর কোন অবকাশ থাকিবে না। ফলে এক দিকে সামান্য কয়েক জনের হাতে অস্বাভাবিক বেশী পরিমাণ সম্পদ্ জমিয়া থাকা, অপর দিকে প্রভূত বস্তুসম্ভার থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের প্রভূত অভাব থাকার বিপর্যয় ঘটিতে পারিবে না।

"তাহা হইলে বহুল-উৎপাদনকে কি আপনি ভারতের পক্ষে কাম্য বলিয়া মনে করেন না?"

—কাম্য মনে করি তবে তাহা স্বার্থবুদ্ধি-পরিচালিত বলপ্রয়োগের দ্বারা নয়। চরখার লক্ষ্যই তো বহুল-উৎপাদন, তবে সে উৎপাদন হইবে ভারতের গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে। এক জনের উৎপাদনকে লক্ষ লক্ষ গুণ বাড়াইয়া দিলে কি বহুল উৎপাদন হয় না? কত বিরাট্ তার আকার হইতে পারে! কিন্তু আমি বেশ বুঝিয়াছি, আপনারা বহুল-উৎপাদন বলিতে বোঝেন—যত কম শ্রমিক দিয়া সম্ভব, জটিল যন্ত্র সাহায্যে সাধ্যমত বেশী উৎপাদন করা। চিন্তা করিয়া আমি বুঝিয়াছি ইহা ভ্রান্ত ও দুর্নীতিমূলক প্রচেষ্টা। আমি যে যন্ত্রের কথা ভাবি সে যন্ত্র অতি সরল, যাহা ঘরে ঘরে ও দূর দূরান্তরে কাজ করিতে পারে।

"তাহা হইলে বুঝা গেল, যেহেতু যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, সেই কারণে আপনি কলকারখানার বিরোধী।"

—ঠিকই বুঝিয়াছেন। সকল রকম সুবিধা বা আধিপত্যের বিরোধিতা করাই আমার প্রকৃতি। যাহা সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করা যায় না তাহা আমার পক্ষে বর্জনীয়। আশা করি আমার বক্তব্য বুঝাইতে পারিয়াছি।

[হরিজন, ২-১১-৩৪, ৩০১]

ভারতের উন্নতির পরিকল্পনার নীতি

২৬৩। প্রশ্ন—ভারতের কাঁচা মাল সর্বাধিক কাজে লাগানোর জন্য ভারত সরকার নানা পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন কিন্তু ভারতের বিপুল অনিয়োজিত গণশক্তিকে কাজে লাগাইবার কোন পরিকল্পনা নাই (ফলে তাহারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গেল)। এই কার্যপ্রণালীকে কি স্বদেশসেবা বলা যায় ?

উত্তরে গান্ধীজী প্রশ্নটিকে অতি সুসংগত বলিয়া স্বীকার করিলেন। সরকার যে ঠিক কী উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করিতেছেন তাহার সম্বন্ধে তাঁর সঠিক জ্ঞান নাই ইহাও স্বীকার করিলেন। যে পরিকল্পনায় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয় কিন্তু দেশের বিপুল জনশক্তি, যার সম্ভাবনা বহুগুণে প্রবলতর, সেই জনশক্তিকে অবহেলা করা হয়, সে পরিকল্পনাকে অসম্পূর্ণ, অসংগত বলিতে তিনি দ্বিধা করেন না। সে পরিকল্পনার দ্বারা মানুষের মধ্যে সাম্য কখনই স্থাপিত হইতে পারিবে না।

আজিকার পৃথিবীতে আমেরিকা শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য কিন্তু আজও সে দেশে দারিদ্র্য ও বর্বরতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এর কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, সেখানে বিশ্বব্যাপী জনশক্তির সাধনা না করিয়া কয়েকজনের হাতে সমুদয় ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার ফলে তারা বিপুল জনশক্তিকে নিজের স্বার্থসাধনে খাটাইয়া বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিতেছে। সেখানে শিল্পপরায়ণতা সে দেশের দরিদ্র জনগণের তথা সারা পৃথিবীর পক্ষে ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারত যদি এই বিপদ ঘটাইতে না চায় তাহা হইলে আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে যাহা কল্যাণকর সেইটুকুই নিজের দেশে প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনোহারী মনে হইলেও তাহাদের সর্বনাশা অর্থনীতি পরিত্যাগ করিলে মঙ্গল ঘটিবে। সুতরাং ভারতের পরিকল্পনায় দেশের বিপুল জনশক্তিকে কাজে

লাগানোর জন্য তাহার সমুদয় কাঁচামাল বিদেশে পাঠাইয়া পুনরায় শিল্পসম্ভারের আকারে সেইগুলি অত্যধিক মূল্যে খরিদ করিবার ব্যবস্থা না করিয়া ভারতের গ্রামে গ্রামে সেই কাঁচামাল হইতে শিল্পদ্রব্য সৃষ্টি করানোই শ্রেয় ব্যবস্থা হইবে।

[হরিজন, ২৩-৩-৪৭, ৭৯]

বিকেন্দ্রীকরণ ও অহিংসা

২৬৪। আমার মনে হয়, ভারত যদি অহিংসার পথে অগ্রসর হইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে বহু ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ সাধন করিতে হইবে। শক্তি ও সম্পদ্ এক জায়গায় অধিক পরিমাণে সংগৃহীত করিলে উপযুক্ত বলের দ্বারা তাহাকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজন হয়। সাধারণ লোকের বাড়িতে এমন কিছু থাকে না যাহা অন্যে লোভ করে। সেখানে পাহারার প্রয়োজন হয় না। প্রাসাদে, ধনীর অট্টালিকায় চোর ডাকাত ঠেকাইবার জন্য উপযুক্ত পাহারা ও বাধা দিবার শক্তিও সঞ্চয় করিতে হয়। বিরাট্ কারখানা গড়িলেও সেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। ভারত যদি গ্রামকে প্রাধান্য দিয়া সমাজ রচনা করে তাহা হইলে বিদেশী আক্রমণের যে সম্ভাবনা থাকিবে সেই তুলনায় শহরকেন্দ্রিক ভারত যতই সৈন্য, নৌবহর ও আকাশসেনা নিযুক্ত করুক না কেন, বিদেশী আক্রমণের ভয় তদপেক্ষা অনেক বেশী থাকিবে।

[হরিজন, ৩০-১২-৩৯, ৩৯১]

২৬৬। সমাজের উদ্দেশ্য—মানুষের সুখ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন। এখানে আমি 'নৈতিক' শব্দ আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। এই লক্ষ্য সাধন করিতে বিকেন্দ্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। সমাজে অহিংসার প্রতিষ্ঠা করিবার পথে কেন্দ্রীভূত শক্তি সর্বদাই অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

[হরিজন, ১৮-১-৪২, ৫]

২৬৭। প্রশ্ন—কয়েকজন স্ত্রীলোক, যারা মাতুর বুনিয়া জীবিকার কিছু অংশ রোজগার করে, তাদের আপনি বলিয়াছিলেন সমবায় পন্থায় কাজ করিতে। বাংলার কৃষিভূমি উত্তরাধিকারের ক্রমবিচ্ছিন্নতায় টুকরা টুকরা হইতে হইতে এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে চাষ আর লাভজনক নহে। আপনি কি কৃষকদেরও সমবায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন? যদি ইহাই আপনার মত হয়, বর্তমান ভূমির মালিকানার আইন বলবৎ থাকিতে কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইবে? সরকারের উচিত নয় কি আইন প্রণয়ন করিয়া এ অবস্থার প্রতিকার করা? যদি সরকার মনোযোগী না হন অথচ জনসাধারণ সুব্যবস্থা চায়, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের সংগঠিত করিয়া কোন্ পথে অগ্রসর হইলে পরিবর্তন সম্ভব হইবে?

উত্তর—প্রথম প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, মাতুর-শিল্পীদের অপেক্ষা চাষের ক্ষেত্রে সমবায় পন্থা অধিক ফলপ্রসূ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভূমি সকলের বা সরকারের সেই অর্থে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সকলে মিলিয়া সমবায় প্রথায় চাষ করিলে সর্বাধিক ফলন পাওয়া সম্ভব।

মনে রাখা দরকার, একমাত্র অহিংসার ভিত্তিতেই সমবায় সম্ভব। হিংসার বা বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে কোন সার্থক সমবায় ঘটানো সম্ভব নয়। হিটলার হিংসামূলক সমবায়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি বৃথাই সমবায়ের বিষয়ে বহু কথা বলিয়াছেন, বলপূর্বক জনসাধারণের উপর সমবায় চাপাইয়া দিয়াছেন। তার ফলে যে অঘটন ঘটিয়াছে তাহা সকলেই দেখিয়াছে।

পরিশেষে গান্ধীজী বলেন যে, ভারতে যদি আইনের জোরে সমবায় লোকের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বড়ই দুঃখের ব্যাপার ঘটিবে। বলপ্রয়োগে যে মঙ্গল ঘটানো হয় তাতে মানুষের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে। যখন অহিংস অসহযোগের সাহায্যে সকলকে একমত করিয়া পরিবর্তন ঘটানো হয়—তা সম্ভব হয় প্রেমের শক্তিতে,

যার ফলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় এবং মানুষের প্রকৃত স্থায়ী অগ্রগতি ঘটে।

প্রশ্ন—নোয়াখালির পূর্ব-কেরোয়াতে আপনি চাষীদের সমবায় প্রথায় চাষ করিতে বলিয়াছেন। তারা কি সকলের জমি একত্র করিয়া একযোগে চাষ করিয়া, যার যত জমি সেই অনুপাতে ফসল ভাগ করিয়া লইবে? সমবায় প্রথায় চাষ করিলে তাহাদের কি প্রণালীতে কাজ করা উচিত তার পরিকল্পনা আমাদের বলুন।

উত্তরে গান্ধীজী স্বীকার করিলেন যে, প্রশ্নটি সমুচিত হইয়াছে এবং ইহার উত্তরও বেশ সরল। সমবায় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এই যে, সমুদয় জমি সমবায় মতে একত্রিত করিয়া সকলের মালিকানাও একত্রিত করিতে হইবে। জমিগুলি চাষ হইবে সকলের সহযোগে। জমির মালিকরা একযোগে কাজ করিবেন—মূলধন, চাষের যন্ত্র ও গবাদি পশু, বীজ ইত্যাদিতে সকলের মালিকানা থাকিবে। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সমবায় কৃষি প্রচলিত হইলে গ্রামের চেহারা বদলাইয়া যাইবে, দারিদ্র্য থাকিবে না, আলস্য দূর হইবে। এ অবস্থা ঘটাইতে হইলে পরস্পরের বন্ধু হইয়া সকলকে এক পরিবারের লোক মনে করিতে হইবে। যখন এ অবস্থা আসিবে তখন এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ রূপ দুষ্টক্ষত অদৃশ্য হইবে।

[হরিজন, ৯-৩-৪৭, ৫৮ ও ৫৯]

গ্রাম স্বরাজের চিত্র

২৬৮। গ্রাম স্বরাজ বলিতে আমি বুঝি, পূর্ণ কর্তৃত্ব বিশিষ্ট গ্রাম, যে গ্রাম তার একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য পাশের গ্রামের উপরও নির্ভর করে না, আবার যে সব বিষয়ে পরস্পরের সহযোগ প্রয়োজন সে বিষয়ে সকল গ্রামের সঙ্গে একাত্ম। এই অবস্থায় আসিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামকে তার খাদ্য ও প্রয়োজনমত তুলা নিজেদের জন্মাইয়া লইতে হইবে। গবাদি পশুচারণক্ষেত্র, বয়স্ক ও

ছোটদের জন্য খেলার মাঠ চাষের জমি হইতে আলাদা থাকিবে। এর পরও যদি জমি পড়িয়া থাকে সেখানে অর্থকরী চাষের প্রয়াস করিতে হইবে। গাঁজা আফিম বা তামাক—এই প্রকার চাষ সর্বপ্রযত্নে বর্জন করিতে হইবে। গ্রামে অভিনয়-মঞ্চ, স্কুল ও সভাগৃহ থাকিবে। বুনিয়াদী প্রথায় পূর্ণ শিক্ষা হইবে বাধ্যতামূলক। যতদূর সম্ভব সমাজের সকল কাজই সমবায় প্রথায় সম্পন্ন করিতে হইবে। আজকাল জাতিভেদের যে সব পর্যায় ধাপে ধাপে বর্তমান রহিয়াছে তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। গ্রামের শক্তি হইবে অহিংসা—সত্যাগ্রহের প্রয়োগকৌশলই হইবে তাহার অস্ত্র। গ্রামের রেজেস্ট্রী বহি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সকল লোকই গ্রামরক্ষী দলে বিনা বেতনে কাজ করিবেন।

ন্যূনতম যোগ্যতা বিশিষ্ট সকল প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া প্রতি বৎসর গ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচন করিবেন। পঞ্চায়েত গ্রামের শাসনকার্য চালাইবে। গ্রামের শাসনকার্য চালাইতে যে ক্ষমতা ও আইনের প্রয়োজন, পঞ্চায়েতের হাতে সেইরূপ সকল ক্ষমতাই অর্পিত হইবে। গ্রামের শাসনবিধিতে প্রচলিত মতে শাস্তি দেওয়ার কোন বিধানই থাকিবে না—পঞ্চায়েত আইন প্রণয়ন করিবে, বিচার করিবে এবং শাসনকার্যও চালাইতে পারিবে। আজই যে-কোন গ্রাম ইচ্ছা করিলে এই স্বরাজ গড়িয়া তুলিতে পারে—ইহাতে বর্তমান গবর্নমেণ্টের সঙ্গে কোন বিরোধ ঘটিতে পারে না কারণ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে গ্রামের খাজনা নেওয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। আপাততঃ আমি পাশাপাশি অন্য সকল গ্রামের বা শহরের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্কের বিষয় কিছু বিচার করিতেছি না। যাহা বলিয়াছি তাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভিত্তি করিয়া যে আত্মনিয়ন্ত্রিত গ্রাম রচনা করা যায় তারই কাঠামো বর্ণনা করিয়াছি। ব্যক্তিই তার গবর্নমেণ্ট সৃষ্টি করিবে। তাহাকে ও তাহার গবর্নমেণ্টকে অহিংসার শাসন মানিতে হইবে। তাহা হইলে

প্রতিটি গ্রামবাসী ও প্রতিটি গ্রাম—সমগ্র পৃথিবী তাহাদের বিরুদ্ধতা করিলেও ভয় পাইবে না। কারণ যে নীতি গ্রামবাসীকে ও সমগ্র গ্রামকে প্রেরণা দিবে তদনুযায়ী নিজের বা গ্রামের সম্মান রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রত্যেকে প্রস্তুত থাকিবে।

[হরিজন, ২৬-৭-৪২, ২৩৮]

ষষ্ঠ পর্ব

সমাজে সম্পদের বিভাজন

প্রকৃতির নিয়ম

২৬৯। আমাদের যাহা বর্তমানে প্রয়োজনে লাগে না এমন কিছু যদি আমরা দখল করি আমার মনে হয় সেও যেন কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া চুরি করা হয়। আমি মনে করি প্রকৃতি জননী আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট দেন ; এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারও অভাব হইত না, কেহই খাদ্যাভাবে মরিত না। যতদিন মানুষের মধ্যে সম্পদের তারতম্য থাকিবে ততদিন বুঝিতে হইবে চৌর্যবৃত্তি চলিতেছে। আমি সমাজবাদের ভক্ত নই, যাহাদের বেশী আছে তাহাদের সম্পদ্ কাড়িয়া লওয়ার সমর্থন করি না। কিন্তু আমি এই কথাই বলি যে, যাঁহারা মানুষের এই দুঃখের অবসান ঘটাইতে চান তাঁহাদের এই চৌর্য ত্যাগের নীতি না মানিয়া উপায় নাই। কাহাকেও সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত করিতে আমি চাহি না, কারণ সেরূপ করিলে অহিংসা হইতে ভ্রষ্ট হইব। যদি আমার চেয়ে কারো বেশী থাকে তাহা থাকুক। কিন্তু যে নীতি আমার নিজ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তদনুযায়ী যাহাতে আমার প্রয়োজন নাই এমন সম্পদ্ সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত মনে করিতে পারি না। আমাদের দেশে, এই ভারতে, ত্রিশ লক্ষ নরনারী দিনান্তে একবার খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়—সে খাদ্যও মাত্র ভাত বা রুটি আর একটু লবণ। যতদিন পর্যন্ত এই ত্রিশ লক্ষ লোকের অন্ন বস্ত্রের সুব্যবস্থা না হয় ততদিন আমাদের যাহাও বা আছে তাহা ভোগ করার অধিকার কোথায় ? আমাদের এই দুঃখ পুরাপুরি বুঝা উচিত— তদনুযায়ী নিজের অভাব সংকুচিত করা উচিত। এই দুঃস্থ জনতাকে

খাওয়াইয়া পরাইয়া সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে উপবাস করাও সংগত হইবে।

[স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অব মহাত্মা গান্ধী, নটেশন, ৩৮৪]

২৭১। অচৌর্য-বৃত্তির সঙ্গে অসংগ্রহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সৎপথে অর্জিত সম্পদ্ যদি ব্যবহার না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখি যাহাতে অন্যে তাহা না পায়, বিনা প্রয়োজনে সম্পদ্ দখল করার ফলে তাহা চুরি করা ধনের তুল্য হইবে। সাধারণতঃ এইরূপ সঞ্চয়কে ভবিষ্যতের সংস্থান বলিয়া গণ্য করা হয়। যিনি সত্যকে জানিতে চান, তিনি আগামী কালের জন্য সঞ্চয় করিতে পারেন না। ভগবান আগামী কালের জন্য সঞ্চয় করেন না। তাঁর যখন যেটুকু দরকার তার বেশী সৃষ্টিও তিনি করেন না। ভগবানের দয়ায় যদি আস্থা থাকে তবে আমাদের ভরসা থাকা উচিত যে, যখন যেটুকুতে আমাদের প্রয়োজন তিনিই তাহা আমাদের দিবেন। সুতরাং যদি ঈশ্বরের দয়ায় ভরসা রাখি তাহা হইলে তাঁর বিচারে বিশ্বাস রাখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহা দিয়া ভগবান প্রত্যহই আমাদের অভাব পূরণ করিবেন। ঈশ্বরজ্ঞানী মহাপুরুষ ও ভক্তগণ, যাঁরা এই বিশ্বাসে চলিয়াছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এই পন্থারই নির্দেশ দেয়। এই নীতি না জানার বা জানা সত্ত্বেও অবহেলা করার ফলেই মানুষে মানুষে এই ভেদ সৃষ্টি হইয়াছে, যার ফলে আজ সংসারে দুঃখ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। যারা ধনী তাদের ভাণ্ডারে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুসম্ভার জমিয়া উঠিতেছে, অবহেলায় নষ্টও হইতেছে অনেক। অপর দিকে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে উপবাস করিয়া মরিতেছে। যাহার যাহা প্রয়োজন সেইটুকু মাত্র লইয়া যদি প্রত্যেকেই তৃপ্ত হয় তাহা হইলে কাহারও অভাব হইবে না—সকলেই তৃপ্ত শান্ত জীবন যাপন করিবে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ধনীও দরিদ্রের চেয়ে কম অতৃপ্ত নয়।

দরিদ্র লোক স্বভাবতঃই লক্ষপতি হইতে চায় আবার লক্ষপতিরাও ক্রোড়পতি হইবার জন্য ব্যস্ত। এ বিষয়ে সারা পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষা-শান্তি বা তৃপ্তির প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে ধনীকেই প্রথম আগাইয়া আসিতে হইবে। আরও অধিক পাওয়ার বাসনা ত্যাগ করিয়া যদি তাঁরা পরিমাণমত ধন সংগ্রহ করিয়া আরও সংগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হন তাহা হইলে ক্ষুধিতের খাদ্যের অভাব ঘুচিবে। ফলে তাহারাও ধনীদের সঙ্গে যোগ দিয়া চাওয়ার সংযম অভ্যাস করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ৩৪]

লক্ষ্য—আর্থিক সাম্য

২৭৪। সম্পদের সমান বণ্টনই আমার কাম্য। কিন্তু আমি যতদূর বুঝিয়াছি, সমান বণ্টন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমি চেষ্টা করি যাহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৩-২৭, ৮৬]

২৭৬। সমবণ্টনের তাৎপর্য হইল—প্রত্যেকটি লোক তার সমুদয় স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাইবার উপকরণ সহজেই পাইবে কিন্তু তার বেশী পাইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তির হজমশক্তি দুর্বল হয়, সে খাইবে আধ পোয়া আটার রুটি। আবার অন্য একজনের প্রয়োজন হয়তো আধ সের। এদের দুজনেরই প্রয়োজনমত খাইতে পাওয়া উচিত। এই আদর্শ রূপায়িত করিতে হইলে সমগ্র সমাজব্যবস্থা ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। অহিংস সমাজ অন্য কোন আদর্শ মানিতে পারে না। হয়তো আমরা ঠিক এই আদর্শে নাও পৌঁছাইতে পারি, তবুও যত বেশী অগ্রসর হইতে পারি ততই মঙ্গল। তাই এই আদর্শ লক্ষ্য করিয়া অবিরাম প্রয়াস করিতে হইবে। যতদূর অগ্রসর হইতে পারিব আমাদের সুখ ও শান্তি সেই পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। সেই পরিমাণে অহিংস সমাজ গঠনে আমাদের প্রয়াস

সার্থক হইবে। যিনি এই আদর্শকে নিজের ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁর পক্ষে এই আদর্শ সাধনে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে উপযুক্ত পরিবর্তন সাধন করাই প্রথম কাজ। আমাদের দেশের লোক কত গরীব তাহা স্মরণ করিয়া নিজের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিতে হইবে অর্থ উপার্জনে কোন অসদাচরণ করা তার ধর্মের বিরুদ্ধ জ্ঞান করিতে হইবে। সহজে অধিক লাভের দুরাশা নিবৃত্ত করিতে হইবে। তাহার বাসগৃহ হইবে তাহার সংযত জীবনের পরিমাপে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর আত্মসংযম পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। নিজের জীবনে যতখানি সাম্য সাধন করা সম্ভব ততখানি যখন করিয়া ফেলিতে পারিব তখন পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে এই ধর্ম প্রচার করিলে সফল হইতে পারিব।

সমবণ্টন-নীতির মূলে আছে—ধনীদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনের অভিভাবক বা অছি বনিয়া যাওয়া। কারণ মূলনীতি অনুযায়ী অন্য সকলের অপেক্ষা তাঁদের একটি টাকাও বেশী থাকার কথা নয়। কেমন করিয়া এই পরিবর্তন সাধন করা যায়? অহিংস উপায়ে? অথবা ধনীদের বাড়তি ধন কাড়িয়া লইয়া? ধন কাড়িয়া লইতে গেলে হিংসার প্রয়োগ অনিবার্য। এই বলপ্রয়োগ সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করিতে জানে সে একটি বিশেষ গুণপনা অর্জন করিয়াছে, তাহার ধন বলপূর্বক কাড়িয়া লইলে এই বিদ্যার প্রয়োগ অন্তর্হিত হইবে। যার ফলে সমাজের বিশেষ লোকসান হইবে। সুতরাং বিচারে প্রমাণ হয় যে, অহিংস পন্থাই শ্রেষ্ঠ। ধনীর ধন তাঁহারই আধিকারে থাকুক, তাঁর যতটা প্রয়োজন (প্রয়োজনটা যুক্তিযুক্ত হওয়া উচিত) তিনি স্বাধীনভাবে ব্যয় করুন, বাকী ধন সমাজের সেবায় নিয়োজিত হউক। এই যুক্তিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ধনীরা সদ্‌ভাবে এ কাজ করিবেন।

এর পরেও বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ধনীরা দরিদ্রদের যথার্থ অভিভাবক-স্বরূপ হইয়া কাজ করিতে অস্বীকার করেন। দরিদ্ররা অধিকতর

নিষ্পেষণে পীড়িত হইয়া অনাহারে মরিতে থাকে। তখন কি করা কর্তব্য? এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়া আমি পাইয়াছি তুইটি ধর্মানুমোদিত অব্যর্থ অস্ত্র—অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন। সমাজের দরিদ্রদের সহায়তা ছাড়া ধনীরা ধন সংগ্রহ করিতে পারে না। এই সত্য যদি দরিদ্ররা সকলে উপলব্ধি করে, তাহারা অসীম শক্তি লাভ করিবে। যে মারাত্মক অসাম্য তাহাদের অনাহারে পিষিয়া মারিতেছে এই সত্যের বলে তাহারা শক্তি সংগ্রহ করিয়া কেমন করিয়া অহিংস উপায়ে তাহার অবসান ঘটাইবে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে।

[হরিজন, ২৫-৮-৪০, ২৬০]

২৮০। প্রশ্ন—যাঁহাদের সকল ব্যবসা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের আপনি স্বেচ্ছায় মজুরের কাজ করিতে পরামর্শ দেন। তাহা হইলে কে শিক্ষা, ব্যবসায় বা এইরূপ কাজ করিবে? কর্মবিভাগ যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে মনুষ্যসভ্যতার অগ্রগতি নষ্ট হইবে না কি?

উত্তর—এই প্রশ্ন হইতে বুঝা যায় যে, প্রশ্নকর্তা গান্ধীজীর যুক্তির মর্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। যদি কোন লোক বিশেষ কারণে তাহার অভ্যস্ত ব্যবসায় চালাইতে অক্ষম হয় তাহা হইলে সে যে-কোন কাজ জুটাইতে পারে। ঝাঁট দেওয়াই হোক বা পাথর ভাঙ্গাই হোক, তাহাই তাহার করা উচিত—করিতে বাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গুণ অনুসারে কর্মবিভাগকে তিনি মানেন কিন্তু সেই সঙ্গে এও মানেন যে, সকলের মজুরী সমান হওয়া উচিত। উকিল বা শিক্ষক একজন ঝাড়ুদারের চেয়ে বেশী বেতন আশা করিতে পারেন না। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে তবে কর্মবিভাগ মানুষের মঙ্গল করিবে। প্রকৃত সভ্যতা বা সুখের এর চেয়ে সোজা রাস্তা আর কিছু দেখা যায় না।

[হরিজন, ২৩-৩-৪৭, ৭৮]

প্রয়াস। মনুষ্যসমাজে চিরকালই মানুষে মানুষে শক্তি ও সুযোগের তারতম্য ঘটিয়া আসিতেছে, ঘটিতেই থাকিবে। নদীর ধারে যার চাষ, মরুভূমির চাষী তার মত সুযোগ সুবিধা পাইতেই পারে না। আপাতদৃষ্টিতে এই ধরনের পার্থক্য সর্বদাই বর্তমান থাকিলেও মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যও আমরা সকল সময়ে অনুভব করি। পশুপক্ষীর যেমন প্রতিদিনের আহার ও আশ্রয় প্রয়োজন ও তাহা সংগ্রহ করিবার সুযোগও তারা পায়, তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচিয়া থাকার উপকরণ প্রয়োজন ও তাহা পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু এই যে পাওয়ার অধিকার তার সঙ্গে জড়ানো আছে করণীয় কর্তব্য। প্রত্যেকটি অধিকার ও তদনুযায়ী কর্তব্যের সঙ্গে এ ধর্মও মানুষ গ্রহণ করিয়াছে যে, এই অধিকার ভোগে বাধা সৃষ্টি করিলে সে বাধার প্রতিবিধান করাও কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। মানুষে মানুষে যে এক, সেই মূলনীতিতে আস্থা থাকিলে প্রতিটি অধিকারের কর্তব্য ও অধিকার-সংগত বাধা দূর করার স্বাধীনতা বুঝিতে না পারার কোন কারণ নাই। শ্রমের দ্বারা মানুষের জীবনোপায় সংগ্রহ করিয়া কর্তব্য পালন করিতে হয়।

নিজ শ্রমে যাহা আমার পাওয়া উচিত তাহা হইতে যে আমাকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করে তাহার সহিত অসহযোগ করাই এই অন্যায়ের যথার্থ প্রতিকার। পুঁজিপতি বা শ্রমিক উভয়েরই বাঁচিয়া থাকার অধিকার সমান। কাহারও পক্ষে অপরের ধ্বংস কামনা করা উচিত নয়। সকলের সুমতি যাহাতে হয় তারই চেষ্টা করিতে হইবে। আজ ধনী সম্প্রদায় শ্রমজীবীদের উপর যে অত্যাচার করিতেছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ ঘোষণা করিতে হইবে। ধনীদের সহিত অসহযোগ করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন কী অন্যায় ঘটিতেছে। আমি অসহযোগ করিলে অপর একজন সেই কাজে লাগিয়া যাইবে এমন মনে করাও উচিত নয়। আমার অসহযোগের প্রকৃতিই এরূপ হওয়া উচিত যে, আমার সহকর্মীরা সকলেই যেন

বুঝিতে পারে যে আমার স্থানে অপর কেহ কাজ করিতে গেলে মালিকের অন্যায়ে সহায়তা করা হইবে। সাধারণ শ্রমিকদের এই আচরণের মূল্য শিখাইতে সময় লাগিবে। কিন্তু যখন এই পথই শ্রেষ্ঠ ও সুনিশ্চিত পথ তখন এই সময়ব্যয়কে বিলম্ব বলা যায় না। বরঞ্চ এই পথই সর্বাপেক্ষা দ্রুত পথ মনে করা উচিত। পুঁজিপতিকে নষ্ট করিলে শ্রমিকও নষ্ট হইবে এ সত্য বুঝা কঠিন নয়। মানুষের এমন দোষ থাকা সম্ভব নয় যে দোষ চেষ্টা করিলে সংশোধন করা না যায়। কাহারও নিজেকে এমন গুণসম্পন্ন মনে করা উচিত নয় যে সেই গৌরবে অপরকে সর্বদোষদুষ্ট মনে করিয়া তাহাকে বিনষ্ট করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৩-৩১, ৪৯]

সপ্তম পর্ব

শ্রেণী-সংগ্রাম বিষয়ে

অহিংসা ও পুঁজি

৩০০। প্রশ্ন—যে সম্পদ্ হিংসা দ্বারা অর্জিত হয় তাহা কি অহিংসা দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব ?

উত্তর—হিংসার দ্বারা অর্জিত সম্পদ্ অহিংসা দ্বারা রক্ষা করা তো সম্ভব নয়ই, পরন্তু অহিংসার পথে চলিতে হইলে সে সম্পদ্ ত্যাগ করাই উচিত।

প্রশ্ন—প্রকাশ্য বা গোপন হিংসা প্রয়োগ না করিয়া কি পুঁজি গড়িয়া তোলা সম্ভব ?

উত্তর—ব্যক্তির পক্ষে হিংসা ছাড়া অন্য উপায়ে পুঁজি গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজ যদি অহিংসার পথ অবলম্বন করে তাহা হইলে সরকারের পক্ষে অহিংসার পথে পুঁজি সংগ্রহ করা শুধু সম্ভব নয়, করাই সরকারের ধর্ম।

প্রশ্ন—মানুষ নৈতিক বা ভৌতিক যে সম্পদই গ্রহণ করুক, তাহা কেবল সমাজের সকলের সহযোগে ও সাহায্যেই করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে সেই সম্পদ্ কেহ কি ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিতে পারে ?

উত্তর—এ প্রশ্নের একটিই উত্তর সম্ভব : "না, পারে না"।

[হরিজন, ১৬-২-৪৭, ২৫]

জমিদারদের প্রতি

৩০১। প্রশ্ন—করাচী কংগ্রেসে ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের সূত্র রচনা করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে স্বদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত জমিদারেরা কংগ্রেসকে সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু নবগঠিত সোস্যালিস্ট দল কংগ্রেসের মধ্যে

থাকিয়াও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করিতে চাহিতেছেন। কংগ্রেসের নীতিকে ইহাতে আঘাত করা হয় না কি? ইহার ফলে কি শ্রেণী-সংগ্রাম বাধিয়া যাইবে না? আপনি কি ইহা নিবারণ করিতে পারিবেন?

উত্তর—করাচী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব আগামী কংগ্রেস বসিবার আগে রদবদল হইতে পারে না। যদিও বা তাহা সম্ভব হয় বিশেষ ন্যায্য কারণ ব্যতীত সম্পত্তিবান সম্প্রদায়ের সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার প্রস্তাবে আমি সায় দিতে পারিব না। আমার একমাত্র ধ্যান, কেমন করিয়া আমি সকলের হৃদয়ে প্রেমভাবনা জাগাইয়া সকলের হৃদয়ের এমন পরিবর্তন ঘটাইতে পারিব যাহাতে প্রতিটি ভূস্বামী নিজেকে সম্পত্তির রক্ষক মাত্র জ্ঞান করিয়া প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তাঁহার সকল আয় নিয়োগ করিতে পারিবেন। কংগ্রেস দলের মধ্যে 'সোস্যালিস্ট পার্টি' নামে এক নূতন দল গড়িয়া উঠিতেছে। এই নূতন মতবাদ যদি সমগ্র কংগ্রেস দলকে নিজ মতাবলম্বী করিতে পারে তাহা হইলে কি অবস্থা হইবে তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি স্থির বুঝি যে, যদি একান্ত সরলভাবে খাঁটি জনমত সংগ্রহ করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে দেশের কোটি কোটি লোক সম্পত্তিশালী লোকেদের সম্পত্তিচ্যুত করিতে চাহিবে না। আমার সকল প্রয়াসের লক্ষ্য ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে, জমিদার ও প্রজার মধ্যে, সহযোগের ও প্রেমের সম্পর্ক গড়িয়া তোলা। ইচ্ছা করিলে দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিও চারি আনা পয়সা চাঁদা দিয়া ও কংগ্রেসের নীতি স্বীকার করিয়া কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারে। এ বিষয়ে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া বোধ হয় উচিত। আমি সকল সময়েই বলিয়া আসিতেছি যে, কেবল ধনিক সম্প্রদায়ই কলকারখানার মালিক নয়, শ্রমিকদেরও সমানভাবে কলকারখানার মালিক বলিয়া স্বীকার করা উচিত। সেই যুক্তি অনুসারে ভূমির মালিকানাতেও জমিদার ও কৃষক উভয়েরই সমান অধিকার স্বীকৃত হওয়া দরকার। সেই কারণে

জমিদারীর আয় ভোগবিলাসে ব্যয় না করিয়া প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় করা উচিত। জমিদারের আচরণের ফলে রায়তরা যদি বুঝিতে পারে যে জমিদার তাহাদের আপনজন, এক পরিবারভুক্ত লোকেরা যেমন প্রত্যেকের কল্যাণে সকলের কল্যাণ মনে করে জমিদারও সর্বদা সেইরূপ প্রজাদের কল্যাণের জন্যই চিন্তা করেন, তাহা হইলে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে সংঘর্ষের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না— শ্রেণী-সংগ্রাম অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে।

ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যাহা বুঝা যায় তার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের কোন স্থান নাই। ভারতীয় সভ্যতা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সকল লোকের মৌলিক অধিকার স্বীকার করিয়া লোকতন্ত্রকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম। আমার স্বপ্নের রামরাজ্যে উজির ও ফকির সকলেরই অধিকার সমান।

এ কথা নিশ্চিত জানিয়া রাখুন যে, আমার যেটুকু প্রভাব আছে, শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে সমগ্রভাবে তাহা প্রয়োগ করিব। যদি এমন দিন আসে যে অন্যায়ভাবে আপনাদের সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইতেছে তাহা হইলে তখন আমিও আপনাদের সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব।

প্রশ্ন—এ্যাসেম্ব্লীর আগামী নির্বাচনে আমরা কংগ্রেস প্রার্থীকে সাহায্য করিতে মনস্থ করিতেছি। কিন্তু তাঁরা এ্যাসেম্ব্লীতে গিয়া কোন্ নীতি অবলম্বন করিবেন তাহা বুঝিতে পারি না। আপনি কি পার্লামেন্টারী বোর্ডকে বুঝাইয়া আমাদের আশঙ্কা দূর করিতে সাহায্য করিতে পারেন?

উত্তর—পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে আপনারা নিজেরাই আলোচনা করিয়া দেখুন। আমি বিশেষভাবে জানি যে, কোন সভ্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া বা লোপ করার প্রস্তাবে রাজী হইবেন না। তাঁরা অবশ্য আপনাদের সঙ্গে প্রজার সম্পর্কের আমূল সংশোধন করার উপরে জোর দিবেন। এ বিষয়ে আপনারাও কিছু

কম জানেন না। সার ম্যালকম হেইলি ও লর্ড আরউইনও আপনাদের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে আপনারা যুগোপযোগী মনোভাব অনুযায়ী চলুন। এটুকু যদি আপনারা করিতে পারেন তাহা হইলেই আমরা বিশুদ্ধ ভারতীয় সমাজবাদের নবরূপ গড়িয়া তুলিতে পারিব।

পাশ্চাত্য সমাজ ও কম্যুনিজম্ যে বিচারধারাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ভারতীয় বিচারধারা হইতে স্বতন্ত্র। এই বিচারের একটি তত্ত্ব হইল, তাহারা মানিয়া লইয়াছে যে মানুষ মূলতঃ স্বার্থের জন্য সবকিছু করে। আমি এই তত্ত্ব বিশ্বাস করি না। আমি জানি যে, মানুষের সঙ্গে জন্তুর পার্থক্য সেইখানে যেখানে মানুষ নিজ অন্তরস্থ চেতনার ডাকে সাড়া দিয়া তাহার স্বভাবের জন্তু-ধর্মের আবেগের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে। জন্তুর স্বভাবে আছে স্বার্থপরতা ও হিংসা; তাহার মধ্যে এই চেতনার ক্রিয়া নাই, আছে মানুষের মৃত্যুহীন আত্মার লোকে।

এই বিশেষ তত্ত্বই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। বহু তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে এই সত্য লাভ করিয়াছে ভারতের সাধকগণ। সম্ভবতঃ এই কারণে আমাদের দেশে আত্মার রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াসে বহু সাধক তাঁদের দেহ ক্ষয় করিয়াছেন, কেহ বা জীবনপাত করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের মত এখানে কেহ পৃথিবীর দূরতম বা উচ্চতম স্থানে যাওয়ার চেষ্টায় দেহপাত করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। এইজন্যই এ দেশের সমাজবাদ বা কম্যুনিজমের ভিত্তি হইবে অহিংসা, যাহা কেবল পুঁজিপতি ও শ্রমিক অথচ ভূস্বামী ও প্রজা দুইয়ের পরিপূর্ণ মিলনের দ্বারাই ঘটিতে পারে।

কংগ্রেসের নীতি বা কর্মধারার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহাতে আপনারা বিপদের আশঙ্কা করিতে পারেন। আপনারা আমার ত্রুটি মার্জনা করিবেন। এই ভরসাতেই বলি যে আমার অনুমান, আপনাদের এই আশঙ্কার গোড়ায় আছে আপনাদের মনের গোপন অপরাধী চেতনা। জানিয়া বা না জানিয়া প্রজাদের প্রতি যদি কোন অন্যায়

অবিচার করিয়া থাকেন তাহা আর করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুন। তাহা হইলে আর কংগ্রেস বা কংগ্রেসী লোকেদের ভয় করার প্রয়োজন থাকিবে না। জমিদার ও প্রজার মধ্যে নূতন সম্পর্ক গড়িয়া তুলুন, আমরা আপনাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিব এবং আপনাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও সম্পত্তি যাহাতে বজায় থাকে তাহারই চেষ্টা করিব।

যখন আমি বলি আমরা করিব তখন আমি পণ্ডিত জওহরলালের কথা মনে করিয়াই এরূপ বলি কারণ অহিংসার মূলনীতিতে তিনি আমার সঙ্গে একমত। তিনি ভূসম্পত্তি জাতীয়করণের কথা বলেন বটে কিন্তু এতে ভয়ের কিছু নাই। সম্পত্তির জাতীয়করণ কেবল ব্যক্তির মালিকানা স্বীকার করিয়াই সম্ভব।

জাতীয়করণের একমাত্র উদ্দেশ্য যাহাতে ন্যায় ও নীতিসংগত ভাবে ভোগদখল করা হয়, যাহাতে সম্পত্তির অপব্যবহার না হয়। জমিদারী আপনাদেরই থাকুক কিন্তু সেই অধিকার প্রজাদের কল্যাণের জন্য প্রযুক্ত হউক—ইহাতে সম্ভবতঃ আপনাদের কোন আপত্তি হইবে না। স্বাধীনভাবে শান্তিতে চাষ করার বেশী রায়তরা কিছু চায় না। আপনারা যদি তাহাদেরই কল্যাণে আপনাদের জমিদারীর মুনাফা নিয়োগ করেন তাহা হইলে আপনাদের এই কর্তৃত্ব থাকায় তাহাদের আপত্তি ঘটার কারণ থাকিবে না।

[অমৃতবাজার পত্রিক , ২-৮-৩৪]

৩০৪। শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করি না, এরূপ মন্তব্য করিয়া পত্রলেখক আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। সংগ্রামের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না এরূপ নহে। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে, এই সংগ্রামকে উস্কাইয়া জিয়াইয়া রাখিয়া কোন লাভ হইবে। ক্রমশঃ আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতেছে যে, এই শ্রেণী-বিরোধ এড়াইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। শ্রেণীবিরোধকে ভিত্তি করিয়া অসন্তোষ বাড়াইয়া কোনই লাভ নাই, বরঞ্চ শ্রেণীবিরোধের

অবসান ঘটানোই কল্যাণকর। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে বিরোধ দেখা যায়—ধন থাকা বা না থাকার জন্য এ বিরোধ ঘটে নাই। যেখানে বুদ্ধিপূর্বক শ্রমিক নিজেদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করিয়া সুসংবদ্ধভাবে চলিতে পারে সেখানে শ্রমের মর্যাদা ধনের মর্যাদার সমান তো বটেই বেশী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই বিরোধ মূলতঃ সৃষ্টি হইয়াছে বুদ্ধিবিচারের পার্থক্যে। ইহা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মূর্খতার বিরোধ। এ বিরোধ বজায় রাখাও একপ্রকার মূর্খতা। এ ক্ষেত্রে একমাত্র কর্তব্য—নির্বুদ্ধিতার বিলোপ সাধন।

সংসারে অর্থের যেমন প্রয়োজন রহিয়াছে তেমনি শ্রমেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। লেনদেনের সুবিধার জন্য টাকা-পয়সা নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যে ব্যক্তির পঞ্চাশ টাকা আছে তার কাছে পঞ্চাশটি মজুরের শ্রম বাঁধা আছে (প্রতিটি মজুরের দৈনিক বেতন এক টাকা হইলে)। যে পঞ্চাশ জন শ্রমিক তার অধীনে কাজ করিবে তাহাদের মধ্যে একতা থাকিলে যে-কোন একজন মজুর পঞ্চাশ টাকার মালিকের মতই নিজেকে শক্তিশালী মনে করিতে পারিবে। এই ব্যাপারে যদি কোন বিশেষ সুবিধা থাকে তবে যারা কাজের মালিক তাদের সুবিধা ধনের মালিকের চেয়ে বেশী। যদি উভয় পক্ষই সমান শক্তিশালী হয় তাহা হইলেও উভয় পক্ষের সমতা না থাকার কোন কারণ নাই। এ বিচারে শ্রমিককে ধনের মালিকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলে সমস্যার সমাধানের কোন আশা নাই। শ্রমিকদের আত্মমর্যাদা শিক্ষা দেওয়াই একমাত্র স্থায়ী কল্যাণের পন্থা। পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার তুলনায় ধনীর সংখ্যা একান্ত নগণ্য। শ্রমিক যখন পূর্ণ আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করিয়া নিজ কর্তব্য পালন করিবে তখন ধনপতিরাও ধর্মপথে চলিতে বাধ্য হইবে। শ্রমিককে ধনপতিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলে শ্রেণীবিদ্বেষ চিরস্থায়ী করা হইবে, ফলে বিদ্বেষপ্রসূত যে সকল অঘটন ঘটিতে পারে সেগুলির কুফল সমাজকে জর্জরিত করিতে থাকিবে।

বিদ্বেষের এ কুচক্রের গতিরোধ করিতেই হইবে। এই বিদ্বেষের কারণ মনুষ্যচরিত্রের দুর্বলতা। ধনলোভের বশে ধনীর প্রতি যে বিদ্বেষ তাহা মানবচরিত্রের একটি প্রবল দোষ। এই দুর্বলতা পরিহার করিয়া শ্রমিক যখন নিজের মূল্য বুঝিতে পারিবে তখনই ধন আর লোভের বস্তু থাকিবে না, নিজের সার্থকতা সম্পাদনে ধন শ্রমিকের কল্যাণ সাধনে ন্যস্ত হইবে। ধনের চেয়ে শ্রমের মহিমা অনেক বেশী।

[হরিজন, ১৫-১০-৪৫, ২৮৫]

হৃদয়ের পরিবর্তনের দ্বারা শ্রেণীস্বার্থের বিলোপ

৩০৫। সংসারে দুর্বল ও দরিদ্রই শোষিত হয়। সংসারে যে কয়জন ধনী আছে তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেই এ শোষণ নিবারিত হইবে না। শোষণের অবসান করার একমাত্র উপায়, দরিদ্রের মোহ দূর করিয়া তাহাদিগকে শোষণকারীর সহিত অসহযোগ করিতে শিখাইতে হইবে। হিংসাবিহীন অসহযোগের ফলে শোষিত ও শোষক একই কল্যাণবুদ্ধিতে মিত্রতায় যুক্ত হইবে। ধনের নিজস্ব কোন অপরাধ নাই। দোষ ধনের অপব্যবহারে। কোন-না-কোন আকারে ধন চিরদিন সমাজের প্রয়োজন সাধন করিতে থাকিবে।

[হরিজন, ২৮-৭-৪০, ২১৯]

৩০৮। আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের জন্য প্রকৃত সমাজের উত্তরাধিকার রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শিখাইয়াছেন "সকল ভূমিই গোপালের সম্পত্তি, এ মালিকানার সীমা কোথায় ? মালিকানার সীমা নির্দেশ করে মানুষ, মানুষই সে সীমার বিলোপ সাধন করিতে পারে।" 'গোপাল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'যিনি গোধন পালন করেন' ভগবানকেও 'গোপাল' বলা হয়।

আধুনিক ভাষায় 'গোপাল' বলিলে স্টেট বা জনসাধারণ বুঝায়। বর্তমানে জনসাধারণ যে ভূমির মালিক নয় এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ

নাই। কিন্তু এ ব্যতিক্রমের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদিগের শিক্ষার কোন অপরাধ নাই। অপরাধ আমাদের, যারা সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি নাই।

আমি নিঃসন্দেহে এ কথা ঘোষণা করিতে পারি যে, চেষ্টা করিলে এই সমাজবাদের সাধনে আমরা যথেষ্ট অগ্রসর হইতে পারি, অন্ততঃ অন্যান্য দেশ, যার মধ্যে রাশিয়াও রহিয়াছে, যতটা অগ্রসর হইয়াছে ততদূর অগ্রসর হওয়া কঠিন নয়—এবং বিনা হিংসা প্রয়োগেই তাহা সাধন করিতে পারিব। বলপূর্বক মালিকানার বিলোপ সাধনের পরিবর্তে চরখা ও চরখা ব্রতের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে তাহার প্রয়োগেই সাধন সার্থক হইবে। মালিকানা তারই হওয়া উচিত যে ভূমি বা অপর কোন সম্পদের সদ্ব্যবহার করে। যারা নিজের হাতে কাজ করে তারা এই সহজ সত্য বোঝে না—ইহাই সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার।

[হরিজন, :-১-৩৭, ৩৭৫]

কৃষকের ভাগ

৩০৯। প্রশ্ন—চাষের ব্যাপারে মালিকের অংশ অর্ধেক হইতে তিন ভাগের এক ভাগে কমাইয়া দেওয়া যে ন্যায়সংগত তাহা আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কিন্তু যে সকল ভূম্যধিকারী এই আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, সরকারের কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় তাঁহাদের কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বাংলা দেশে এই আন্দোলন স্থগিত রাখা উচিত নয় কি?

আপনি বলেন যে, কেবল মাত্র অহিংসার পথে সমাজে এরূপ একটি আমূল পরিবর্তন আনিতে পারা যাইবে। কার্যতঃ দেখা যায়, দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ দল আপনার নৈতিক সমর্থনের সুবিধা লইয়া অহিংসার পথ কৌশলে এড়াইয়া হিংসার পথে আন্দোলন চালাইতে থাকে। বর্তমান অবস্থায় এই আন্দোলনের

ফলে যেহেতু বাংলার সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সর্বস্বান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, আপনার পক্ষে এই আন্দোলনকে সমর্থন করা উচিত হয় না।

উত্তর—উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী প্রশ্নকর্তাকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে নীতিগত বিচার করিয়া থাকেন। বাংলার স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষার সুযোগ তাঁর ঘটে নাই। তাঁর এই অজ্ঞতার ফলে যদি বিচারে কোন ত্রুটি থাকে সে দায়িত্ব প্রশ্নকারীকে বহন করিতে হইবে।

তাঁর মনে হয় প্রশ্নকারীর যুক্তিতে কিছু অতিরঞ্জন ঘটিয়াছে। 'তেভাগা' প্রথা চালু হইলে জমির মালিকের সর্বনাশ হইবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। তাহার জমি তো কাড়িয়া লওয়া হইতেছে না। মালিক হিল্লী-দিল্লী যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর অংশ পাইবেন, কেবল শতকরা পঞ্চাশের পরিবর্তে তেত্রিশ ভাগ পাইবেন। এই প্রস্তাবে সর্বনাশ হওয়ার মত কিছু আছে বলিয়া গান্ধীজী মনে করেন না। শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ লইয়া সকলেই খুব উত্তেজিত হওয়ায় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে। দলগত স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করিয়া প্রতিটি সমস্যাকে তার নিজ গুণানুসারে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ইহাতে বিচার নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই কারণে যে-অন্তর্নিহিত নীতির বশে ভূমির মালিকদের প্রাপ্য অংশ কমানোর প্রস্তাব করা হইয়াছে সেই নীতির মূলতত্ত্ব মালিকদের বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই সেই পরিবর্তন সফল করিয়া তুলিতে পারিবেন। মালিকানার পূর্ণ-বিলোপ ঘটার চেয়ে এই সামান্য ক্ষতি তাঁদের কাম্য হওয়া উচিত। এ কথা তাঁরা যেন মনে রাখেন যে বিগত অনেক বৎসর ধরিয়া ভারতের মানুষের সম্পত্তি-বিলোপ ঘটিয়া আসিতেছে। একটির পর একটি করিয়া ভারতের বহু শিল্প নষ্ট করা হইয়াছে। ভারতের কি কারিগর কি চাষী সকলেই ধীরে ধীরে দৈন্যদশায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

যে পরিবর্তন কামনা করিয়া বর্তমান আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে, যদি অহিংস উপায়ে সেই পরিবর্তন ঘটানো যায় তাহা হইলে শ্রেণী-বিশেষের লব্ধ গুণের অপচয় ঘটিবে না। মানিয়া লইতে হইবে যে, ভূমির মালিকরা অধস্তন লোকদের শোষণ করিয়া নিজ প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা পরিহার করিবেন। ভবিষ্যৎ অহিংস সমাজে সকল ভূমির মালিক হইবে স্টেট বা সমাজ, কারণ এ কথা তো সকলেই জানে "সভি ভূমি গোপালকি"—সকল ভূমির মালিক স্বয়ং গোপাল বা ভগবান। এই নীতি স্বীকৃত হইলে কাহারও বুদ্ধি বা শক্তির অপচয় ঘটিবে না। বলপূর্বক এ পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। বিচার করিয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, বলপ্রয়োগে ভূমির মালিকের সর্বনাশ ঘটাইলে তার ফলে অবশেষে কৃষিমজুরেরও সর্বনাশ ঘটিবে। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া চলিলে কোন পক্ষেরই ক্ষতি হইবে না।

[হরিজন, ৯-৩-৪৭, ৫৭]

অছিবাদ

৩১২। প্রশ্ন—ধনী ব্যক্তিদের আপনি নিজ নিজ সম্পত্তির অছি হইতে বলিতেছেন। আপনার বিচার অনুসরণ করিয়া চলিলে তাঁহাদের নিজ সম্পত্তির মালিকানা ত্যাগ করিতে হইবে এবং অছি-রূপে সাধারণের হিতার্থে সর্বসম্মতিক্রমে সেই সম্পত্তি বিনিয়োগ করিতে হইবে। এ ব্যবস্থা সম্ভব হইলে বর্তমানে মালিকের মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকারী হইবে কে ?

উত্তর—এ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, বহুকাল হইতে এই সম্পর্কে যে অভিমত তিনি পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহাতে তিনি অবিচলিত আছেন। তিনি বলেন, সংসারে সবই ভগবানের দান সুতরাং তিনিই একমাত্র প্রভু। এই কারণে সংসারের সমুদায় ভোগ্য বস্তুতে সকলেই যখন অধিকারী, বিশেষ কোন লোকের বিশেষ

অধিকার থাকিতে পারে না। যদি কোন লোকের প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন সম্পত্তি থাকে তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত অংশ নরনারায়ণের সেবায় নিয়োগ করিবার দায়িত্ব তাহারই।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্—ভবিষ্যতের জন্য কোন সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন তাঁর নাই। নিত্য তিনি নূতনকে সৃজন করিতেছেন। ঈশ্বরের বরপুত্র মানুষেরও উচিত প্রতিটি দিন নূতন করিয়া বাঁচা। আগামী দিনের জন্য সঞ্চয়ের ভাবনা পরিহার করিয়া বাঁচা। যদি এই সত্য উপলব্ধি করিয়া মানুষ তাহার সাধনে রত হয় তাহা হইলে ইহাই বিধিতে পরিণত হইবে। সেই সঙ্গে অছিবাদও আইনসংগত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। গান্ধীজীর মনে আশা ছিল যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ভারতের কাছে ন্যায়ধর্মের অবদান গ্রহণ করিবে, যার ফলে শোষণ ও বিশেষ অধিকারের গণ্ডী (যেমন অস্ট্রেলিয়া ও অপর কয়েকটি দেশে শ্বেতকায় জাতিরা বংশানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছেন) বিলুপ্ত হইবে। এই সব পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া আমরা বিগত দুই মহাযুদ্ধের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ যুদ্ধের বীজ রোপণ করিয়া রাখিয়াছি।

অছির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, বর্তমান অছির আইনের সম্মতি লইয়া নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিবার অধিকার থাকিবে।

[হরিজন, ২৩-২-৪৭, ৩৯]

৩১৩। প্রশ্ন—প্রতিটি উত্তরাধিকারী নির্বাচন একটি বৃহৎ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। অছি কি কেবল তাঁর উত্তরাধিকারীর নাম প্রস্তাব করিবেন এবং সে বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার ভার থাকিবে সরকারের উপর?

উত্তর—এ বিষয়ে তিনি পূর্বে যে সমাধান বলিয়াছিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, মূল মালিকই প্রথম অছি হইবেন। তাঁহারই অধিকার থাকা উচিত তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন

করার। অবশ্য সরকারের অধিকার থাকিবে তাঁহার নির্বাচনকে চূড়ান্ত রূপ দান করার। এই ব্যবস্থায় কি সরকার কি ব্যক্তি, উভয়কেই পরস্পরের অপেক্ষায় কাজ করিতে হইবে।

প্রশ্ন—অছিধর্মের প্রসার ঘটিলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পাইবে। তখন কি অবশেষে সরকারই সমস্ত মালিকানা দখল করিয়া বসিবে না? তখন যে-সরকারের সৃষ্টি হিংসা-শক্তি হইতে তাহার মালিকানা স্বীকার করিতে হয়। যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, যেমন গ্রাম-সংসদ বা মিউনিসিপ্যালিটী, মালিক হইয়া বসে তাহা হইলে উহারাও তো হিংসার সৃষ্টি ঐ সরকারের আইনের দ্বারাই উহাদের কার্যকারিতা লাভ করিবে।

উত্তর—ভাবনার ঋজুতার অভাবে এই চিন্তার বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হইলে দেখা যাইবে, অছিধর্ম প্রচলিত হইলে আইনসম্মতভাবে সকল মালিকানা অছিদের হাতেই থাকিবে, সরকারের হাতে নয়। যাহাতে সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত না হইয়া সমাজের কল্যাণের জন্য মূল মালিকদের ন্যায়সংগত অধিকার বজায় থাকে এইজন্যই অছিবাদের পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইয়াছে।

গান্ধীজী এ যুক্তিও স্বীকার করেন না যে, সরকার চিরদিনই হিংসা-শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই চলিবে। কল্পনায় এরূপ সম্ভব বলিয়া ভাবা যাইতে পারে। হিংসার কুচক্র ভিন্ন করার জন্য সরকারকে কার্যক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে অহিংস শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে।

[হরিজন, ১৬-২-৪৭, ২৫]

নবম পর্ব

রাজনীতিতে স্বায়ত্ত-শাসন

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

৩৩১। স্বাধীনভাবে বাঁচিতে না পারিলে মৃত্যুই শ্রেয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১-২২, ৫]

৩৩২। প্রত্যেকটি দেশের লোকের যেমন স্বাধীনভাবে নিজেদের খাওয়া, পরা ও বাঁচিয়া থাকার অধিকার থাকা উচিত, তেমনই নিজেদের শাসনব্যবস্থাও নিজেদের করিবার অধিকার থাকা উচিত, শাসনব্যবস্থা যেমনই তাহারা করুক না কেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১০-৩১, ৩০৫]

নৈরাজ্যবাদ

৩৩৩। সকল বিষয়েই গবর্নমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া চলার প্রয়াসই স্বরাজের সাধনা—সে গবর্নমেণ্ট বিদেশেরই হোক আর স্বদেশেরই হোক। স্বরাজ বলিতে যদি জীবনের ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও গভর্নমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ বুঝায় তবে সে স্বরাজ প্রহসন মাত্র।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৮-২৫, ২৭৬]

ভারতের স্বরাজের রূপ

৩৩৪। ভারতের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী, তারা ভারতেই জন্মাক বা ভারতবাসী মাত্র হোক, যারা নিজ নিজ কায়িক পরিশ্রমে ভারতের সেবায় নিযুক্ত আছে এবং ভোটার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদের মতে যে শাসনকার্য নির্বাহ হয় সেই শাসনব্যবস্থাকেই ভারতের স্বরাজ বলা যায়। এ কথা প্রমাণ করা যায় যে, কয়েকজন বিশেষ লোককে ক্ষমতার আসনে বসাইলেই প্রকৃত স্বরাজ আসে না— যখন সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে জনসাধারণ তাহাদিগকে বাধা

দিতে পারিবে তখনই প্রকৃত স্বরাজ আসিবে। এ যুক্তির এই অর্থও করা যায় যে, শাসনক্ষমতাকে সুপথে পরিচালিত করার ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সংযত করার শিক্ষা জনসাধারণের ভিতর প্রসার লাভ করানোই স্বরাজ লাভের একমাত্র পন্থা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-১-২৫, ৪০, ৪১]

৩৩৬। বহুকাল হইতে আমরা ভাবিয়া আসিতেছি যে, কেবলমাত্র আইনসভার মারফতেই শাসনক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। এই ভ্রান্ত ধারণাকে জড়তা বা মোহান্ধতার ফল বলিয়াই মনে করিয়াছি। ইংরাজ জাতির ইতিহাসের অস্পৃষ্ট জ্ঞান হইতেই এরূপ ধারণা করা সম্ভব যে, জনসাধারণ পার্লামেণ্টের মারফৎ ক্ষমতা লাভ করে। সত্যঘটনা অন্যরূপ। ক্ষমতা সকল অবস্থাতেই থাকে জনসাধারণের হাতে, সীমিত সময়ের জন্য জনপ্রতিনিধিদের হাতে সে ক্ষমতা ন্যস্ত হইতে পারে। জনমতের আশ্রয় ছাড়া পার্লামেণ্টের কোন ক্ষমতা, এমনকি অস্তিত্বই নাই। এই সরল তত্ত্বটি বিগত চব্বিশ বৎসর ধরিয়া জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আইন-অমান্যের মধ্যেই সকল ক্ষমতা নিহিত আছে। যদি দেশের সকল লোক আইনসভার রচিত আইন মানিতে অস্বীকার করে এবং তাহার ফলে যে কোন শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত হয় তখন কী ঘটিবে?— দেশের সকল আইন সকল শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া যাইবে। অল্পসংখ্যক ভিন্নমতাবলম্বী লোককে শাসন করিতে পারে পুলিশ বা সৈন্যদল—তারা যতই ক্ষমতাশালী হোক না কেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেশবাসী যখন চরম দুঃখবরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাধা সৃষ্টি করে তখন পুলিস বা সৈন্য তাহাদের দমন করিতে পারে না।

[গঠনকর্মের ধারা, ৫]

ভোটাধিকার : সর্বোধ্ব ও সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা

৩৩৮। ভোটাধিকার বিষয়ে গান্ধীজীর দৃঢ় মত ছিল যে, একুশ বৎসর (আঠারো বৎসর হইলেও ভালো) বা তদূর্ধ্ব বয়সের সকল

স্ত্রী-পুরুষের ভোটাধিকার থাকিবে। বৃদ্ধের ভোটাধিকার থাকার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। ভারত তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের দ্বারা শাসিত হইবার কোন যুক্তি আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। বৃদ্ধদের সম্মুখে আছে মৃত্যু—যুবকেরাই জীবন-পথের পথিক। গান্ধীজীর মতে যেমন আঠারো বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ভোটাধিকার থাকিবে না, তেমনই থাকিবে না বৃদ্ধদের—ধরা যাইতে পারে পঞ্চাশের বেশী বয়সের লোকের।

ভোটাধিকারের সঙ্গে, এমনকি তারও পূর্বে, সকলের শিক্ষিত হওয়া দরকার। এ শিক্ষা বলিতে স্কুলের লেখাপড়া শেখাই বুঝায় তাহা নয়। যে শিক্ষা স্কুলে শেখানো হয় তাহার কিছু সার্থকতা থাকিলেও থাকিতে পারে। তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের অন্তর উপবাসী রহিয়া গিয়াছে, আমাদের চিত্তদৌর্বল্য ঘটাইয়া আমাদিগকে দেশপ্রেমের বীর্যলাভে বঞ্চিত করিয়াছে। দেশের লোক দেশীয় ভাষা শিক্ষা করুক। আমাদের দেশের ভাষার গৌরব পৃথিবীর যে-কোন দেশের ভাষার গৌরবের অপেক্ষা কম নয়। যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় লোককে দেশের প্রতি কর্তব্য শিক্ষা দেওয়া, সরলভাবে উপযুক্ত আগ্রহের সহিত শিখাইবার চেষ্টা করিলে বেশী সময় লাগার কথা নয়।

[হরিজন, ২-৩-৪৭, ৪৫]

সংখ্যালঘুর অধিকার

৩৩৯। বেশীরভাগ লোকের ভোটের জোরে দেশশাসন-কার্য চালানোর সার্থকতা খুবই সীমাবদ্ধ। ছোটোখাটো ব্যাপারে অধিক লোকের মত মানিয়া চলার বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্তু যেখানে সত্যের অপলাপ হয় সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বশীভূত হওয়া দাসত্বের সমতুল্য হইয়া পড়ে। অধিকসংখ্যক লোকের মত যাহাই হউক না

কেন, সত্যের অনুসরণে বাধা হইলে তাহাকে অমান্য করাই ধর্ম। গণতন্ত্রের যথার্থ প্রয়োগে জনসাধারণ মেষপালের ন্যায় চলে না। প্রকৃত গণতন্ত্রের লক্ষ্যই হইল—ব্যক্তির মতের ও কর্মের সর্বোত্তম স্বাধীনতা ঘটানো।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৩-২২, ১২৯]

৩৪০। বিবেকের নির্দেশ অনুসরণে সংখ্যাধিক্যের মতের কোন স্থান নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৮-২০, ৩১৮]

স্বরাজের অধীনে সাধারণ লোকের অবস্থা

৩৪২। আমি যে স্বরাজের কল্পনা করি তাহা দরিদ্রের স্বরাজ। রাজারা বা ধনীরা বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন অনায়াসে পাইয়া থাকেন দরিদ্রদেরও সেইরূপ পাওয়া উচিত। অবশ্য এমন হইতে পারে না যে সকলেই রাজপ্রাসাদে বাস করিবে। মানুষের সুখের জন্য প্রাসাদের প্রয়োজন হয় না। আমি বা আমার মত দরিদ্র ব্যক্তি প্রাসাদে বাস করিতে গেলে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে। কিন্তু জীবনের সাধারণ প্রয়োজনীয় বস্তু ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই পাওয়া উচিত। আমি নিঃসংকোচে ঘোষণা করিতে পারি যে, যে স্বরাজ সকলকে সমানভাবে প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়ার সুযোগ করিয়া দিতে না পারে তাহা কখনই পূর্ণ স্বরাজ হইতে পারে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৩-৩১, ৪৬]

সকল দেশের সম্মেলনক্ষেত্রে ভারতের স্থান

৩৪৬। পূর্ণ স্বরাজ বলিতে আমি এমন বুঝি না যে, ভারত অন্য সকল দেশ হইতে দূরে থাকিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিবে; বরঞ্চ সকল দেশের সহযোগে পূর্ণ আত্মমর্যাদায় স্বরাজ লাভ করিয়া ভারত সুস্থ-ভাবে শান্তির পথে অগ্রসর হইবে। আমার দেশপ্রেম যতই প্রবল

হউক না কেন, নিজের দেশের দূরে সরিয়া থাকা চাহে না। কোন দেশ বা কোন ব্যক্তির বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করা আমার দেশপ্রেমের কাম্য নয়। যে তত্ত্বের উপর মানুষের আইন প্রতিষ্ঠিত তাহা যতটা আইনসংগত তার চেয়ে বেশী নীতিসংগত। আইনপুস্তকে যে মহান্ তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে "তোমার নিজের সম্পত্তি ও ক্ষমতার এমন ব্যবহার করিবে যাহাতে তোমার প্রতিবেশীর কোন ক্ষতি না হয়", ইহাকে আমি একটি চিরন্তনী সত্য বলিয়া জ্ঞান করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৩-৩১, ৫১]

৩৪৯। আমি চাই ভারত স্বাধীন ও প্রবল হইয়া পৃথিবীর কল্যাণের জন্য যেন স্বেচ্ছায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। ভারতের প্রতিটি মানুষ পরিবারের কল্যাণে যেন নিজেকে উৎসর্গ করে। পরিবারের সার্থকতা গ্রামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করায়। গ্রাম জেলার জন্য, জেলা দেশের জন্য, দেশ জাতির জন্য এবং জাতি বিশ্বের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হউক।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৯-২৫, ৩২১]

দশম পর্ব

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ ও উপায়

৩৫৫। ধীরে ধীরে স্বাধীনতা লাভ করার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা লাভ সন্তানজন্মের মত। হয় আমরা পূর্ণ স্বাধীন নচেৎ আমরা পরাধীন। সকল জীবিত প্রাণীই মুহূর্তমধ্যে জন্মগ্রহণ করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৩-২২, ১৪৮]

স্বাধীনতার অন্তরায়

৩৫৬। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, নিজের দুর্বলতা ছাড়া অন্য কোন কারণে কেহই তাহার স্বাধীনতা হারায় না।

[ইণ্ডিয়ান কেস ফর স্বরাজ, ২০৯]

৩৫৮। প্রবলতম স্বেচ্ছাচারীর শাসনও টিকিয়া থাকে কেবল শাসিতের সম্মতির জোরে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই সেই সম্মতি গায়ের জোরে আদায় করা হয়। যে মুহূর্তে শাসিত প্রজার মন হইতে স্বেচ্ছাচারীর শাস্তির ভয় চলিয়া যায় সেই মুহূর্তে তাহার কর্তৃত্বের অবসান হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৬-২০, ২২৫]

অসহযোগের অধিকার ন্যায়সংগত

৩৬০। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সকল দেশপ্রেমিকের দল হিংসাত্মক কার্যকলাপের পক্ষপাতী ছিলেন, অনেক দিন ধরিয়া ধৈর্য-সহকারে যুক্তিবিচার প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের মত পরিবর্তনে সক্ষম হইয়াছি, এ দাবী করিতে সাহস করি। অবশ্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, নীতিধর্মের প্রেরণায় তাঁহাদিগকে হিংসার পথ ত্যাগ করাইতে আমি চেষ্টা করি নাই; করা উচিত বলিয়া মনে করি নাই।

অভীষ্ট সাধনের জন্য অহিংসাই যে শ্রেষ্ঠ পথ তাহাই বুঝাইয়াছি। ফলতঃ ঘটিয়াছে এই যে, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য হিংসাত্মক কার্য-কলাপ বন্ধ হইয়াছে। বহু বলপ্রয়োগেও হিংসাত্মক কার্য বন্ধ হইত না বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। হিংসাত্মক কার্য বন্ধ হওয়া সম্ভব হইয়াছে কারণ বহু স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জনসাধারণ এক অভিনব সাধনমার্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে; তাহারা বুঝিয়াছে, যত বেশী লোক এই সংগ্রামে যোগ দিবে সাফল্য তত বেশী সুনিশ্চিত হইবে। একমাত্র অসহযোগ আন্দোলনের পথেই আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া আইনসংগত ভাবে সংগ্রাম চালানো যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই নীতি স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, কুশাসক রাজার সহিত সকল সহযোগ বর্জন করা উচিত।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৬-২০, ১৬৮]

স্বরাজ ও আত্মশুদ্ধি

৩৬৩। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হইল অধার্মিক ও অনমনীয় সরকারের সঙ্গে সকল সহযোগ ত্যাগ করা; এই চেষ্টার ফলে ঘটে আত্মশুদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ সর্বপ্রকার সরকারী কর্তৃত্ব ও পরিচালনা ত্যাগ করার চেষ্টায় নিজেদের সকল কাজ নিজেরাই করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। উভয় প্রচেষ্টার স্ব-ভাব অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতি করার পথ ত্যাগ করিতেই হয়, ফলে আমাদের নিঃসহায় ভাব আপনিই লোপ পায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৪-২১, ১০৬]

৩৬৫। ভারতকে ইংরাজ শাসন হইতে মুক্ত করিয়াই আমি তৃপ্ত হইব না; ভারতকে সকল রকম অধীনতা হইতে মুক্ত করাই আমার লক্ষ্য। 'শ্যাম'কে সরাইয়া 'রাম'কে রাজা করার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। এই কারণে স্বরাজের জন্য এই আন্দোলনকে আমি আত্মশুদ্ধির আন্দোলন বলিয়া মনে করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৬-২৪, ১৯৫]

৩৬৬। সংস্কার আরম্ভ হওয়া উচিত অন্তর হইতে। ভিতরের দীন অবস্থার উপরে চকচকে বাহ্যিক শাসনতন্ত্রের কাঠামো চাপাইলে, শুধু বাহিরে সংস্কৃত হইলে, অবস্থা হইবে স্বর্ণরথে শব লইয়া যাওয়ার মত।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৬-২৬, ২২৬]

৩৬৮। অহিংসা ও অসহযোগের মূলকথা হইল আমাদের এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যে, দুঃখসহনের মধ্য দিয়াই কেবল আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া সম্ভব। উপাধি, আইনসভা, আদালত ও বিদ্যালয় ইত্যাদি বর্জন দুঃখসহনের প্রতীক (যদিও সামান্য মাত্রায়) ভিন্ন আর কি? ঐ প্রাথমিক দুঃখভোগ বৃহত্তর দুঃভোগের সূচনা মাত্র— কারাজীবন বরণের কঠোরতা, প্রয়োজন হইলে ফাঁসীকাষ্ঠে আত্মদান বৃহত্তর দুঃখভোগের অন্তর্গত। যত আমরা কষ্ট সহিব, যত বেশীসংখ্যক ঐ কষ্টসহনের অংশীদার হইব, তত আমরা আমাদের লক্ষ্যের নিকতর হইব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৯-২১, ৩১০]

স্বাধীনতার মূল্য

৩৭০। এক জাতি অপর জাতিকে স্বরাজ উপহার দিতে পারে না। স্বাধীনতার মত অমূল্য সম্পদ্ জাতির শ্রেষ্ঠতম সেবকদের জীবন দানের দ্বারাই পাওয়া সম্ভব। অন্তহীন সেবা ও অপরিমিত দুঃখ ভোগের দ্বারাই স্বরাজ লাভ করা যাইতে পারে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১-২২, ৪]

৩৭৫। পৃথিবীর জাতিসমূহের দরবারে মর্যাদার আসন পাইতে হইলে এক-আধ সহস্র নয় বহু-বহু সহস্র নিরপরাধ নরনারীর হত্যার সম্মুখে অবিচলিত থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই সাধনায় সফল হইলে তবে ভারত বিশ্বের সভায় এমন আসন পাইবে যার উচ্চে আর কোন জাতি কোনদিন উঠিতে পারে নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-৪-২০, ৮৪]

মৃত্যুই অমৃতলোকের দ্বার

৩৭৬। দুঃখের দহনে পরিশুদ্ধ না হইয়া কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে নাই। মা সন্তানধারণের কষ্ট বরণ করেন বলিয়াই আজ আমরা বাঁচিয়া আছি। বীজের আত্মবিলোপ দ্বারাই শস্য লাভ হয়। মৃত্যুর তিমিরান্ধকার হইতে জীবন জাগিয়া ওঠে। দুঃখের দহনের মধ্য দিয়া পরিশুদ্ধ হইবার এই সনাতন বিধি পালন না করিয়া ভারত কি দাসত্ব-মুক্ত হইতে পারিবে ?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৬-২০]

৩৭৮। যে জাতি মৃত্যুকে শিয়রের উপাধান করিতে পারে তাহারাই ধন্য। যাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে তাহারাই ভয়কে জয় করিয়াছে।

[হিন্দ্ স্বরাজ, ৪৮]

অহিংসা যন্ত্র না মন্ত্র ?

৩৮৪। অহিংসার চরম চিত্র আমি এখনও আমার দেশের লোকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করি নাই। কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে যে অহিংসার ঘোষণা আমি করিয়াছি তাহাতে অহিংসাকে অভীষ্ট লাভের উপায় মাত্র জ্ঞানে সেই রূপে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু উপায় মাত্র হইলেও উপায়ের সাধনে কায়মনোবাক্য নিষ্ঠা রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমরা যদি স্বীকার করি যে সততাই শ্রেষ্ঠ পথ তাহা হইলে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে সততা থাকা চাই নচেৎ আত্ম-প্রবঞ্চনা করা হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৩-২২, ১৩০]

৩৮৫। যদি অধিকাংশ লোক কংগ্রেসের অহিংস কর্মপন্থায় ও সত্যনিষ্ঠায় বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে কংগ্রেসের কর্মনীতির ধারা তাঁহারা পরিবর্তিত করিয়া লইতে পারেন। বুঝিয়া দেখা দরকার যে নীতি ও কৌশল এক জিনিস নহে। কাজের কৌশল অবস্থা বিচারে

পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু কাজের নীতি প্রয়োজন-মত রদবদল করা সম্ভব নয়। কর্মসাধনের ব্যাপারে নীতি বা কৌশল কোনটিরই মূল্য কম নয়। এই কারণে কংগ্রেসের অহিংসা নীতিকে যাঁরা উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল বলিয়া মানিয়া লইয়া কংগ্রেসের সভ্য রহিয়াছেন তাঁরা যদি কংগ্রেসী পোশাকের অন্তরালে হিংসামূলক কাজ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অসাধুতার অপবাদ ঘটিলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। স্বরাজের পথে অগ্রগতির সবচেয়ে বড় অন্তরায় হইয়াছে আমাদের কর্মপদ্ধতিতে আমাদের নিজেদেরই আস্থার অভাব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৭-৩১, ১৯৫]

স্বরাজ, সমাজগঠন ও আইন অমান্য

৪১৪। অহিংসা ও সত্যের পথে পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করিতে হইলে গঠনমূলক কাজই প্রধান অবলম্বন। গঠনকর্মের পরিপূর্ণ সাধনই পূর্ণ স্বরাজ। এমন হওয়া সম্ভব যে, দেশের চল্লিশ কোটি লোক পূর্ণ উদ্যমে দেশগঠনের কাজে লাগিয়া একেবারে নীচে হইতে দেশকে গড়িয়া তুলিতেছে। সেই অবস্থা কল্পনা করিয়া দেখুন। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই প্রয়াসের ফলে সকল রকম অধীনতা, সেই সঙ্গে বিদেশী শাসনের অধীনতাও ঘুচিয়া যাইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী।

যখন বিরূপ সমালোচকরা আমার এই প্রস্তাবকে উপহাস করেন তখন বুঝিতে পারি যে, তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী একদিন একযোগে গঠনকার্যে ব্রতী হইয়া দেশের উন্নতি সাধনে প্রযত্ন করিবেন। এই ব্যঙ্গ-পরিহাসের মধ্যে যে অনেকখানি সত্য আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমালোচকদের আমি বলি আমার প্রস্তাবটি কাজে প্রয়োগ করার অযোগ্য নয়। কয়েকজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনসেবককে লইয়া দল গঠন করিয়া কাজ করিলে আমার এ প্রস্তাব

অন্য যে-কোন কর্মধারা অপেক্ষা কম গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। মনে হয় লোক-সংগঠনের যত প্রস্তাব এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে আমার প্রস্তাবই সর্বাপেক্ষা সুসাধ্য। সে যাহা হউক, অহিংসা নীতির অনুগামী অপর কোন প্রস্তাবকেই অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেছি না।

আইন-অমান্য আন্দোলন, সে ব্যক্তিগত হউক বা সমষ্টিগত হউক—গঠনমূলক কাজের সহায়ক এবং বিদ্রোহের সমান কার্যকরী। সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে হইলে সামরিক শিক্ষা যেমন একান্ত প্রয়োজন, অহিংস সংগ্রামের জন্য বাহিনীকে সেইরূপ গঠনমূলক কাজে শিক্ষিত করিয়া তোলা প্রয়োজন। সশস্ত্র সংগ্রামে অস্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন হয় মাঝে মাঝে, অহিংস সংগ্রামেও সেইরূপ মাঝে মাঝে মুখোমুখি লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

কর্মীদের আইন অমান্য করিয়া সংগ্রামের সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ানোর প্রয়োজন নাই। দেশগঠনের প্রচেষ্টায় বাধা ঘটাইয়া যখন কাজ পণ্ড করিবার চেষ্টা হইবে তখনই সংগ্রামের প্রয়োজন হইবে এই বুঝিয়া সর্বদা তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করিবার প্রয়াসকে সব রকমে বাধা দিতে হইবে। কূটনৈতিক চুক্তির রদবদল উপেক্ষা করা যাইতে পারে, অবশ্য যেখানে প্রকৃত বন্ধুত্ব ঘটিতে পারে না সেখানে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখাই শ্রেয়। খাদির উৎপাদন ও ব্যবহার যদি মোটামুটি জনসাধারণের গ্রাহ্য হয় তাহা হইলে খাদি আন্দোলনকে সকল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে। জোর করিয়া লোককে খদ্দর ব্যবহারে প্ররোচিত করা সম্ভব নয়। গ্রাম হইতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করিতে হইলে স্বাবলম্বী খাদি যে এই আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ তাহা বিচারপূর্বক উপলব্ধি করিলে তবেই খাদির প্রচলন হওয়া সম্ভব। এই কাজে যাঁরা সর্বপ্রথম ব্রতী হইবেন তাঁহাদের যাত্রাপথে বহু বহু বাধা আসিয়া দাঁড়াইতে পারে। তাঁহাদের সমগ্র সাধনপথ বহু

দুঃখে অতিক্রম করিতে হইতে পারে। দুঃখ বরণ না করিলে স্বরাজ আসিবে না। হিংসামূলক সংগ্রামে সত্যই পদদলিত হয়, অহিংস সংগ্রামে সত্যের পতাকা জয়যুক্ত হইয়া থাকে।

আমার এই যুক্তি যিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন, গঠনমূলক কাজের বিপুল সম্ভাবনাও তিনি বুঝিতে পারিবেন। প্রচলিত রাজনীতি বা উত্তেজনামূলক বক্তৃতার চেয়ে গঠনমূলক কাজ কম চিত্তাকর্ষক নয়।

গঠনমূলক কাজের বিস্তৃত কর্মধারা আলোচনা করিয়া আমি একটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছি। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়া টীকা লিখিয়াছেন। অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে, এই পুস্তকে সব কথা বলা সম্ভব হয় নাই, মূল কথাগুলি মাত্র বলা হইয়াছে। সারা ভারতের জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা রচনা করিতে গেলে সকল সমস্যা নিঃশেষে পুঁথিগত করা অসম্ভব। বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র সমস্যার সব কিছু লিখিয়া শেষ করা যায় না। স্থানীয় কর্মীদের পক্ষেই স্থানীয় সমস্যার বিচার ও তদনুযায়ী কর্মপন্থা রচনা করা সম্ভব।

পুস্তিকাটি প্রচারিত হইবার পর আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তদনুযায়ী কয়েকটি কর্মসূচীকে সমধিক মূল্যবান জ্ঞানে নিম্নলিখিত সংকেতসূত্রগুলিতে আলাদা করিয়া বাছিয়া লইয়াছি।

গঠনমূলক সকল কার্যই আরম্ভ করিতে হইবে কৃষাণ বা চাষীকে লইয়া, সে ভূমিহীন চাষী-মজুরই হোক কিংবা ভূমিবান কৃষকই হোক। সংসারের সকল কল্যাণের মূলে এই চাষী। চাষীই হইল ভূমির যথার্থ মালিক—উপস্বত্বভোগী, অনুপস্থিত জমিদার বা ভূম্যধিকারী ভূমির মালিক হইতে পারে না। অহিংসার অনুগামী চাষী অনুপস্থিত মালিককে বলপূর্বক বেদখল করিতে পারে না। তাহাকে এমন পথে চলিতে হইবে যেন ভূম্যধিকারী তাহাকে শোষণ করিবার সুযোগ না পায়। এজন্য চাই চাষী সমাজের মধ্যে

একান্ত সহযোগ। যেখানে কৃষকদের মধ্যে সংগঠনব্যবস্থা নাই সেখানে সঙ্ঘ রচনা করিয়া সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। যেখানে কোন না কোন প্রকার সঙ্ঘ বর্তমান আছে, সেখানে তাহাকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া যুগোপযোগী আকারে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। চাষীরা প্রায় সকলেই অশিক্ষিত। প্রাপ্তবয়স্ক বা অল্প-বয়স্ক সকলকেই শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই শিক্ষা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই হওয়া দরকার। যে সকল চাষীর জমি নাই, দিনমজুরী করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের মজুরীর হার এমন হওয়া উচিত যেন তাহারা খাইয়া পরিয়া সুষ্ঠুভাবে বাঁচিতে পারে, অর্থাৎ তাহাদের পরিবারের সকলে পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া, প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ও বাসগৃহ লাভ করিয়া সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকে।

ভূমি-ব্যবস্থা ও চাষীদের ঋণের সমস্যা বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া বিচার করিতে হইবে। এই সকল সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। গবাদি পশুপালন কৃষিজীবনের প্রধান অঙ্গ। গোপালন-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনেক কিছু বুঝিবার ও অনেক কিছু করিবার রহিয়াছে—সমস্যাটি জটিল।

চাষীদের সমস্যার মতই শ্রমিকদের সমস্যা। এখানে শ্রমিক বলিতে কলকারখানার কারিগর মজুরদের কথাই বিচার্য। অল্প জায়গার মধ্যে বহু শ্রমিক একত্রে বাস করে, এদের ব্যবস্থাপনাও কেন্দ্রানুগত সুতরাং কাজের ক্ষেত্রও সীমিত। তদুপরি শ্রমিকদের লইয়া রাজনৈতিক দলগুলি নানা খেলা খেলিয়া থাকে।

কলকারখানাগুলি শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে থাকে বলিয়া শ্রমিকদের ব্যাপার শহরেই সীমাবদ্ধ। এইজন্যই এদের কাজে লোকও পাওয়া যায় বেশী। গ্রামে কর্মীরা তত বেশী যাইতে চাহে না। শ্রমিকদের মধ্যে গঠনকার্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত শ্রমিককে তার ন্যায্য অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। শ্রমিকদের আয় বাড়াইয়া বা তাহাদের বাসস্থানের উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদের

অবস্থা কিছু ভালো করাই আমাদের লক্ষ্য নয়। কলকারখানার ক্রীতদাস স্বরূপ না থাকিয়া তাহারাই কলকারখানার যথার্থ মালিক হইয়া উঠিবে, ইহাই আমাদের চরম লক্ষ্য। এইজন্য সেই পরিমাণে তাহাদের বুদ্ধি ও চরিত্রের বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। মূলধন শ্রমিকদের পরিচালনা করিবে না। শ্রমিকরাই হইবে মূলধনের যথার্থ মালিক। শ্রমিকদের বুঝা উচিত, অধিকার লাভ করিতে হইলে তদনুযায়ী কর্তব্যও পালন করিতে হইবে। কর্তব্য পালনের শিক্ষা ও প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইলে অধিকার আপনি করায়ত্ত হইবে। এতদনুযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে গঠনকার্য নিম্নলিখিত ধারায় চলা উচিত।—

(ক) শ্রমিকদের নিজস্ব ইউনিয়ন বা সমিতি থাকা উচিত।

(খ) শ্রমিকদের স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই নৈশ বিদ্যালয়ে সাধারণ ও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা অর্জন করিতে হইবে।

(গ) শ্রমিকদের পুত্র-কন্যাদের বুনিয়াদী বিদ্যায় শিক্ষিত করিতে হইবে।

(ঘ) প্রতি শ্রমিক বসতির সঙ্গে হাসপাতাল, প্রসূতিভবন ও শিশু-শিক্ষালয় থাকিবে।

(ঙ) এরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যে ধর্মঘট করিলে শ্রমিকরা নিজেদেব ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা নিজেরাই যেন করিয়া লইতে পারে। (শ্রমিকদের এমনভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে যেন তাহারা সার্থকভাবে অহিংস ধর্মঘট পালন করিতে পারে।)

এই সমস্ত কাজই ইউনিয়ন বা সমিতির মারফৎ হওয়া উচিত। আমি যতদূর জানি, আমেদাবাদের শ্রমিক ইউনিয়নকে সর্বাপেক্ষা সুব্যবস্থিত শ্রমিক ইউনিয়ন বলা যায়। ইহাতে অবশ্য এ কথা স্বীকার করা হয় না যে ঐ ইউনিয়ন আমার আদর্শে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আদর্শে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে এরূপ বলা যাইতে পারে। যদি সকল

ইউনিয়ন এই আদর্শে পরিচালিত হইত তাহা হইলে এতদিনে শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভালো হইয়া যাইত। সুসংবদ্ধ শ্রমিকেরা যদি চরিত্রে ও বুদ্ধিতে উন্নত হইতে পারে তাহা হইলে তাহারা যে-কোন মুহূর্তে মূলধনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে।

কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের পদ্ধতির বিচারের সঙ্গে সঙ্গে বারো বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে কাজ করার বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। অমি এমনও চিন্তা করি যে, যদি আমাদের যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী থাকিত তাহা হইলে শৈশবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আরম্ভ হওয়া মাত্রেই তাহাদের মধ্যে সংগঠনী কাজ আরম্ভ করা উচিত হইত। যখন আমি বলি যে শিশুরা স্কুলে যাইতে আরম্ভ করা মাত্রই তাহাদের মধ্যে কাজ করা প্রয়োজন তখন শিশু ছাত্রদের রাজনীতিতে কাজে লাগানোর কথা আমার মনে আসে না। বর্তমানে সকল বিদ্যালয়ই গভর্নমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত অথবা সরকারী প্রভাবের অধীন। এই-জন্যই ছাত্ররা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পায় না ; কতকগুলি মূল্যবান বিষয় তাদের শিক্ষার বাহিরেই থাকিয়া যায়। সংবাদপত্র বা রাজনৈতিক বক্তাদের বক্তৃতা ছাড়া তারা দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থা জানিবার কোন সুযোগ পায় না। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য কংগ্রেসকর্মীদের উচিত নিয়মিতভাবে ছাত্রদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কেমন করিয়া এই ধারা প্রচলিত করা যায় এও একটি গুরুতর সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা পর্যন্ত এ বিষয়ে ছাত্রদের পিতামাতার সহযোগ প্রয়োজন। আমার চিরদিনের মত যে, ছাত্ররা রাজনৈতিক আন্দোলনে সাক্ষাৎভাবে লিপ্ত হইবে না—আজও আমি এই মত পোষণ করি। যখন ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন চলে তখনকার অবস্থা স্বতন্ত্র। বর্তমানে সে আন্দোলনের প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। কিন্তু ছাত্রদের জাতীয়তাবোধের শিক্ষা হওয়া উচিত। স্বাধীন দেশ মাত্রেরই ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে দেশের ছাত্ররা

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া গড়িয়া ওঠে। আমাদের দেশের শিক্ষার পরিচালনা করে বিদেশীয়েরা। জাতীয় প্রেরণার বিরুদ্ধে শিক্ষা দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য।

উপরিউক্ত অবস্থায় আমাদের কর্তব্য এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে একদল কর্মী এই বিরাট্ কাজের ভার গ্রহণ করেন। এই দিক্ দিয়া ভাবিলে ইহা এক অভিনব কর্মক্ষেত্র কিন্তু এ কাজ অতিশয় মূল্যবান। আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে যে, ছাত্রদিগকে স্কুল-কলেজ হইতে ছাড়াইয়া আনা চলিবে না। ছাত্রের সংখ্যা যেরূপ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে বিদ্যালয়ের চাহিদা বুঝা যায়। সুতরাং ছাত্রদের অন্যান্য বিষয়ে স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কথা জানার প্রয়োজন ও সুযোগও বাড়িতেছে—তাহার ব্যবস্থা করাও আমাদের কর্তব্য। বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের মুক্তি হইতে পারে না, স্বাধীনতার জন্য আমাদের জাতীয় প্রয়াসের প্রয়োজন।

[হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৮-১০-৪৪]

৪১৯। যদি দেশের আপামর সাধারণ গঠনমূলক কাজে সহযোগিতা করেন তাহা হইলে স্বাধীনতা লাভের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন না করিলে চলে। কিন্তু কি ব্যক্তির কি জাতির ভাগ্যে এমনটি ঘটিতে দেখা যায় না। এইজন্যই জাতীয় অহিংস আন্দোলনে আইন অমান্যের স্থান কোথায় তাহা জানা প্রয়োজন।

আইন অমান্য আন্দোলন তিনভাবে কাজ করিতে পারে—

(১) স্থানীয় কোন অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য।

(২) স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য—স্থানীয় কোন অন্যায় বা অপরাধের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। যদি নিজে দুঃখ বরণ করিয়া আইন অমান্য করা যায় তাহার ফল কি হইবে তাহা ভাবা প্রয়োজন হয় না। চম্পারণে যখন আমি আইন অমান্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম তখন আমি বুঝি নাই তাহার ফল কি হইবে। এইটুকু জানিতাম যে লোকে

হয়তো আমার পন্থা গ্রহণ করিবে না। ঘটনার গতি যে অন্যরূপ হইয়াছিল তাহা ভগবানের দয়া বা আমার ভাগ্য, যাহার যাহা খুশী ভাবিতে পারেন।

(৩) গঠনমূলক কাজে জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগ না পাইলেও আইন অমান্য আন্দোলন করা যায়। যেমন ১৯৪১ সালে করা হইয়াছিল। (এখানে গান্ধীজী ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করিতেছেন—নির্মলকুমার বসু)। সে আন্দোলনকে যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ বা অঙ্গ বলা যায় তবুও বিশেষ একটি ত্রুটিকে উপলক্ষ্য করিয়া এই আন্দোলন চালানো হইয়াছিল—মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতার দাবী ছিল এই আন্দোলনের বিশেষ উদ্দেশ্য। কখনই কোন 'সাধারণ উদ্দেশ্য' সাধনের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালিত করা যায় না। যেমন 'ভারতের স্বাধীনতা'র জন্য আইন অমান্য আন্দোলন করা সম্ভব নয়। যে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আইন অমান্য করা হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য হওয়া চাই—এমন কিছু হওয়া চাই যাহার নিকট প্রতিপক্ষ নতি স্বীকার করিতে পারে। সেইরূপ ক্ষেত্রে আইন অমান্য প্রয়োগ করিলে সুফল ফলিতে পারে।

আইন অমান্যের সকল দিক্ ও সকল সম্ভাবনার আলোচনা করা হয় নাই। গঠনমূলক কাজের সঙ্গে আইন অমান্যের যোগ কোথায় তাহা বুঝাইবার জন্য যেটুকু বলা দরকার তাহাই বলিয়াছি। প্রথম দুইটির ক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজের বিশদ কর্মধারা নির্দেশ করার কোন প্রয়োজন হয় না এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য আইন অমান্য করিতে হইলে বিশদ বিবেচনার সহিত কর্মপন্থা নির্ণয় করিয়া তবে কাজে নামা উচিত। এই প্রচেষ্টায় যাঁরা যোগ দিবেন তাঁহাদের সচেতন কর্মকুশলতা থাকা প্রয়োজন যেন তাঁহাদের দেখিয়া জনসাধারণ প্রেরণা লাভ করিতে পারে। এইরূপ আইন অমান্য আন্দোলনে কর্মীরা প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া বিপক্ষকে যুদ্ধে

আহ্বান করে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিচার করিয়া পাঠকের বুঝা উচিত যে, অগণিত জনগণের সহযোগিতা ব্যাতিরেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য আইন অমান্যের আশ্রয় লইতে গেলে উহা মাত্র বাহাদুরিতে পর্যবসিত হইয়া ব্যর্থ হয়, দেশেরও ক্ষতি করে।

[গঠনমূলক কার্য ও তাহার প্রয়োগ, ২৮]

৪২১। দেশের কাজে প্রকৃত কর্মী হইবেন আত্মসম্মানবোধে দৃপ্ত, মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি প্রবলভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন, স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া দেশের জন্য যে কোন দুঃখ বরণে সদাই প্রস্তুত। কংগ্রেস যদি এইরূপ কর্মী সৃষ্টি করিতে না পারে তাহা হইলে এ দুর্ভাগা দেশে দরিদ্রের স্বরাজ আসিতে বহু বিলম্ব আছে বুঝিতে হইবে। আমার বা আপনার মত লোক এই সাধনে লাভবান হইতে পারি কিন্তু আমরা বড় হইলেই তাহাকে 'স্বরাজ' বলা যায় না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৬-২৪, ২১০]

৪২২। যদি ডাক আসিলেই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয় তাহা হইলে স্বাধীনতা পাইলে কর্মীরা কি করিবে?

আত্মত্যাগ ও স্বেচ্ছাদারিদ্র্য বরণ করিবার মাহাত্ম্য ও কৌশল তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। জাতিগঠনের উদ্যোগে থামিয়া গিয়া তাহাদিগকে সুতা কাটা ও খদ্দর বোনার কাজ করিতে হইবে; সকলের সঙ্গে নির্মল প্রেমাচরণ করিয়া সাম্প্রদায়িক মিলন ঘটাইতে হইবে, সকল প্রকারের অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়া নিজেকে মিলনের আধার করিয়া তুলিতে হইবে, নিজে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য ত্যাগ করিয়া পানাসক্তদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া স্বীয় চরিত্রমাধুর্যে সকলকে মাদক ত্যাগ করাইতে হইবে। এ সকল কাজ করিতে হইলে দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করা উচিত। যাঁহারা দরিদ্রের মত চলিতে পারিবেন না তাঁরা জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু ক্ষুদ্রায়তন শিল্প খুঁজিয়া লইবেন যাহাতে বেশী আয় করা যায়।

এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে, তাঁরাই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে পারিবেন যাঁহারা স্বেচ্ছায় আইন ও শৃঙ্খলার অনুগামী হইয়া চলিতে সমর্থ।

[অমৃতবাজার পত্রিকা, ৮-৪-৩৪]

৪২৩। প্রশ্ন—কেবল তাঁহারাই গ্রামের লোকের আস্থাভাজন হইতে পারেন যাঁহারা কোন সংস্থা বা গ্রামবাসীর সাহায্য ছাড়াই জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন—এ বিষয়ে আপনার মত জানিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর—এ কথা ঠিক বলিয়া আমি মনে করি না। কে বেতন লইয়া কাজ করে অথবা কে বেতন লয় না—গ্রামবাসী ইহার খোঁজ রাখে না। তারা দেখে আমাদের আচরণ, আমাদের বচন, এমনকি আমাদের ভাবভঙ্গী। আমাদের ব্যক্তিত্বের চিত্রই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। হয়তো কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে অর্থ উপার্জনের জন্যই কর্মী কাজে লাগিয়াছেন—তাহাদের সন্দেহ নিরসন করা আমাদের কর্তব্য। এর জন্য এ মনে করা ঠিক হইবে না যে, কোন সংস্থা বা গ্রামের নিকট হইতে যাঁরা কোন সাহায্য লন না তাঁরাই কেবল যোগ্য কর্মী। এমন লোক আত্মঅহংকার দোষে তুষ্ট হইতে পারে—যার ফলে সকল সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

[হরিজন, ২৫-৭-৩৬, ১৮৭]

একাদশ পর্ব

অহিংসা

৪২৫। হিংসা পৃথিবীকে জর্জরিত করিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিদের লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাহারা হিংসাচরণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে হিংসার চর্চা করিয়া মানুষের লাভ হয় নাই। নূতন পথের সন্ধানে ব্রতী হইয়া ভারতই আজ পৃথিবীকে পথের সন্ধান দেখাইয়া দিক।

[ভারতের গ্রামে গান্ধীজী, ৬৬]

আমার করণীয় কি?

৪২৭। আমি কল্পনাবিলাসী নই। আমার বিশ্বাস, আমি বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই আদর্শকে রূপায়িত করিতে চাই। অহিংসার আদর্শ কেবল ঋষি মহাপুরুষের জন্যই নয়, ইহা অতি সাধারণ লোকের ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অন্যান্য প্রাণী হিংসার নীতিতে চলিতেছে কিন্তু মানুষ বহু পরীক্ষার ফলে অহিংসার সাধনে লাভবান হইয়াছে। ইতর প্রাণীর মধ্যে আত্মার শক্তি আচ্ছন্ন হইয়া আছে তাই তারা পঞ্চশক্তির উপরে অন্য কোন সূক্ষ্ম শক্তির ক্রিয়া বোঝে না। মানুষ ইতর প্রাণী হইতে উন্নত কারণ সে দেহের শক্তি হইতে উন্নত অপর শক্তির সন্ধান জানে, তাই মানুষ সেই অধ্যাত্মশক্তির নিয়মে চলার চেষ্টা করে।

সেই ভরসায় আমি ভারতের জনগণকে সনাতন ত্যাগধর্মে দীক্ষা লইতে আহ্বান করিয়াছি। সত্যাগ্রহ এবং তদনুগামী অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন—এ সব কিছুই দুঃখ বরণের ধর্মের নূতন নাম। যে সব ঋষিরা চারিদিকের হিংসার মধ্যে থাকিয়া অহিংসার নীতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁরা নিউটন অপেক্ষা অধিক ধীশক্তি-সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ওয়েলিংটন অপেক্ষা মহত্তর

যোদ্ধা। নিজেরা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া তাঁরা অস্ত্রের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই বিরোধক্লিষ্ট পৃথিবীকে তাঁরা শিখাইয়াছিলেন যে জীবনের সার্থকতার পথ হিংসায় নয়, অহিংসায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-২০]

অহিংসা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করার একটি শক্তি হউক

৪২৮। এ কথা অবশ্য অনেকে বলিতে পারেন যে, ইতিহাসে 'অহিংস বিপ্লব' বলিয়া কিছু ঘটে নাই সুতরাং ঘটিতেও পারে না। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য, আমি এই অঘটিতকে ঘটাইবার স্পর্ধা রাখি এবং আমার দেশ অহিংসার শক্তিতে স্বাধীনতা লাভ করুক ইহাই আমার স্বপ্ন। বার বার, বহু বার আমি বলিব, অহিংসাকে ছাড়িয়া আমি আমার দেশের স্বাধীনতাও চাহি না। আমার সহিত অহিংসার যোগ এমনই নিবিড় যে অহিংসার পথ ছাড়িতে বাধ্য হইলে আত্মবিনাশের দ্বারা আমি এ জীবনের অবসান ঘটাইব। এই প্রসঙ্গে আমি সত্যের বিষয় উল্লেখ করি নাই তাহার কারণ অহিংসা ব্যতিরেকে সত্যের সাধন সম্ভব নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-৩১, ৩৫৪]

৪২৯। যুদ্ধের পথে মানুষকে নির্ভেজাল একনায়কত্বে পৌঁছাইয়া দেয়। একমাত্র অহিংসার পথেই যথার্থ ব্যক্তি স্বাধীনতা ঘটিতে পারে। আজ পৃথিবীতে দুইজন মহাপ্রতাপশালী একনায়ক [হিটলার ও মুসোলিনী—অনুবাদক] সকলের স্বাধীনতা হরণ করিবার মহা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার আজ বিচারের দিন আসিয়াছে, যুদ্ধ না অহিংসা কোন্ পথ শ্রেয়।

এই মুহূর্তে রাশিয়ার ছবি আমাদের চোখের সামনে নাই। রাশিয়ার একনায়ক কল্পনা করিতেছেন, তিনি রক্তপাতের দ্বারা শান্তির দেশে পৌঁছিবেন। আজ কেহই বলিতে পারে না রাশিয়ার একনায়কত্ব পৃথিবীতে কী প্রভাব বিস্তার করিবে।

[হরিজন, ১৫-১০-৩৮, ২৯০

৪৩০। অসত্য বা পশুশক্তির প্রয়োগে যথার্থ ব্যক্তিস্বাধীনতা বা জনতার স্বরাজ আসিতে পারে না—কারণ বিরুদ্ধ পক্ষের বিলোপ সাধন বা অবসানের দ্বারাই তাহারা ক্ষমতা লাভ করে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট না করিলে ইহা ঘটিতে পারে না। কেবল অনির্বন্ধ অহিংসার আশ্রয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

[হরিজন, ২৭-৫-৩৯, ১৪৩]

যুদ্ধ বনাম অহিংসা

৪৩১। অহিংসা-ধর্ম পালন করিতে হইলে আমাকে সকল প্রকার হিংসামূলক কাজ বর্জন করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে প্রবর্তনা ও সেবা দ্বারা যত লোককে পারি, অহিংসা পালনে ব্রতী করাইয়া আমার সঙ্গে অহিংস কার্যে যোগ দিতে প্রযত্ন করিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি বা কর্মপন্থা সর্বতোভাবে অহিংসাকে স্বীকার করে না তাহাদের কোন সৎপ্রচেষ্টাতে যদি আমি যোগ না দিই তাহা হইলে আমি অহিংসা পালনে ব্যর্থ হইব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যাহারা ইসলামের সম্মান নষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করে তাহাদের বিরুদ্ধে অবিমিশ্র অহিংস সংগ্রাম চালাইবার কাজে আমি যদি মুসলমানদের সঙ্গে যোগ না দিই তাহা হইলে আমার পক্ষে হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। যখন বিবদমান দুই পক্ষ হিংসার সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখনও কোন না কোন পক্ষে ন্যায় বর্তমান থাকে। যে ব্যক্তির সম্পত্তি অপরে বলপূর্বক হরণ করে সে বলপ্রয়োগে সেই সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলে ন্যায় তাহার পক্ষেই থাকে। যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে সত্যাগ্রহের দ্বারা, অর্থাৎ প্রেম বা আত্মিক শক্তির দ্বারা, সম্পত্তি উদ্ধার করিতে রাজী করানো যায় তাহা হইলেই অহিংসার জয় হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৬-২১, ১৭৩]

৪৩৮। দক্ষিণ-আফ্রিকার আট বৎসর ধরিয়া বিগত ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই আশা পোষণ করিয়া চলিয়াছি যে, ভারতের তথা সারা বিশ্বের কল্যাণ এই অহিংস পন্থাতেই

ঘটিবে। মানুষের মধ্যে যারা পদদলিত, হেয় হইয়া আছে তাদের প্রতি যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবিচার চলিয়াছে তাহার প্রতিকার করিবার জন্য অহিংসার ন্যায় নিরুপদ্রব ও কার্যকরী পন্থা আর কিছুই নাই। যৌবনের প্রারম্ভে বুঝিয়াছিলাম যে, অহিংসা ঘরের কোণে বসিয়া মুক্তির সাধনায় প্রয়োগ করিবার মত অস্ত্র নয়। আমাদের সামাজিক জীবনে নিষ্ঠা ও গৌরবের সহিত বাঁচিয়া মানুষ যদি চির-আকাঙ্ক্ষিত শান্তির দিকে অগ্রসর হইতে চায় তাহা হইলে বরঞ্চ অহিংসাই হইবে তাহার অবলম্বন।

[সরকারের সহিত পত্রালাপ, ১৭০]

৪৫৯। ১৯২০ সাল হইতে আমি হইয়াছি বিদ্রোহী। সেই সময় হইতে বুঝিতেছি যে, জনসাধারণের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা কেবল যুক্তিতর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, জনসাধারণ যদি দুঃখ বরণ করিয়া সংগ্রাম করিতে পারে তবেই যথার্থ অভাব মিটিতে পারে। সামাজিক মানুষের ধর্ম হইল দুঃখ বরণ করা, অরণ্যচারী পশুর ধর্ম হইল দখলের যুদ্ধ করা। বিপক্ষের বিবেক জাগ্রত করিয়া তাহার হৃদয় পরিবর্তন করিতে দুঃখ বরণ করা, পশুর হিংসা ধর্মের অপেক্ষা বহু, বহুগুণে অধিক কার্যকরী। অবহেলিত মানুষের দুঃখ দূর করিবার জন্য আমি যত আবেদন করিয়াছি এমন বোধ হয় কেহ করেন নাই। এই চেষ্টার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, যদি মূল্যবান কোন কাজ অপরকে দিয়া করানো প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কেবল যুক্তির দ্বারা করাইতে চেষ্টা করিলে তাদৃশ ফললাভ করা যায় না। অন্যের বুদ্ধিকে জাগ্রত করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়কেও জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যুক্তির দ্বারা লোকের বুদ্ধিকে উদ্দীপিত করা যায়, কিন্তু হৃদয় জয় করিয়া নূতন কিছু করিতে হইলে একমাত্র দুঃখবরণের দ্বারাই মানুষের অন্তরের গভীরে আঘাত করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলা সম্ভব। অস্ত্র নহে, দুঃখই মানুষের জয়তিলক।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১১-৩১, ৩৪১]

অহিংসার মর্ম

৪৪০। ১। অহিংসা মানুষের ধর্ম। পশুশক্তি অপেক্ষা অহিংসা বহুগুণে মহত্তর ও বলবত্তর।

২। পরীক্ষাকালে দেখা যায়, চরম অবস্থায় তারাই অহিংসার ভরসা হারায়, যাদের অন্তরে প্রেমময় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা নাই।

৩। অহিংসার সাধনে আত্মসম্মানবোধ সদাজাগ্রত ও অটুট থাকে কিন্তু ধনসম্পত্তিও তাহাতে রক্ষা পাইবে এমন বলা যায় না। অবশ্য সর্বদা অহিংস পথে চলিতে অভ্যস্ত হইলে সশস্ত্র রক্ষকের সহায়তা অপেক্ষা অহিংসাই অধিকতর সুচারুভাবে ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। এ কথা জানিয়া রাখা ভালো যে, অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ্ অহিংসার দ্বারা রক্ষা করা চলে না বা অধর্মাচরণ সমর্থিত হইতে পারে না।

৪। যে ব্যক্তি বা জাতি অহিংসার সাধনে ব্রতী হইবেন তাহাকে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া ব্রত পালন করিতে হইবে। (জাতির ক্ষেত্রে দেশের শেষ লোকটি পর্যন্ত যেন আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকে)। সবই যাইতে পারে কেবল বজায় থাকিবে আত্মসম্মান। এই কারণেই অহিংসার পথে পরদেশ দখল করা চলে না। তাই আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে আত্মরক্ষার জন্য পশুশক্তির উপরই ভরসা রাখিতে হয়।

৫। অন্তরে প্রেমময় ভগবানের প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস থাকিলে সকল মানুষের প্রতি প্রেমভাবনা থাকিবে। এই প্রেম-ভাবনার শক্তিতে বালক-বৃদ্ধ-যুবক সকলেই অহিংসার সংগ্রামে যোগ দিতে পারিবে। যখন আমরা অহিংসাকে জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব তখন কেবল জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ না ঘটিয়া সর্বথা অহিসার প্রভাব বিস্তৃত হইবে।

৬। যদি কেহ বলে যে অহিংসানীতি ব্যক্তির পক্ষে

শুভ-ফলপ্রদ হইলেও বহুজনের ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না, এ যুক্তি একান্ত ভ্রান্ত।

[হরিজন, ৫-৯-৩৬, ২৩৬]

৪৪১। পূর্ণ অহিংসা পালন কি সম্ভব? যতক্ষণ এ দেহ আছে ততক্ষণ অহিংসার পূর্ণতা ঘটা সম্ভব নয়, কারণ সকল কিছু বাদ দিলেও এ দেহের অস্তিত্বের জন্য (অন্যকে বঞ্চিত করিয়া) কিছু স্থান প্রয়োজন হইবেই। যতদিন এই মর্ত্যদেহ ধারণ করিয়া থাকিব ততদিন পূর্ণ অহিংসার সাধন কল্পনাতেই থাকিয়া যাইবে, যেমন ইউক্লিডের বিন্দু বা সরল রেখার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয় মাত্র। তবুও জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অনলসভাবে অহিংসা সাধনে প্রযত্ন করিতে হইবে।

[হরিজন, ২১-৭-৪০, ২১১]

৪৪৪। হিংসার বশে প্রাণ নষ্ট করিলে তবেই হিংসার কাজ করা হইল তাহা নহে, আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী মর-জীবন রক্ষার জন্য যে প্রাণ নষ্ট করি তাহাকেও অহিংসার কাজ বলিয়া গণ্য করা উচিত। আমাদের পানাহারের জন্য যেটুকু ধ্বংসকার্য করিতে বাধ্য হই তাহা করি স্বার্থের জন্য, সুতরাং তাহাও হিংসা। কিন্তু লোকে তাহা অনিবার্য জ্ঞানে সহ্য করিতে বাধ্য হয়।

কোন প্রাণীর ক্লিষ্ট দেহের দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিবার জন্য তাহাকে হত্যা করাকে হিংসা বলা যায় না। অথবা আশ্রিতকে রক্ষা করার জন্য যেটুকু ধ্বংসকার্য করিতে আশ্রয়দাতা বাধ্য হয় তাহাকেও হিংসা বলা চলে না।

১। অন্য দেহ কিছু পরিমাণে নষ্ট না করিলে নিজের দেহকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং

২। সকলকে বাধ্য হইয়া কিছু পরিমাণ ধ্বংসকার্য করিতেই হয়—

(ক) নিজের দেহ রক্ষা করিবার জন্য।

(খ) আশ্রিতজনকে রক্ষা করিবার জন্য।

(গ) কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন নষ্ট করিতে হয় জীবিতের মঙ্গলের জন্য।

৩। (ক) ও (খ)তে যে ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কম-বেশী হিংসা রহিয়াছে কিন্তু (গ)তে কোন হিংসামূলক অভিপ্রায় নাই—কাজেই ইহা হিংসাপদবাচ্য নয়। (ক) ও (খ)তে যে হিংসা ঘটে তাহা বর্জন করা সম্ভব নয়।

৪। যাহারা অহিংসার সাধনে অগ্রসর হইতে চাহেন তাহাদের (ক) ও (খ)তে উল্লিখিত হিংসাকার্য হইতে যতটা সম্ভব বিরত থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষ বিচারপূর্বক, চেষ্টা করিয়া যতটুকু না করিলেই নয়, সেইটুকুতেই হিংসা সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস করাই শ্রেয়।

অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহানি ঘটানো কর্তব্য বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেহ রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু প্রাণহানি আমরা তো ঘটাইয়াই থাকি। আহারের জন্য আমরা প্রাণহানি ঘটাইতে বাধ্য হই, তা সে শাকসব্জিরই হউক বা জীবিত প্রাণীরই হউক। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য আমরা মশা মাছি নষ্ট করি বা বিশোধক দ্রব্যের সাহায্যে রোগজীবাণু ধ্বংস করিয়া থাকি। মাঝেমাঝে মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য হিংস্র প্রাণীকে বধ করিতে বাধ্য হই। এই সকল ক্ষেত্রে আমরা অধর্মাচরণ করি বলিয়া মনে করি না। এমনও ঘটিতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নরহত্যা করিতেও বাধ্য হই। যদি এমন ঘটে যে কোন লোক জ্ঞানহারা হইয়া যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই আক্রমণ করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, কেহই তাহাকে জীবন্ত ধরিতে সাহস করে না, তখন যদি কেহ সেই উন্মাদকে নিহত করিয়া তাহার হত্যা-লীলার অবসান ঘটায় তাহা হইলে সমাজ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং সেই সাহসী ব্যক্তিকে উপকারী বলিয়া গণ্য করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-১১-২৬, ৩৮৫]

৪৪৭। পাপকার্য ও পাপীর মধ্যে যে পার্থক্য আছে সত্যাগ্রহী যেন সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকে। পাপীর প্রতি তাহার ঘৃণা বা তিক্ততা পোষণ করা উচিত নয়। দুষ্কৃতকারী যত নির্লজ্জ দুষ্কর্মই করুক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে অহেতুক দুর্বাক্য প্রয়োগ করাও সত্যাগ্রহীর ধর্ম নয়। সত্যাগ্রহী বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে এমন কোন পাপী থাকিতে পারে না যাহাকে প্রেমের শক্তিতে পাপের পথ হইতে ফেরানো না যায়। সত্যাগ্রহী সর্বদাই মন্দকে ভালোর জোরে, ক্রোধকে প্রেমের শক্তিতে, অসত্যকে সত্যের বলে, হিংসাকে অহিংসা প্রয়োগে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিবে। সংসারকে পাপমুক্ত করার অন্য পন্থা নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৮-২৯, ২৬৩]

বিদ্বেষবিহীনতা

৪৪৮। আমি মনে করি যে পৃথিবীতে কাহাকেও আমি ঘৃণা করিতে অপারগ। দীর্ঘকাল প্রার্থনা ও সদাচরণের দ্বারা মানুষের প্রতি ঘৃণার ভাব বর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি বুঝি যে এই কথা বলিয়া আমি নিজের গৌরব জাহির করিতেছি; তবুও আমি সবিনয়ে এইটুকু দাবী করিতে চাই।

কিন্তু যেখানে পাপ দেখিতে পাই, পাপকে ঘৃণা করিতে আমি পারি এবং করিয়াও থাকি। আজ ইংরাজ ভারতে যে কুশাসন চালাইতেছে, সেই পাপকে আমি ঘৃণা করি। ভারতের এই নিষ্ঠুর শোষণকার্যকে আমি ততখানি ঘৃণা করি যতখানি ঘৃণা করি ভয়াবহ অস্পৃশ্যতার পাপকে—যার জন্য লক্ষ লক্ষ হিন্দু দায়ী। কিন্তু আমি ক্ষমতাগর্বী ইংরাজকে ঘৃণা করিতে পারি না, বংশগৌরবে অন্ধ হিন্দুকেও ঘৃণা করি না। প্রেমের দ্বারা যত রকমে এই অন্যায়কারীদের সংশোধন সম্ভব তাহার জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি। আমার অসহযোগের গোড়ার কথা প্রেম, বিরোধ নয়। আমার নিজ অন্তরের ধর্মবোধের নির্দেশ—আমি যেন কাহাকেও ঘৃণা না করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৮-২৫, ২৭২]

৪৪৯। বিপক্ষ পক্ষকে প্রেমের দ্বারাই জয় করা সম্ভব। অপ্রেমের দ্বারা নয়। হিংসা মানুষের মনে অতি কুটিল ভাবে ঘৃণা-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অন্তরে কাহারও প্রতি লেশমাত্র ঘৃণার ভাব থাকিলে কেহই অহিংসার পথে চলিতে পারিবেন না

[হরিজন, ১৭-৮-৩৪, ২১২]

৪৫০। অপ্রিয় সত্য মুখে বলা বা লেখার মধ্যে কোন হিংসা নাই—বিশেষতঃ যখন বক্তা বা লেখক মনে বিশ্বাস করেন যে, তিনি মাত্র সত্য ঘোষণা করিতেছেন। হিংসার মূল প্রকৃতিই এরূপ যে হিংসার বশীভূত ভাবনা, বাক্য বা কার্যের মধ্যে ক্রূরতা থাকিবেই অর্থাৎ অন্য পক্ষের ক্ষতি করার বাসনা অন্তরে থাকিবেই।

পাছে কাহারও মনে আঘাত লাগে অথবা পাছে কিছু অশোভন বাক্য বলিয়া ফেলা হয়, এই ভয়ে অনেকে সরলভাবে মনের কথা প্রকাশ করিতে পারেন না, যার ফলে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যদি ব্যক্তিতে, সমাজে বা জাতিতে অহিংসার প্রকাশ ঘটাইতে কাহারও কামনা থাকে তাহা হইলে তিনি সত্যকে, সে সত্য তৎকালে যতই কঠোর যতই অপ্রিয় হোক না কেন, সেই সত্যকেই প্রকাশ করিবেন।

[হরিজন, ১৯-১২-৩৲, ৩৬২]

৪৫১। সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ম্ ব্রূয়াৎ
ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্

এই সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ আমি বুঝিয়াছি এইরূপ—

সত্যকে মধুর ভাষণে প্রকাশ করা উচিত। যদি উপযুক্ত মাধুর্য ও গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া সত্য প্রকাশ করিতে কেহ অক্ষম হয়, তাহার পক্ষে নীরব থাকাই শ্রেয়।

ইহাতে বলা হইতেছে, যাহার বাক্‌সংযম সাধন হয় নাই সে ব্যক্তির সত্যের সাধনও হয় নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৯-২৫, ৩১৮]

অহিংসার প্রকাশ—প্রেম ও ধীরতা

অহিংসার সাধনে প্রয়োজন বিপুলতম প্রেম ও মহত্তম দয়া। আমি যদি অহিংসার সাধনে দৃঢ়সংকল্প হই তাহা হইলে শত্রুকেও ভালোবাসিতে হইবে। আমার পিতা বা পুত্র যদি অন্যায় আচরণ করেন তাহা হইলে যে নীতিতে আমার চলা উচিত, অপরে যখন অন্যায় আচরণ করে, সে আমার শত্রু হউক বা অপরিচিত ব্যক্তি হউক, তখনও আমার সেই একই নীতিতে চলা উচিত। অহিংসার সাধনে সত্য ও নির্ভীকতার সাধনও অপরিহার্য। মানুষ যাহাকে ভালোবাসে তাহাকে বঞ্চনা করে না, ভালোবাসার পাত্রকে কেহ ভয় করে না, ভয় দেখায়ও না। জীবন দানই সকল দানের শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে পারে, কেহই তাহার শত্রুতা করিতে চাহে না। পূর্ণ মর্যাদার সহিত তিনি সমাজে চলিতে পারিবেন। যাহার নিজের মনে ভয় থাকে, সংকোচ থাকে, সে এরূপ পারিবে না। সুতরাং অহিংসার সাধনে ভয়কে জয় করিতেই হইবে। অন্তরে ভীরুতা থাকিতে কেহ অহিংসার সাধনে অগ্রসর হইতে পারে না। অহিংসার সম্যক্ সাধন করিতে হইলে চাই পূর্ণ সৎসাহস।

[স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অব মহাত্মা গান্ধী, নটেশন, ৩৪৬]

৪৫৮। অধর্মের বিরুদ্ধে বাস্তব ক্ষেত্রে সকল সংগ্রাম পরিহার করিলে অহিংসার সাধন হয় না। বরঞ্চ আমি যাহাকে অহিংসা বলিয়া বুঝি সেই অহিংসার সাধনে ব্রতী হইলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক বেশী সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। প্রচলিত বিরোধভাবনার সৃষ্টি হয় প্রতিশোধস্পৃহা হইতে। সে বিরোধে আরও বেশী অন্যায় সৃষ্টি হয় মাত্র। অহিংসার পথে সংগ্রাম করিতে হয় যত বেশী, মাত্র বিরোধভাবনা হইতে সংগ্রাম করিতে হয় তার চেয়ে অনেক কম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আমি মনে করি সকল প্রকার অধর্মাচরণের প্রতি মানসিক ও নৈতিক বিরুদ্ধতা। আমার লক্ষ্য, অন্যায়কারীর অন্তর হইতে অধর্মাচরণের সকল বাসনা সমূলে উৎপাটিত

করা। এর জন্য সু-শানিত অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। অন্যায়কারীকে শারীরিক বাধা দিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে চাহি না। বরঞ্চ কোনই বাধা না পাইয়া সে হতাশ হউক তাহাই আমি চাই। আত্মিক শক্তির যে বাধা আমি সৃষ্টি করিব, সে প্রথমতঃ তাহা বুঝিতেই পারিবে না, ক্রমে সে বাধার বিপুলতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে। তখন সে নিরস্ত হইলেও অপমানিত বোধ করিবে না, বরঞ্চ এই আত্মিক শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া সমুন্নত বোধ করিবে। এই সংগ্রামকেই পূর্ণ ধর্মযুদ্ধের স্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করা যায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১০-২৫, ৩৪৬]

অহিংসার সক্রিয় রূপ

৪৫৯। সক্রিয় অহিংসা বলিতে বুঝায় সচেতন দুঃখ সহন, অন্যায়কারীর ইচ্ছার নিকট দুর্বল আত্মসমর্পণ ইহা নয়; পরন্তু ইহা অত্যাচারীর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আত্মার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রতিরোধ। মানবীয় জীবনের এই নিয়ম মানিয়া চলিয়া স্বীয় সম্মান, ধর্ম ও আত্মার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এক অন্যায়কারী সাম্রাজ্যের গোটা শক্তির বিরুদ্ধেও বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব। এইভাবে সেই সাম্রাজ্যের পতন বা উত্থান ঘটানো যাইতে পারে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-২০, ৭১৩]

৪৬২। ইংরাজ জাতির ধর্মবুদ্ধি জাগাইয়া তোলার জন্যই কেবল আমাদের সংগ্রাম পরিচালিত হইতেছে না। স্বাধিকারের সাধনা করিবার পথে চলিবার কালে ইহাও ঘটিয়া যাইতেছে। আমরা যদি আমাদের অধিকার লাভের চেষ্টায় বিরত হই তাহা হইলে ইংরাজের ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করার সম্ভাবনাও লোপ পাইবে। এই যুদ্ধ কেবল যে শান্তির পথেই ঘটিবে এরূপ মনে করা ভুল হইবে। অন্যায়ের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিলে অন্যায়কারী ক্রুদ্ধ হইলেও সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। তাহার ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইলে ইহার প্রয়োজন। হিংসার যুদ্ধে যে অন্যায়ের সৃষ্টি ঘটে আবার তাহার শোধনের প্রয়োজন হয়। অহিংসার সংগ্রামে ইহার প্রয়োজন হয় না তাই অহিংস সংগ্রামকে আমি অ-শোধক প্রক্রিয়া বলিয়া থাকি। উভয় প্রক্রিয়াই অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাই উভয় ক্ষেত্রেই সংঘর্ষ অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। অহিংসার পথে অন্যায়কারীর কোন ক্ষতি করার চেষ্টা থাকে না।

[হরিজন, ৩০-৩-৪০, ৭২]

অহিংসা বীরের ধর্ম

৪৬৩। যেখানে আঘাত করার শক্তি থাকে সেখানেই অহিংসার প্রয়োগ সম্ভব। (কেহ ইচ্ছাপূর্বক ক্ষতি করিলে) আমাদের মনে স্বভাবতঃই যে হিংসা জাগিয়া ওঠে, অহিংসার দ্বারা স্বেচ্ছায় তাহাকে দমন করা হয়। নিজেকে দুর্বল মনে করিয়া অসহায়ভাবে আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষা হিংসার বশে সংগ্রাম করা সকল রকমে অধিকতর কাম্য। ক্ষমা করিতে পারা তাহার চেয়েও উন্নততর। হিংসা বৃত্তিকে মানুষের চরিত্রের একটি দুর্বলতা বলা যায়। বাস্তব বা কাল্পনিক ভয় হইতেই হিংসার উদ্ভব। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করে না, কেহ তাহার ক্ষতি করিতে উদ্যত হইলেও ক্ষতিকারকের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হওয়াকে সে বিরক্তিকর মনে করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৮-২৬, ২৮৫]

৪৬৪। অহিংসাতেই ক্ষমাধর্মের চরম গতি। ক্ষমা বীরের ধর্ম— নির্ভীকতা ছাড়া অহিংসার সাধন হইতে পারে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-১১-৩৬, ৩৮৪]

৪৬৭। আত্মরক্ষার জন্য অপরকে হত্যা করার শক্তি থাকিতেই হইবে এ যুক্তি ঠিক নয়। তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রাণ দিবার

শক্তি থাকা। যখন কেহ (ন্যায়ের জন্য) প্রাণ বিসর্জন করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় তখন কোনরকম হিংসার কাজেই তাহার উৎসাহ থাকে না। প্রাণ দিবার প্রস্তুতি যত বেশী প্রবল হয় প্রাণ নেওয়ার বাসনা সেই পরিমাণে কমিয়া যায়—এ তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ইতিহাসে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, যেখানে মানুষকে ভালোবাসিয়া যারা প্রাণ দিয়াছে তাহাদের মৃত্যু বহু কঠোর বিপক্ষকে হার মানাইয়া তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১-৩০, ২৭]

অহিংসার প্রকারভেদ—আসল ও নকল

৪৬৯। কোন উদ্দেশ্য সাধনে অহিংসাকে প্রয়োগ করিতে হইলে অহিংসাকে নিজ অন্তরে স্থান দিতে হইবে। সর্বান্তঃকরণে অহিংসাকে গ্রহণ করিতে না পারিলে দৈহিক বা বাহ্য অহিংসায় কোন শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় অহিংসা যে রূপ গ্রহণ করে তাহা হয় দুর্বল ও ভীরুর অহিংসা। এই কারণে সে অহিংসার কোন ক্ষমতাই থাকে না। যদি আমাদের অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বজায় রহিয়া যায় অথচ অন্যায়কে (অন্যায় বলিয়া) বাধা না দিয়া অহিংসার অভিনয় করি মাত্র, তাহা হইলে আমাদের অন্তরের মিথ্যা আমাদেরই ধ্বংস করিবে। যদি আমরা বিপক্ষকে ভালোবাসিতে সক্ষম নাও হই, অন্ততঃ তাহার প্রতি বিদ্বেষ পরিহার করিতেই হইবে, নচেৎ কেবল বাহিরে অহিংসার অভিনয় করিলে আমাদেরই ক্ষতি হইবে।

ভীরুতা অপেক্ষা হিংসা ভাল

৪৭২। যখন ভীরুতা অথবা হিংস্র সংগ্রামের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তখন আমি আমার বিশ্বাসমত সংগ্রামকেই গ্রহণ করিতে বলিব। ভীরুতার বশে চোখের সম্মুখে

ভারতের মর্যাদাহানি হইতে দেখার চেয়ে ভারতবাসী সশস্ত্র সংগ্রাম করিয়া দেশের মর্যাদা রক্ষা করুক ইহাই কামনা করিব।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি অহিংসা হিংসার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, শাস্তিবিধানের চেয়ে ক্ষমা মহত্তর। ক্ষমা বীরের ভূষণ। ক্ষমা কেবল তখনই মহৎ যখন আঘাত করার শক্তি থাকিতেও কেহ ক্ষমা করিতে পারে। যখন অক্ষমতা বশতঃ কেহ ক্ষমা করিতে বাধ্য হয় তখন ক্ষমার কোন মাহাত্ম্য থাকে না। ভারতকে অক্ষম বলিয়া আমি মনে করি না, নিজেকে নিঃসহায় জ্ঞান করিতে আমি পারি না। দৈহিক শক্তি ক্ষমতার উৎস নয়। অন্তরে যদি অদম্য আগ্রহ থাকে, অপরিমেয় শক্তি তাহা হইতেই উদ্ভূত হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-২০, ৭১১]

৪৭৩। বেতিয়া শহরের নিকটস্থ এক গ্রামের লোকেরা আমাকে বলিল যে, পুলিসের ভয়ে মরদেরা যখন গ্রাম ছাড়িয়া দূরে পলাইয়া গিয়াছিল সেই সুযোগে পুলিস তাহাদের ঘরবাড়ী লুঠ করিয়া তাহাদের স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যখন তাহারা আরও বলিল যে, যেহেতু তিনি (গান্ধীজী) তাহাদের অহিংস থাকিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন সেইজন্য তাহারা পুলিশের সহিত বিবাদ এড়াইয়া দূরে পলাইয়া গিয়াছিল, তখন লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইল। আমি তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, পলাইয়া যাওয়াকে অহিংসা বলা উচিত নয়। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, তাহাদের পরিবারবর্গকে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য অহিংসার শক্তিতে বলীয়ান হইয়া, তাহারা পলায়ন না করিয়া ভীষণতম শত্রুরও সম্মুখীন হইয়া সকল আঘাত নিজে গ্রহণ করিতে সাহসী হইবে, এমনকি মৃত্যুবরণ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। পরিজন ও ধনসম্পত্তি, আত্মসম্মান ও ধর্ম রক্ষার জন্য অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করাকে বীরত্ব বলা যায়। যদি সে যুদ্ধে আক্রমণকারীর ক্ষতিসাধন করিব না এরূপ ব্রত গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে আরও সঠিক বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু নিজের

পরিজন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করার ধর্ম পালন না করিয়া তুচ্ছ প্রাণ রক্ষার জন্য যদি কেহ স্বজন ও সম্পত্তি অত্যাচারীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া সংগ্রামস্থান হইতে পলায়ন করে, তাহাতে মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় না বরং তাহা অস্বাভাবিক ও অধর্মাচরণ বলিয়া গণ্য হয়। যাহারা মরণের ভয়ে ভীত নয় তাহাদের আমি অহিংসা বুঝাইতে পারি, প্রাণের ভয়ে যাহারা কর্তব্য ত্যাগ করিয়া পলাইতে পারে তাহাদের দিয়া অহিংসা পালন করানো সম্ভব নয়।

[ভারতের গ্রামে গান্ধীজী—মহাদেব দেশাই, ২৫৪]

অহিংসার দ্বারাই দ্রুত সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব

৪৮৭। আত্মশুদ্ধি এমন একটি আধ্যাত্মিক অস্ত্র, যাহার শক্তি সহজে বুঝা না গেলেও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন ঘটাইয়া পুরাতনের শৃঙ্খল ছেদন করিতে এমন অস্ত্র আর নাই। দৃষ্টির অতীত থাকিয়া এ সূক্ষ্ম-শক্তি কাজ করিতে থাকে; যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দীর্ঘকাল কাজ করিলে তবে এ শক্তি ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু এ শক্তির ক্রিয়া অতি তীব্র, অতি অপ্রতিরোধ্য এবং সর্বাপেক্ষা কম সময়ে ইহা আকাঙ্ক্ষিত ফল ঘটাইতে পারে কারণ ইহার গতি একান্ত ঋজু এবং এই শক্তির সাধনে মানুষের সকল ক্ষমতা একাগ্র হইয়া কাজ করে। এই অস্ত্র ব্যবহারে চাই সত্যনিষ্ঠা—যে নিষ্ঠা সকল প্রলোভন, সকল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও পর্বতের ন্যায় অটলভাবে মাথা তুলিয়া থাকে।

৪৮৮। অহিংসার সংগ্রাম দীর্ঘকাল ধরিয়া চালাইলে তবে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় এ ভ্রান্ত ধারণায় হতাশ হইবার কোন কারণ নাই কারণ সাফল্যের সার্থকতা লাভের জন্য এর চেয়ে সুনিশ্চিত পন্থা আর নাই, তাই ইহাকে সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথ বলিলে ভুল হইবে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৪-২৫, ১৫৩]

অহিংসাই মহত্তম পন্থা

৪৯০। আমার স্বদেশবাসীর দুঃখ দূর করা অপেক্ষা মানুষকে পশুবৎ আচরণে বাধ্য করার পথ বন্ধ করাকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় জ্ঞান করি। যাঁরা কর্তব্যজ্ঞানে মানুষের কল্যাণে দুঃখ বরণ করেন তাঁরা শুধু নিজেকে নয়, সমগ্র মনুষ্যসমাজকে উন্নত করেন। আবার ইহাও সত্য যে, যে সকল মানুষ বিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য পশুবৎ আচরণ করেন অথবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিকে বা ব্যক্তিদের শোষণ করেন তাঁরা শুধু নিজেদের নয় সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হীন করেন। মানুষের এই অবমাননা দেখিলে আমার কেন, কাহারও ভালো লাগিতে পারে না। যদি আমরা সকল মানুষ একই ঈশ্বরের সৃষ্টি হই এবং সকলেই সেই একই ঐশ্বরিক শক্তির ধারক বাহক হই তাহা হইলে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পাপের অংশভাগী হইতে বাধ্য, সে পাপী নিজের দেশেরই হউক বা অপর কোন দেশের হউক। কোন মানুষ পশুর মত আচরণ করিলে তাহা কতদূর কষ্টকর হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। যে ইংরাজের দলে আমার বহু প্রিয় বন্ধু আছেন তাহাদের কেহ কদাচার করিলে কি পরিমাণ দুঃখের হইবে তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। আজ যে প্রচেষ্টায় আমি নিযুক্ত হইয়াছি আপনারা সকলে যে যেমন পারেন আমাকে সাহায্য করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-১০-৩১, ৩২৫,]

৪৯১। একজন যখন অপরের ক্ষতি সাধন করে—তখনই হিংসা করা বলে। সেই ক্ষতি স্বয়ং স্বেচ্ছায় গ্রহণ করাই অহিংসার ধর্ম এবং ইহাই হিংসা নিবারণ করিয়া অহিংসার প্রতিষ্ঠা করার শ্রেষ্ঠ পন্থা। আমি যে হাজার হাজার লোককে সত্যাগ্রহ পালন করিয়া মৃত্যুবরণ করিবার জন্য সানন্দে আহ্বান করি তাহার কারণ ইহা নয় যে জীবনের মূল্য আমার কাছে কিছু কম বরঞ্চ আমি জানি যে, এই

পথে সর্বাপেক্ষা কম নরহত্যা সংঘটিত হয় এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে, যাহারা সত্যাগ্রহে প্রাণ দেয় তাহারা ধন্য হয় এবং তাহাদের দুঃখ বরণের ফলে মানব সমাজ সমুন্নত হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১০-২৫, ৩৪৫]

নারীধর্ষণ

৪৯৫। স্ত্রীলোকের সর্বপ্রথম শিক্ষা করা উচিত নির্ভয়তা। নির্ভীক নারী জানে যে তাহার সতীত্বই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে—কেহই তাহার সতীত্বের অবমাননা করিতে পারিবে না। আক্রমণকারী যত পশুবৎ পুরুষই হউক না কেন নির্ভীক স্ত্রীলোকের সম্মুখে লজ্জায় মাথা নত না করিয়া পারিবে না। আধুনিক যুগেও এরূপ ঘটনা বিরল নয় যেখানে সতীত্বের শক্তিতে স্ত্রীলোক আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এরূপ দুইটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভারতের নারীদের আমি অনুরোধ করি যেন আমার এই লেখা পড়িয়া তাঁরা নির্ভীকতা অর্জনে প্রয়াসী হন। আজ যেমন অনেক স্ত্রীলোক আক্রমণকারীর কথা কল্পনা করিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকেন, তাঁহাদের অনুসরণ না করিয়া যদি তাঁরা চেষ্টা করেন, সকল ভয়কে তাঁরা জয় করিতে পারিবেন। সাহসের পরীক্ষা দিবার চেষ্টায় অপ্রিয় ঘটনার মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের সৌভাগ্য যে, এইরূপ দুর্ঘটনা সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ মহিলার জীবনে ঘটে না। প্রতিটি সৈন্যই পশুর মত আচরণ করে না। অতি অল্পসংখ্যক লোকই কেবল লজ্জার সকল গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যায়। সকল সর্পের মধ্যে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বিষধর, তার মধ্যে কেবল কয়েকটি মাত্র দংশন করে; তাও গায়ে পা না পড়িলে সাপে দংশন করে না। যাহারা সর্পভয়ে একান্ত ভীত—সাপের নাম শুনিলেই কাঁপিতে থাকে, সাপের চরিত্র সম্বন্ধে উপরিউক্ত তথ্যগুলি জানিলেও তাহাদের ভয় কমে না। তাই পিতামাতা বা স্বামীকে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে

মহিলাদের এই ভয়প্রবণতা ঘুচিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে পারে। নির্ভীকতা অর্জনের সবচেয়ে সহজ উপায় ঈশ্বরে প্রাণবন্ত বিশ্বাস স্থাপন করা। ঈশ্বরকে চোখে দেখা না গেলেও তিনিই সকল বিপদে বিপদ্‌বারণ। যাঁর মনে এ বিশ্বাস থাকে তিনিই পূর্ণ নির্ভীকতা অর্জন করিতে পারেন।

কিন্তু ঈশ্বরে এতখানি বিশ্বাস বা এতখানি সাহস অর্জন করা সম্ভব নয়। এই কারণে বর্তমানের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অন্য উপায় নির্ধারণ করা উচিত। যখন কোন স্ত্রীলোক হঠাৎ আক্রান্ত হন তখন হিংসা বা অহিংসা কোন পথের কথাই বিশেষ করিয়া ভাবা সম্ভব নয়, তখন একমাত্র ভাবনা কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়। এমন অবস্থায় আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যে উপায় কার্যকরী হইতে পারে তাহাই গ্রাহ্য। ভগবান আমাদের দাঁত ও নখ দিয়াছেন, আক্রান্ত হইলে যথাশক্তি সকল অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করা উচিত; সেই প্রয়াসে প্রাণও যদি যায়, তাহাও শ্রেয়ঃ। যে স্ত্রী বা পুরুষ সকল ভয় বর্জন করিয়া সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁরা শুধু নিজেকে নয় অপরকেও নিজের প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। সকল ভয়ের মূলে থাকে আমাদের মৃত্যুভয়। মৃত্যুর ভয়েই আমরা বলবত্তর শক্তির কাছে নতি স্বীকার করিয়া থাকি, সেই ভয়ে আমরা আক্রমণকারীর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকি। কেহ বা ঘুষ দিয়া বলবানকে তুষ্ট করে, কেহ ভূমিশায়িত হইয়া বা অপর কোন দীনভাব অবলম্বন করিয়া বলবানের কৃপা প্রার্থনা করে, কোন কোন স্ত্রীলোক প্রাণরক্ষার জন্য দেহদান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কাহারও দোষ প্রদর্শনের জন্য ইহা লিখিতেছি না, যা সচরাচর ঘটিয়া থাকে তাহাই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ইহা লিখিতেছি। আমরা ভূমিশায়িত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করি অথবা কোন স্ত্রীলোক পুরুষের কামনার আগুনের ইন্ধনরূপে আত্মসমর্পণ করে, এ সবই প্রাণরক্ষার চেষ্টায় যে যে-কোন হীনতা অবলম্বন করা সম্ভব তাহারই দৃষ্টান্ত মাত্র। এই সকল বাস্তব

ঘটনা হইতে এই সত্য প্রমাণ হয় যে, যারা জীবনের মমতা ত্যাগ করিতে পারে তাদের পক্ষেই যথার্থভাবে বাঁচা সম্ভব। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই মহাবাক্য এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছে। শুধু মুখে এই বাক্য উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, এই বাক্যের তাৎপর্য অন্তরের গভীরতম প্রদেশে পৌঁছানো চাই। জীবনকে যথার্থ ভোগ করিতে হইলে জীবনের মোহ ত্যাগ করিতে হইবে, এই ধর্মই আমাদের সাধনের বিষয় হওয়া উচিত।

স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু যে পুরুষ এইরূপ কদাচার চোখের সামনে দেখেন তাঁর কর্তব্য কি? ইহারও উত্তর পূর্বের উক্তির মধ্যে রহিয়াছে। তিনি নিরপেক্ষ দর্শক নহেন, আক্রান্ত স্ত্রীলোককে রক্ষা করা তাঁহার কর্তব্য। পুলিসের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া যাওয়াতেই তাঁর কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না বা (ট্রেনে হইলে) বিপদ-সংকেতের শিকল টানিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। যদি তিনি অহিংসাপালনে অভ্যস্ত থাকেন তাহা হইলে বিপন্ন স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি নিজের প্রাণ দিতেও কাতর হইবেন না। যদি তিনি অহিংসা পালনে অভ্যস্ত না হন অথবা যদি অহিংসায় তাঁর বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে সর্বশক্তি প্রয়োগে তিনি বিপন্নকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন। যে ভাবেই হউক না কেন জীবন পণ করিয়া তাঁহাকে বাধা দিতে হইবেই।

[হরিজন, ১-৩-৪২, ৬০]

দাঙ্গার সময়ে অহিংসার প্রয়োগ

৪৯৭। অহিংসার প্রয়োগে দাঙ্গা শান্ত করিতে হইলে অন্তরে এমনই অহিংসা পোষণ করা চাই যাহার শক্তিতে পথভ্রান্ত দাঙ্গাকারীদেরও সস্নেহে আলিঙ্গন করা যায়। এই মনোভাব চেষ্টা করিয়া সৃষ্টি করা যায় না। শান্তির কালে, দীর্ঘকাল ধৈর্য সহকারে

চেষ্টা করিলে এই মনোভাই অর্জন করা সম্ভব। যাঁহারা দাঙ্গাকালে শান্তির কাজ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের উচিত আশেপাশের গুণ্ডাশ্রেণীর বলিয়া পরিচিত লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা এবং নিজ আচরণ ও চরিত্রের প্রভাবে তাহাদের হৃদয় জয় করা। যতই অখ্যাতি থাকুক না কেন কাহাকেও হীন বা জঘন্য মনে করিয়া বর্জন করা চলিবে না। গুণ্ডারা সহসা আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়ে না বা অপদেবতার মত পাতাল ফুঁড়িয়া সংসারে উদয় হয় না। সমাজের অব্যবস্থার জন্যই গুণ্ডার সৃষ্টি হয়; কাজেই তাহাদের অস্তিত্বের জন্য সমাজই দায়ী। এই কারণে গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকদের সমাজদেহের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ রূপেই গণ্য করিতে হইবে। ব্যাধির নিরাকরণের জন্য সর্বপ্রথমে উহার অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। রোগের নিদান বুঝিতে পারিলে ব্যাধি দূর করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

[হরিজন, ১৫-৯-৪০, ২৮৫]

অহিংসার শক্তিতে বহিরাক্রমণ নিবারণ করা যায় কি?

৪৯৮। প্রশ্ন—কোন দেশকে অপর দেশ আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে নিরপেক্ষ, নিরস্ত্র দেশের পক্ষে তাহা নিশ্চলভাবে দেখা কি সম্ভব? বিগত যুদ্ধকালে আমাদের দেশের সীমান্তে সশস্ত্র সৈন্যদল পাহারায় না থাকিলে আমাদের দেশ ধ্বংস হইয়া যাইত।

উত্তর—আমাকে লোকে কল্পনাবিলাসী বা মূর্খ যাহাই বলুক না কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে আমার একটিমাত্র যুক্তিই রহিয়াছে। পরদেশী সৈন্যদল প্রতিবেশী রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া সে দেশ ধ্বংস করিতে থাকিলে নীরব দর্শক সাজিয়া বসিয়া থাকা যে আমাদের পক্ষে কাপুরুষতারই পরিচায়ক ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কি সশস্ত্র সৈন্যদল কি নিরস্ত্র শান্তিসেনা, উভয়েরই কাজের পদ্ধতি দুইটি বিষয়ে সম্পূর্ণ এক। আমি যদি সুইট্‌সারল্যাণ্ডের নাগরিক হইয়া সেখানকার

সংযুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইতাম তাহা হইলে আক্রমণকারী সৈন্যদলকে আমার দেশের উপর দিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে দিতাম না এবং তাহাদের কোন সহায়তা করিতে অস্বীকার করিতাম। সুইট্সারল্যাণ্ডে আবার একবার থারমোপাইলির যুদ্ধের অনুকরণে যুযুধান সৈন্যদের পথে আমার দেশের স্ত্রী-পুরুষ-বালকবালিকাকে দাঁড় করাইয়া বলিতাম—আমাদের হত্যা না করিয়া তোমরা অগ্রসর হইতে পারিবে না। অনেকে হয়তো বলিবেন যে এরূপ কাজ মানুষের সহ্যশক্তি ও বুদ্ধির অনেক উর্ধ্বে। তাহার উত্তরে আমি বলি, এরূপ কাজ মানুষের পক্ষে করা সম্পূর্ণ সম্ভব। গত বৎসর গুজরাতে স্ত্রীলোকের দল নিষ্কম্প হৃদয়ে লাঠিচালনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, পেশওয়ারে হাজার হাজার লোক হিংসার পথ ত্যাগ করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির আঘাতের সম্মুখে অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়াছে। পরদেশী সৈন্যদলের অগ্রগামী গতি রোধ করিয়া যে সকল নরনারী দাঁড়াইবে তাহাদের চিত্র কল্পনা করা যাক। হয়তো কেহ বলিবেন, যোদ্ধসৈন্যদল বাধাদানকারী স্ত্রীপুরুষকে পদদলিত করিয়া হিংস্র জন্তুর ন্যায় অগ্রসর হইতে থাকিবে; তবুও আমি বলিব আত্মদান করিয়া সকল নরনারী এইরূপে মানুষের ধর্ম পালন করুক। সৈন্যদল একবার এরূপ পশুবৎ কার্য করিবে—দ্বিতীয় বার এই কাজ করিবার সাহস তাদের থাকিবে না। পৃথিবীতে কোন দলের এতখানি সাহস হইতে পারে বলিয়া হয়তো অনেকে স্বীকার করিবেন না। ইহাতে পরোক্ষে এ কথাই স্বীকার করা হয় যে, অহিংস সংগ্রাম করিতে সশস্ত্র যুদ্ধের অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন হয়। অহিংসাকে কোনদিনই দুর্বলের অবলম্বন বলিয়া আমি মনে করি না। যাহারা সবচেয়ে বেশী বীর তাহারাই অহিংসা পালনে সক্ষম।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১২-৩১, ৪২৭]

৫০০। অদ্যকার (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে) ইউরোপের কথাই

ধরা যাক। আজ যদি চেক, পোল, নরওয়েবাসী, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি সকলে হিটলারকে বলে—"মানুষ মারিবার জন্য বিরাট্ বৈজ্ঞানিক আয়োজন রচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার ধ্বংস-শক্তির বিরুদ্ধে আমরা কেবল অহিংসার প্রয়োগে বদ্ধপরিকর সুতরাং আমাদের অহিংস সৈন্যদলকে তুমি ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজ বা আকাশযানের প্রয়োগ ছাড়াই ধ্বংস করিতে পারিবে।"

এ যুক্তির প্রতিবাদে অনেকে হয়তো বলিবেন যে, ইহাতে হিটলারের সুবিধাই হইবে—বহু শক্তি ও সৈন্য ক্ষয় করিয়া হিটলার যাহা দখল করিয়াছেন, বিনা যুদ্ধে অতি সহজেই তাহা দখল করিতে পারিবেন। এ কথা মানিয়া লইলাম। কিন্তু এরূপ ঘটিলে ইউরোপের ইতিহাস অন্যরকম হইত। আজ যে অবর্ণনীয় দুঃখ সৃষ্টি করিয়া হিটলার ইউরোপ দখল করিয়াছেন, অহিংস প্রতিরোধ অতিক্রম করিয়া সম্ভবতঃ (ইহাকে সম্ভাবনা মাত্রই মনে করিতেছি) সেই পরিমাণই দখল করিতে পারিতেন। প্রতিরোধ অহিংস হওয়ায় কেবল তাহাদেরই প্রাণ যাইত যাহারা কাহারও প্রাণহানি না করিয়া বা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া কেবল প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হইত। আমি এ কথাও বলিতে পারি যে, এরূপ ঘটিলে ইউরোপের নৈতিক চরিত্রের বহু উন্নতি ঘটিত। সকল কিছু বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই প্রমাণ হয় যে, নৈতিক মূল্যই মানুষের চরম সম্বল, অন্য সব কিছুই সে তুলনায় তুচ্ছ।

[হরিজন, ২২-৬-৪০, ১৭২]

দ্বাদশ পর্ব

বিশ্বযুদ্ধের কালে আমাদের করণীয় কি ?

৫০১। (আফ্রিকায় থাকা কালীন) জুলু বিদ্রোহ ঘটিলে এবং বুয়র যুদ্ধে আমি ত্রাণকার্যে যোগ দিয়াছিলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটিলে ভারতে সৈন্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হইয়াছিলাম এবং ১৯১৪ সালে লণ্ডনে সেবকদল গঠন করিয়াছি। যদি এই কার্যে কোন পাপ থাকে তবে আমি পুরামাত্রায় সে পাপের ভাগী হইয়াছি। যখনই প্রয়োজন ঘটিয়াছে আমি সরকারের সাহায্যার্থে কাজ করিয়াছি। এই সকল সংকট সময়ে দুইটি প্রশ্ন আমার মনে জাগিয়াছে। তৎকালে আমি নিজেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের একজন প্রজা বলিয়া জ্ঞান করিতাম—সেই হিসাবে আমার কর্তব্য কি ? দ্বিতীয়তঃ, অহিংসা ধর্মে আমার একান্ত বিশ্বাস বজায় রাখিয়া ঐ সকল সংকট সময়ে আমার কি করা কর্তব্য ছিল ?

এখন আমি বুঝিতে পারি যে, নিজেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিক মনে করিয়া আমি ভুল করিয়াছিলাম। যে চারিবার আমি সরকারের সহযোগিতা করিয়াছি তখন আমি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়াছি যে, যদিও আমাদের দেশের জনসাধারণের বহু দুঃখদুর্দশা বর্তমান রহিয়াছে তবুও আমাদের দেশ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে; জনমত এই ছিল যে, ভারতের শাসনযন্ত্র যে সম্পূর্ণ মন্দ তাহা নয় এবং ইংরাজ শাসকবর্গ কিছুটা সংকীর্ণমনা ও নির্বোধ হইলেও তাহারা ছিল সত্যাশ্রয়ী। এই ধারণা মনে রাখিয়া একজন ইংরাজ এই অবস্থায় যাহা করিতেন আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তখন আমার এমন বিচারবুদ্ধি বা প্রতিপত্তি ছিল না যে আমি নিজস্ব কোন পথের নির্দেশ দিতে পারি। বিশেষ, বিচারসভার গাম্ভীর্য লইয়া তৎকালীন মন্ত্রীদের কার্যকলাপের বিচার করার কোন সুযোগ তখন পাওয়া যায় নাই। কি বুয়র যুদ্ধে, কি জুলু যুদ্ধে, কি প্রথম বিশ্ব

মহাযুদ্ধে সরকারের মনে কোন বিদ্বেষভাব ছিল বলিয়া মনে হয় নাই। কি তখন কি আজও আমি মনে করি না যে, ইংরাজ অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে বেশী মন্দ। তখন আমি মনে করিতাম এবং এখনও তাহাই করি যে, ইংরাজেরা অন্য যে কোন জাতির লোকের মত উচ্চ আদর্শ পোষণ করিতে পারে এবং সৎকাজও করিয়া থাকে, আবার অন্যের ন্যায় ভুল করাও তাদের পক্ষে সম্ভব। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আমি মানুষ হিসাবে ও নাগরিক হিসাবে, সাম্রাজ্যের বিপদের দিনে দেশে বা বিদেশে নিজেকে সাধ্যমত নিয়োজিত করিয়াছি। আমাদের স্বরাজ আসিলে প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই আচরণই করিতে বলিব। জাতীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে সুযোগ পাওয়া মাত্র যদি প্রত্যেকটি লোক স্ব স্ব প্রধান হইয়া স্বর্ণতুলাদণ্ডে জাতীয় সরকারের প্রত্যেকটি কাজের চুলচেরা বিচার করিতে বসেন তাহা হইলে দেশে দুর্দিন উপস্থিত হইবে। প্রতিনিধি নির্বাচনে বিশেষ প্রযত্ন করার পর জাতীয় প্রতিনিধিদের হাতে আমাদের ভালো-মন্দের বিচার ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত মনে করি। গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার এ ছাড়া অন্য পথ নাই। এই যুক্তি না মানিলে কোন গণতন্ত্রই একদিনও চলিতে পারে না।

আমার পূর্বেকার ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস আমার ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক শিখাইয়াছে। এখন আমি বুঝিয়াছি ভারতের শাসনব্যবস্থার সবটাই মন্দ, ইহার সংশোধন বা সংস্কার করিতে হইলে সমগ্র জাতিকে সচেষ্ট হইতে হইবে। এই সরকারের এমন শক্তি নাই যে নিজেকে ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া চরিত্র বদলাইয়া ফেলিতে পারে। আজও আমি বিশ্বাস করি আমাদের ইংরাজ শাসকদলের মধ্যে বহু সৎ লোক আছেন, কিন্তু তাহাতেও কোন সুবিধা হইবার আশা নাই, কারণ আমার যেরূপ অন্ধ ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাঁহাদেরও সেইরূপ থাকিতে পারে। সেই কারণে আমি নিজেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিক

বলিয়া মনে করিয়া আর কোন গৌরব বোধ করি না। বরঞ্চ আমি বুঝিয়াছি যে, আমি সাম্রাজ্যের মধ্যে একজন "পারিয়া" বা সমাজ-বহির্ভূত পরিত্যক্ত লোক মাত্র। তাই আমি স্থির করিয়াছি, হয় এ সাম্রাজ্যের পরিবর্তন নয় বিনষ্টিই আমার একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যেকটি "পারিয়া"র অনুরূপ মনোভাব জন্মাইলে কিছু অন্যায় হয় না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অহিংসার ব্যাপারটি এর চেয়ে অনেক বেশী জটিল। আমার অহিংসার বোধ কেবলই আমাকে আমি যে সকল কাজে লিপ্ত আছি সে সকল ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে বলিতেছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত একটিও অন্যায় কিংবা একটিও দুঃখের ঘটনার নিঃসহায় দর্শক মাত্র হইয়া থাকিব ততক্ষণ আমার অন্তর শান্তি পাইবে না। আমার মত দুর্বলের এমন সাধ্য নাই যে প্রতিটি অন্যায় প্রতিটি দুঃখ নিরাকরণ করিতে পারি। মন যাহা চায় প্রাণ তত দূর যাইতে চায় না। এই দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি পাইতে হইলে ধীরে ধীরে কঠোর প্রয়াস করিয়া যাইতে হইবে। কোন কাজই না করিয়া এই দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। নির্লিপ্তভাবে বিচারপূর্বক কর্মপন্থা নির্ণয় করিলে তবেই এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো যায়। এই দ্বন্দ্বে জাগতিক সকল সুখ ও আরাম ত্যাগ করিয়া আত্মিক শক্তিকে অব্যাহতভাবে চলিতে দিলে তবেই মুক্তি সম্ভব।

আর পাঁচজনের মত আমিও একজন দেশের সেবকমাত্র। আমি অহিংসায় বিশ্বাসী কিন্তু অপরে অহিংসাকে আদৌ মানে না। গভর্ন-মেণ্টের আচরণে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, সকল সহযোগিতা ত্যাগ করিয়া, সরকারের প্রতি তাহারা তাহাদের কর্তব্য পালন করিতেছে না। না করার কারণ তাহাদের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা। আমি তাহাদেরই সহকর্মী সুতরাং তাহাদের সুপথে লইয়া আসা আমার কর্তব্য। তাই আমি বলিবার চেষ্টা করিয়াছি আমাদের করণীয় কি—তাহাদের সম্মুখে অহিংসানীতির যুক্তি উপস্থিত করিয়াছি। আমার সহকর্মীরা বিচার-

পূর্বক নিজেদের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। অহিংসার প্রচার করার জন্য আমার কোন দুঃখ নাই। স্বরাজ পাওয়ার পরও যদি কেহ দেশের জন্য অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে চায়, তাহাদের অহিংসার পথ দেখাইতে আমি দ্বিধা করিব না।

* * *

এখানে আমার দ্বিতীয় সমস্যার বিচার হওয়া দরকার। আমার ধ্যানের স্বরাজে অস্ত্রের কোন প্রয়োজন হইতে পারে না। কিন্তু বর্তমান প্রচেষ্টার ফলে যে সেই ধরনের পূর্ণ স্বরাজ আসিবে তাহা আমি আশা করি না। কারণ আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টার সদ্য লক্ষ্য তাহা নয়, তদুপরি সেই লক্ষ্যের দিকে প্রয়াস করিতে হইলে যে আচরণ গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহার বিস্তারিত ব্যবস্থা জাতির সামনে উপস্থিত করার মত শক্তি আমি অর্জন করিতে পারি নাই। আজও বহু দুর্বলতা বহু কামনা আমাকে পীড়া দিতেছে যার জন্য সেই প্রেরণা সেই শক্তি আমি অর্জন করিতে পারিতেছি না। আমি শুধু এইটুকু দাবী করিতে পারি যে সর্বদাই আমি দুর্বলতা জয় করার চেষ্টায় রত আছি। ইন্দ্রিয় দমন করার মত শক্তি বহুপরিমাণে অর্জন করিতে পারিলেও পাপ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া ওঠে নাই, এখনও ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষই সেই নিষ্পাপ-নির্দ্বন্দ্ব অবর্ণনীয় অবস্থায় পৌঁছাইতে পারে যে অবস্থায় সকল অনুভূতি ঈশ্বর-সান্নিধ্যের অনুভূতিতে ডুবিয়া গিয়া তাহাকে ধন্য করিয়া দিতে পারে। স্বীকার করিতে কুণ্ঠা নাই যে সে অবস্থা আসিতে এখনো অনেক বাকী। এই কারণে আজ জাতিকে পূর্ণ অহিংসার পথের সন্ধান দিয়া সেই পথে পরিচালিত করা সম্ভব হইতেছে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-১১-২১, ৩৬৭]

৫০২। প্রশ্ন—যখন আপনি যুদ্ধে সেবাকার্য করিয়াছেন এবং

ভারতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন তখন কি আপনি যুদ্ধ ব্যাপারে সাহায্য করেন নাই? আপনার অহিংসা ধর্মের সহিত এ কাজের সামঞ্জস্য কোথায়?

উত্তর—যখন আফ্রিকা ও ইংলণ্ডে ত্রাণকার্যের দল গঠন করিয়াছিলাম বা ভারতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম তখন যুদ্ধকার্যের সহায়তা করার জন্য তাহা করি নাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামক প্রতিষ্ঠান, যাহাকে সংসারের হিতকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহারই সহায়তা করার চেষ্টা করিয়াছিলাম মাত্র। যুদ্ধকে আজ যতটা মন্দ মনে করি তখনও ততটাই মন্দ জ্ঞান করিতাম। তখনও আমি কাঁধে বন্দুক লইয়া মনুষ্যহত্যায় লাগিতে পারিতাম না। কিন্তু আমাদের কর্তব্য নির্বাচনের পথ সরল নয়—একই সঙ্গে বহু করণীয়, কোন কোনটি বা পরস্পরবিরোধী, কর্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রতিনিয়তই বাছিয়া লইতে হয় আমি কোন্‌টি করিব। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব আমি কখনই গ্রহণ করি নাই, তখনও না এখনও না। সামান্য নাগরিক হিসাবে আমি পরিচালনা করিয়াছি সেই সব লোককে, যারা যুদ্ধের নীতিকে মান্য করে, অথচ ভীরুতার বশে বা অন্য কোন হীন উদ্দেশ্যে অথবা ইংরাজ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ যুদ্ধে যোগদান করিতে চাহে না। আমি তাহাদের খোলাখুলি বলিয়াছি যে, যতক্ষণ তারা যুদ্ধের নীতিতে বিশ্বাস করিবে এবং ইংরাজ শাসনতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিবে, যুদ্ধকার্যে সাহায্য করিতে তাহারা বাধ্য। প্রয়োজন হইলে সৈন্যদলে যোগ দিতে হইবে। অস্ত্র আইন প্রয়োগ করিয়া ইংরাজ ভারতের যে অবমাননা ঘটাইয়াছে—যাহা ইংরাজের জঘন্যতম কুকীর্তি বলিয়া আমি মনে করিয়া থাকি—সেই আইনের বিলোপ সাধনের জন্য আমি আন্দোলন চালাইতে প্রস্তুত। যদিও আমি অস্ত্রের ব্যবহার অধর্ম বলিয়া মনে করি কারণ ইহা অহিংসা নীতির বিরোধী। প্রতিশোধ-মূলক শাস্তিবিধানে আমি বিশ্বাস করি না, তথাপি চারি বৎসর পূর্বে

১০

বেতিয়াতে ভীরু গ্রামবাসীরা যাহারা অহিংসার কোন শিক্ষাই পায় নাই তাহারা যখন তাহাদের পোষ্য স্ত্রীলোক ও শিশুদের ফেলিয়া গ্রাম হইতে পলাইয়া গেল তখন আমি তাহাদিগকে যথাশক্তি সংগ্রাম না করিয়া পলাইয়া যাওয়ার জন্য ভীরুতার অপবাদ দিতে দ্বিধা করি নাই। মাত্র কয়েক দিন আগে হিন্দুদের আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিয়াছি যে, যদি তাঁরা পূর্ণ অহিংসায় বিশ্বাস না করেন এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে সক্ষম না হন তাহা হইলে কোন দুর্বৃত্ত তাঁহাদের স্ত্রীলোকদের ধরিয়া লইয়া যাইবার কালে যদি তাঁরা বল-প্রয়োগে স্ত্রীলোকদের রক্ষা করিবার চেষ্টা না করেন তবে তাঁরা ধর্মের ও মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটাইবেন। আমার এই সকল যুক্তি এবং তদনুযায়ী আমার আচরণ আপাতদৃষ্টিতে পূর্ণ অহিংসার বিপরীত বলিয়া যদিও মনে হয়, আমি স্থির বুঝিয়াছি ইহা শুধু অহিংসাধর্মসংগত নয়, অহিংসার বিচার হইতেই এই যুক্তিগুলি আমার মনে আসিয়াছে। অহিংসার মন্ত্র মুখে বলা সোজা কিন্তু বিরোধ, সংঘাত ও বিদ্বেষপূর্ণ এই সংসারে তদনুযায়ী আচরণ করা যে কত কঠিন তাহা আমি দিনের পর দিন বুঝিতেছি। এই বিশ্বাসও দৃঢ়তর হইতেছে যে, জীবনে চলিবার পথে অহিংসা ছাড়া আর অপর কোন অবলম্বনই শ্রেয়ঃ নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১১-২৫, ৩৭৯]

৫০৩। অহিংসার তুলাদণ্ডে সূক্ষ্মভাবে তৌল করিলে আমার কাজের কোন কৈফিয়ৎই গ্রাহ্য হয় না। আমার নিজের মতে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধে আহতদের সেবার কাজ করা—উভয় কাজই যুদ্ধ করা, উভয় কাজই যুদ্ধে সহযোগিতা করা ও যুদ্ধকে জিয়াইয়া রাখার প্রয়াস বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। উভয় কাজই যুদ্ধাপরাধে সমান অপরাধী। কিন্তু অনেক বৎসর ধরিয়া আত্মানুসন্ধান করিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, স্থানকালপাত্র বিচার করিয়া বুয়র যুদ্ধ বা ১৯০৬ সালে জুলু বিদ্রোহকালে বা প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে আমি যাহা করিয়াছি তাহা না করিয়া উপায় ছিল না।

প্রতি মুহূর্তে বহু শক্তির প্রভাব জীবনে ক্রিয়াশীল হয়। ক্ষণিকের বিচারেও যাহা গ্রাহ্য এমন একটি সাধারণ সূত্র ধরিয়া নিশ্চিতভাবে কর্তব্য নির্ণয় করা সম্ভব হইলে পথনির্বাচন হইত অনায়াসলভ্য। জীবনে যত সমস্যার সমাধান করিয়াছি, এরূপ সহজে কোন ক্ষেত্রে করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

যুদ্ধের বিরোধিতা করাই আমার স্বভাব, এইজন্য সুযোগ পাইয়াও আমি কোন অস্ত্রচালনা শিক্ষা করি নাই। বোধ হয় এই কারণেই সাক্ষাৎভাবে আমাকে নরহত্যা করিতে হয় নাই। কিন্তু যতদিন আমি হিংসাশক্তির উপর নির্ভরশীল শাসনব্যবস্থার আশ্রয়ে বাঁচিয়া থাকিব এবং সরকারের সৃষ্ট সকল সুখসুবিধা ভোগ করিব ততদিন আমার গভর্নমেণ্ট যুদ্ধে লিপ্ত হইলে আমাকেও সেই প্রচেষ্টায় যথাশক্তি সাহায্য করিতে হইবে, অন্যথায় গভর্নমেণ্ট সৃষ্ট সকল সুখ-সুবিধা যতদূর সম্ভব ত্যাগ করিয়া আমাকে সরকারের সহিত পূর্ণ অসহযোগ ঘোষণা করিতে হইবে।*

আরও বিশদভাবে বুঝিবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ধরুন আমি এমন একটি সমাজের লোক যারা সামান্য জমি চাষ

---

* অন্যত্র আফ্রিকাস্থিত সহকর্মী এইচ. এস. পোলককে লিখিত চিঠিতে (যাহা চন্দ্রশঙ্কর শুক্লার লিখিত 'গান্ধীজীবনের ঘটনাবলী' পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে) তিনি বলিয়াছেন—

"আমার সৈন্য সংগ্রহ প্রচেষ্টা বিষয়ে তোমার মত কি? পবিত্র অহিংসা ধর্মের পালনে ইহাও একটি প্রচেষ্টা। আমি আবিষ্কার করিয়াছি যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ভারত যুদ্ধ করিবার শক্তি হারাইয়াছে। তাই সর্বাগ্রে তাহাকে যুদ্ধ করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। তারপর যদি তাহার অভিরুচি হয় যুদ্ধক্লিষ্ট পৃথিবীকে অহিংসার পথ দেখাইবার ভার লইতে পারিবে। নিজের দুর্বলতা থাকিতে পৃথিবীকে ভারত কি দিতে পারিবে? শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে তখন দিবার অধিকার জন্মিবে। হয়তো ভাগ্যদোষে ভারত এ পথে চলিতেই পারিবে না। আমার কাছে ইহার অর্থ হইল ভারতের আত্মবিলোপ। অন্য বহু দেশের মত পশুশক্তির সাধনকে অবলম্বন করিয়া, তাহাদের মত হইয়া ভারত নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইবে। যত কাজ আমি করিয়াছি এই সৈন্য সংগ্রহ তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন বলিয়া মনে হইয়াছে। হয়তো সৈন্য আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই কিন্তু আমি দেশে সর্বোত্তম রাজনীতি প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি।"

করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। মনে করা যাক হনুমানের অত্যাচারে তাদের ফসল বিপন্ন হইল। জীবিত প্রাণী মাত্রকেই পরম পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কারণে হনুমানদের হত্যা করা দূরের কথা, তাহাদের কোন রকম পীড়া দেওয়াও আমি অহিংসার বিরুদ্ধ কার্য বলিয়া মনে করি। তবুও ফসল রক্ষার জন্য হনুমান দলকে আক্রমণ করিতে আমি দ্বিধা করিব না। এই কাজকে পাপ জ্ঞান করিলেও ইহা না করিয়া উপায় নাই। চাষ করিয়া বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা পরিহার করিলে সমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। এমন সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব নয় যেখানে চাষ না হইলেও চলিবে। চাষ না হইলে যদি চলিত তাহা হইলে প্রাণহানির সম্ভাবনাও থাকিত না। সেই কারণে সমাজের প্রয়োজনে বিনীতভাবে অপরাধ স্বীকার করিয়া বানর বিতাড়নের কঠোর পন্থা মানিয়া লইতে হয়। মনে আশা থাকে, ভবিষ্যতে কোনদিন কোন উপায় আবিষ্কার হইবে যাহা দ্বারা এই জীবহিংসা না করিয়াও শস্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

ঠিক এইরূপ অবস্থাতে পড়িয়াই আমি উপরিউক্ত তিন বার যুদ্ধ-কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। যে সমাজে আমি বাস করি তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা বাতুলতা হইবে বুঝিয়া আমি তাহা না করিয়া পারি নাই। ঐ সময়ে ইংরাজ শাসনের সহিত অসহযোগ করার কোন সম্ভাবনা আমার মনে উদিত হয় নাই।

বিচার এইখানে শেষ হয় না। যখন জাতীয় গবর্নমেণ্টের শাসনে আমরা বাস করিব, এমন অবস্থা ঘটিতে পারে যে যুদ্ধসজ্জা প্রয়োজন হইল। তখন আমি নিজে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করিলেও, যাহারা যুদ্ধে যোগ দিবে তাহাদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থার পক্ষে আমাকে ভোট দিতে হইবে। কারণ আমি জানি শাসকমণ্ডলীর সকলেই আমার মত অহিংসায় বিশ্বাসী হইবে এমন হওয়া সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি বা সমাজকে জোর করিয়া অহিংসা পালনে ব্রতী করানো যায় না।

আমাদের জীবনে অহিংসার ক্রিয়া অতি দুর্জয়। অনেক সময়ে

দেখা যায় আমাদের কাজে অহিংসা কোথায় তাহা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। এমনও হইতে পারে যে কার্যকারক ব্যক্তি চূড়ান্ত অহিংসাপরায়ণ হইলেও তাঁহার কাজ দেখিয়া মনে হইবে যেন তিনি হিংসাচরণ করিতেছেন—পরে প্রমাণ হইতে পারে যে অহিংসাই ছিল তাঁহার কাজের মূল প্রেরণা। যে কয়টি ঘটনায় আমার কাজের কৈফিয়ৎ দিয়াছি (আপাতদৃষ্টিতে তাহা হিংসা বলিয়া মনে হইলেও) তাহার মূল প্রেরণা ছিল অহিংসা। এর মধ্যে জাতীয় স্বার্থরক্ষা বা এরূপ অপর কোন হীন অজুহাতের চিন্তা ছিল না। ক্ষুদ্র বা ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিয়া জাতীয় বা অপর কোন স্বার্থের পরিপুষ্টি ঘটিতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না

আমার যুক্তির স্বপক্ষে আর বেশী না বলাই ভালো। মনের ভাব পুরাপুরি প্রকাশ করিতে পারে ভাষার সে ক্ষমতা নাই। আমার কাছে অহিংসা একটি সূক্ষ্ম, সুসংগঠিত তত্ত্বমাত্র নয়, অহিংসাই আমার প্রাণের প্রাণ আমার পরমাগতি। ইহা আমার বুদ্ধিপ্রসূত জীবনদর্শন নয়—আমার অন্তর হইতে উৎসারিত প্রেরণা। আমি জানি অহিংসার সাধনে আমি বার বার ব্যর্থ হইয়াছি, কখনও জ্ঞাতসারে বেশীরভাগ সময়ে নিজের অজ্ঞাতে। সর্বদা বিনম্র হৃদয়ে আত্মত্যাগে প্রস্তুত হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে পারিলে সত্য প্রেরণা লাভ করা যায়। পূর্ণ নির্ভীকতা ও অদম্য সাহস সঞ্চার করিতে পারিলে তবে অহিংস আচরণ সম্ভব। আমার অক্ষমতার পরিচয় সর্বদাই আমার কাছে প্রকট হইয়া আমাকে পীড়া দেয়।

আমার অন্তরে স্বচ্ছ নিষ্কম্প দীপশিখা প্রজ্বলিত রহিয়াছে। সত্য ও অহিংসার আশ্রয় না লইলে কাহারও গতি নাই। যুদ্ধ যে পাপ ও দুঃসহ অভিশাপ সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাও জানি যে যুদ্ধের অবসান ঘটিতে বাধ্য। আমার বিশ্বাস, যে স্বাধীনতা রক্তপাতের দ্বারা অথবা বঞ্চনা করিয়া পাওয়া যায় তাহা

প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। আমার কোন কাজের ফলে অহিংসার বিড়ম্বনা ঘটা কিংবা কোন কারণে আমাকে অসত্য বা হিংসার সহায়ক বলিয়া মনে করার চেয়ে আমার সকল কাজ নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াই শ্রেয়ঃ। হিংসা নয়, অসত্য নয়, সত্য ও অহিংসাই আমাদের সত্তার স্বরূপ।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-৯-২৮, ৩০৮]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষয়ে
মিত্রপক্ষের প্রতি সহানুভূতির কারণ

৫০৫। উভয় পক্ষের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা ও নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মিত্রপক্ষের উক্তি যতই অস্পষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ হউক না কেন, লোকে বুঝিয়াছে তাহারা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্যই সংগ্রাম করিতেছে। হিটলার যুদ্ধ করিতেছেন জার্মান সাম্রাজ্যের বিস্তারের জন্য। তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল তিনি যেন তাঁহার দাবী নিরপেক্ষ বিচারক মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করেন। কিন্তু শান্তি ও আলোচনার পথ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া অস্ত্রের সাহায্যে তিনি দাবী জাহির করিতে উদ্যত হইলেন। এই কারণে মিত্রপক্ষের দিকেই আমার সহানুভূতি জন্মিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে মিত্রপক্ষের দাবী যদি ন্যায়সংগতও হয় তাহা রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করার বিষয়ে আমার কোন-রকম সম্মতি আছে। যে অধিকার ন্যায়সংগত, পাশবিক বলের বিরুদ্ধে ন্যায় ও ধর্মসংগত পন্থায় সে অধিকার নিজেকে বজায় রাখিতে সমর্থ। সেজন্য তাহাকে অস্ত্রপ্রয়োগের হীনতা অবলম্বন করিতে হয় না।

[হরিজন, ১৪-১০-৩৯, ৩০১]

৫০৬। পত্রলেখকের আর একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকী আছে। যুদ্ধ মাত্রই যদি নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে যুদ্ধে কোন পক্ষকে নৈতিক সমর্থন বা শুভেচ্ছা জানানোর অবকাশ কোথায়? ইহা সত্য যে আমি মনে করি সকল যুদ্ধই অন্যায়। কিন্তু যুধ্যমান দুই পক্ষের মনোভাব বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এক পক্ষ ন্যায়সংগত কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, অপর পক্ষে আছে অন্যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'ক' 'খ'-এর দেশ দখল করিতে চায়। এক্ষেত্রে 'খ'-এর প্রতি অন্যায় করা হইতেছে। উভয় পক্ষই মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধে নামিয়াছে—এই হিংস্র যুদ্ধের সম্বন্ধে আমার কোনই আস্থা নাই। কিন্তু যেহেতু 'খ' নিজের ন্যায্য অধিকার রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে, নৈতিক সমর্থন ও শুভেচ্ছা তাহারই প্রাপ্য।

[হরিজন, ১৮-৮-৪০, ২৫০]

ভারতে বিদেশী সৈন্যের অবস্থান

৫১২। প্রশ্ন—ভারতে মিত্রশক্তির সৈন্যদলের অবস্থানকে আপনি অহিংসার বিচারে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন। ইহাও বলিতেছেন যে, যেহেতু জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন সার্থক অহিংস সংগ্রামের নীতি উপস্থিত করিতে পারিতেছেন না সেইজন্য মিত্রশক্তির সহায়তাকে আপনি উপেক্ষা করিতে সাহস করেন না। কিন্তু ইহা কি আপনি বিবেচনা করিয়াছেন যে, ভারতে যে অহিংস শক্তি আপনার নেতৃত্বে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যদি ইংরাজকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করিতে পারে তবে জাপানের ভারত দখল করার চেষ্টায় তাহা কি যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না? অহিংস প্রতিরোধকারীর ইহাও বিচার করা প্রয়োজন যে, যুদ্ধমত্ত দুই বিদেশী সৈন্যদল যদি ভারতের মাটিতে মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহার দেশ, তাহার গ্রাম, তাহার যথাসর্বস্ব এই যুদ্ধে ধ্বংস হইবে না কি?

উত্তর—এই প্রশ্নের ভিতর স্পষ্টতঃই একটি গলদ রহিয়াছে। বহু প্রয়াসেও আমার নিজের দেশের লোককে অহিংসা নীতি দৃশ্যতঃ গ্রহণ করাইতে সক্ষম হই নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া ইংরাজ জাতি বাহুবলের উপর ভরসা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে—কেমন করিয়া অহিংসা সহসা তাহাদের মনে প্রভাব বিস্তার করিবে? হিংসার পথ ও অহিংসার পথে অনেক পার্থক্য। যদি মিত্রশক্তির সৈন্যদলকে আমাদের দেশে কাজ করিতে বাধা দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের উদ্দীপিত ক্ষোভ আরও বাড়ানো হইবে মাত্র। যতদূর ক্ষুব্ধ করা হইয়াছে তাহা না করিয়া উপায় ছিল না, এই ক্ষোভ আরও বাড়ানো বাতুলতা হইবে। যদি সত্যই বিদেশী শক্তি অপসারিত হয় তাহা কেবল অহিংসার চাপে ঘটিল এমন কথা সত্য হইবে না। সে যাহা হউক, যে উপায়ে ইংরাজের পুরাতন কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব সেই উপায়েই জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গেলেও তাহা কার্যকরী হইবে এরূপ ধারণার কোন কারণ নাই। এই দুই কাজে দুইটি স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে। ইংরাজকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া এবং সেইরূপ অন্যান্য অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা তাহাকে ভারত ছাড়িতে বাধ্য করা যায় কিন্তু আক্রমণকারী জাপানীদের সেই সকল উপায়ে ঠেকানো যাইবে না। একেবারে অন্য উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন হইবে। সুতরাং অহিংস উপায়ে জাপানীদের ঠেকাইতে পারিব এরূপ ধরিয়া লইয়া যদি ইংরাজদের সুপ্রতিষ্ঠিত রক্ষাব্যবস্থাগুলি ঘুচাইয়া দিই, তাহা নিতান্ত নির্বোধের কাজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।

সর্বশেষে এ কথাও ভাবিয়া দেখিতে বলি যে, আমাদের দিক দিয়া আত্মরক্ষার সকল অহিংস ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত কিন্তু আমাদের অহিংসাচরণ এমন হওয়া উচিত নয় যাহার চাপে ইংরাজ বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। সেরূপ ঘটিলে বিগত বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া আসিয়াছি তাহা ধূলিসাৎ হইবে।

[হরিজন, ৫-৭-৪২, ২১০]

স্বাধীন ভারতের আচরণ কেমন হইবে?

৫১৭। গান্ধীজী বহুবার বলিয়াছেন যে, যে ভারত আজ ইংরাজের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করে, ইংরাজ যদি প্রসন্নভাবে ভারতের কর্তৃত্ব ত্যাগ করে তাহা হইলে সেই ভারত ইংরাজকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহার সাহচর্য খুঁজিবে। সমাগত আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ সেই মিত্রতার সম্ভাবনা বুঝিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন, "স্বাধীন ভারত কি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে?"

উত্তরে গান্ধীজী বলিলেন যে, "স্বাধীনতা পাইলে ভারতকে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেই হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না। যে ঋণ পরিশোধ দেওয়ার সময় অনেক আগেই উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে সেই ঋণের দেয় প্রাপ্য পাইলে উত্তমর্ণও অধমর্ণের প্রতি প্রসন্ন হয়। ভারতও সেইরূপ ইংরাজের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। মানুষের স্বভাব এইরূপ যে দেয় ঋণ ফেরৎ পাইলে সে অধমর্ণের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।"

"তা যদি হয় তাহা হইলে এই মিত্রতা ভারতের ঘোষিত অহিংসার সহিত কিরূপে সংগতিপূর্ণ হইবে?"

"প্রশ্নটি মূল্যবান। সমগ্র ভারতের সকল লোক অহিংসা গ্রহণ করে নাই। যদি সমগ্র ভারত অহিংসা গ্রহণ করিত তাহা হইলে আজ আমাকে ইংরাজের কাছে আবেদন নিবেদন করিতে হইত না, জাপানী আক্রমণের ভয়েরও কোন কারণ থাকিত না। ভারতের লোকের অতি নগন্য অংশই আমার অহিংসা গ্রহণ করিয়াছে অথবা হয়তো ভারতের কোটি কোটি লোক—মূক জনসাধারণ—আমার অহিংসাকে স্বীকার করিয়াছে, যারা স্বভাবতঃই নিরুপদ্রব। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন হইতে পারে: 'এই নিরীহ জনসম্প্রদায় কি কাজ করিয়াছে?' হয়তো কিছুই করে নাই। কিন্তু সম্ভবতঃ তারা কাজ করিবে যখন সেই চরম মুহূর্ত আসিবে, হয়তো নাও করিতে পারে। কোটি কোটি জনতার অহিংস শক্তিতে শক্তিমান হইয়া

ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছি এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না। অহিংসার যেটুকু শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে—দুর্বলের অহিংসা বলিয়া ইংরাজ তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়াছে। এই কারণে আমি কেবল ইংরাজের সহজ ন্যায়নিষ্ঠার উপর জোর দিয়া আমাদের দাবী উপস্থিত করিয়াছি যাহাতে ইংরাজের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিতে পারি। আমার এ দাবী মানুষের নীতিধর্মের দাবী। ইংরাজ বাহুবলের ভরসায় অনেক দুঃসাধ্য সাধন করিয়া তাহাদের বীরত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আজ নীতির ক্ষেত্রে সেই দুঃসাহস অবলম্বন করিয়া ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ জাতি আজই ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করুক, ভারতবাসী স্বাধীনতা চাহে বা না চাহে দেখিবার প্রয়োজন নাই।

[হরিজন, ১৪-৬-৪২, ১৮৭]

৫১৮। শ্রীএড্‌গার স্নো (Edgar Snow)* প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"আপনার মতে, মিত্রপক্ষের সাহায্যের জন্যই ভারতের স্বাধীনতা প্রয়োজন। স্বাধীন ভারত সকল সমর্থ লোকদের লইয়া বাহিনী গঠন করিয়া সর্বাত্মক যুদ্ধে যোগ দিবে কি?"

গান্ধীজী উত্তরে বলিলেন—"প্রশ্নটি সংগত বটে কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। আমি এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে, স্বাধীন ভারত মিত্রশক্তির পক্ষেই যোগ দিবে, কিন্তু তাহারা অস্ত্রধারণ করিয়া সৈন্যদলে যোগ দিবে, না, নিরস্ত্র অহিংস যুদ্ধের পথ গ্রহণ করিবে সে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার দিক হইতে আমি বলিতে পারি যে, যদি ভারতকে অহিংসার পথে নেওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে আমি সেই চেষ্টাই করিব। যদি ভারতের চল্লিশ কোটি লোককে অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করা যায় তাহা হইলে সেই অপূর্ব পরিবর্তনে এক বিরাট্ সার্থকতা ঘটিবে।

---

* বিশিষ্ট মার্কিন লেখক

শ্রীএডগার স্নোর পুনরপি প্রশ্ন—"যদি ভারত সশস্ত্র যুদ্ধে যোগ দেয় তাহা হইলে আপনি কি অহিংস অসহযোগ দ্বারা বাধা সৃষ্টি করিবেন ?"

গান্ধীজীর উত্তর—"এরূপ কাজ করার বাসনা আমার মনে নাই। স্বাধীন ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করা যায় না—সেরূপ করা অন্যায় হইবে।

[হরিজন, ১৯-৭-৪২, ২৩৪]

৫১৯। প্রশ্ন—আপনার অহিংসার ভবিষ্যৎ কর্মধারা কি হইবে ? স্বাধীনতার পর অহিংসার প্রসারের জন্য আপনি কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন ?

উত্তর—এ প্রশ্নের অবকাশ কোথায় ? আমি যে ভারতের কথা বলি সে আমার ধ্যানের ভারত—বাস্তবের সঙ্গে তাহার কিছু কিছু অমিল থাকিবেই। স্বাধীন ভারতের সরকার কোন্ নীতি অবলম্বন করিবেন তাহা কে বলিতে পারে ? স্বাধীনতার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইতে পারে—না হওয়াটাই আমার কাছে কাম্য। যদি স্বাধীনতার পরেও আমি বাঁচিয়া থাকি তাহা হইলে যতদূর সম্ভব অহিংসা নীতি গ্রহণ করিতে সরকারকে পরামর্শ দিব। সারা পৃথিবীতে শান্তি—আমার পক্ষে ইহাই হইবে ভারতের অবদান। এই পথেই মানব-সমাজের নূতন করিয়া বাঁচার উপায় পাওয়া যাইবে। ভারতে অনেক সম্প্রদায় আছে যুদ্ধই যাহাদের একমাত্র উপজীবিকা, তাহারাও ভারতের শাসননীতির ব্যাপারে নিজেদের মত প্রকাশের অধিকার পাইবে। এইসব জটিলতার ফলে আমার মনে হয় ভারত সরকার মৃদু ধরনের সামরিক প্রস্তুতির পথ গ্রহণ করিবে। বাইশ বৎসর ধরিয়া অহিংসাকে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রয়োগ করার অবিরাম চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে না, ফলে ভবিষ্যতে ভারতে অহিংসার প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য একটি প্রবল পক্ষ কাজ করিতে থাকিবে। বিচার করিলে বুঝা যায়, স্বাধীন ভারত মিত্রশক্তির সহিত যোগ দিলে

তাহাদের উদ্দেশ্যসাধনে বহু সাহায্য হইবে—অপর পক্ষে, ভারতকে পরাধীন রাখিলে যুদ্ধজয়ের পথে ভারত বিঘ্নস্বরূপ হইয়া থাকিবে, হয়তো সংকট সময়ে ভারতের পরাধীনতা কঠিন বিপদ ঘটাইয়া ফেলিতে পারে।

[হরিজন, ২১-৬-৪২, ১৯৭]

চতুর্দশ পর্ব

স্বাধীনতা যখন আসিল

ভারতব্যবচ্ছেদ—ঘটনার পূর্বে

৫২৩। প্রশ্ন—বিহারের ঘটনার পরে, স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপনের বিরুদ্ধে আপনার কোন আপত্তি আছে কি ?

উত্তর—স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র গঠনে আমার কোন অমত নাই। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে, কিন্তু সে রাষ্ট্রের নীতি কেমন হইবে তাহাই বিচার্য। এই বিষয়টি এখনও অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। যদি সেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বিদেশী শক্তির সঙ্গে মিলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে থাকে তাহা হইলে ইহাতে কাহারও সম্মতি থাকা সম্ভব নয়। কোন দেশই তাহার অংশবিশেষকে এমন স্বাধীনতা দিতে পারে না যে অধিকার বলে সেই অংশ তাহারই বিরুদ্ধাচরণ করিবে। এরূপ কাজ করিলে নিজের মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া আনা হইবে।

প্রশ্ন—পাকিস্তান গঠিত হইলে যদি ভারত স্বাধীনতা পায় তাহাতে আপনার সায় আছে কি ?

উত্তর—যখন আপনারা পাকিস্তান গঠন করার কথা ভাবেন তখন আপনারা ইহাই স্বীকার করেন যে কোন তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় ইহা গঠিত হইবে। যখন আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য কামনা করি তখন ইহাই জানি যে, সে স্বাধীনতা কোন বিদেশী শক্তির সহায়তা না লইয়াই আমরা অর্জন করিব, সে শক্তি রাশিয়া, চীন বা অন্য যে-কোন দেশই হউক না কেন। যদি আমাদের অন্তর্গূঢ় শক্তি হইতে অর্জিত হয় তবেই সে প্রকৃত স্থায়ী স্বাধীনতা হইবে। সমগ্র দেশের স্বাধীনতা স্বাধীনভাবে অর্জন করার পর নিজেরাই আমরা পাকিস্তান-হিন্দুস্তান বিভাগ করিয়া লইতে পারিব।

প্রশ্ন—ইদানীং যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিয়া গেল ইহার পর

পাকিস্তান হওয়া কঠিন হইল—শান্তিও নষ্ট হইল। এ সমস্যার সমাধান কি ?

উত্তর—এই সমস্যার মীমাংসাই আমি খুঁজিতেছি—সমাধান পাওয়া মাত্রই অকপটে তাহা প্রকাশ করিতে আমি বিলম্ব করিব না।

[১৪-১-২৭ তারিখে নোয়াখালিতে জনৈক মুসলমান যুবকের প্রশ্নের উত্তর—অপ্রকাশিত]

৫২৪। প্রশ্ন—সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগ কি অপরিহার্য ? এই বিভাগের ফলে কি সাম্প্রদায়িক সকল সমস্যার সমাধান হইবে ?

উত্তর—প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি—'অপরিহার্য নয়'। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—হইবে না।

[হরিজন, ১৮-৫-৪৭, ১৫৬]

৫২৫। দেখা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক দিন দিন অধিকতর তিক্ত হইয়া উঠিতেছে, এরূপ না ঘটিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারিত না কি ?

বিশেষ জোরের সহিত গান্ধীজী বলেন যে, এই বিরূপ সম্পর্ক চিরদিন চলিতে পারে না। সাময়িক প্রমাদ যতই পীড়াদায়ক হউক না কেন, হিন্দু মুসলমান দুই ভাই, তারা ভাই-ই থাকিবে। এরূপও দেখা যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ চলিতে থাকে—দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ ঘটা বিচিত্র নয়। গান্ধীজী আশা করেন ভারতে এরূপ ঘটিবে না কারণ তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মই লোপ পাইবে আর তুচ্ছ লাভের লোভে ভারতের স্বাধীনতা পরের হাতে তুলিয়া দিবে।

অপর প্রশ্নটিতে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, যেহেতু ক্রমশঃ হিন্দুরা বঙ্গবিভাগের অনুকূলে মত দিতেছেন এ অবস্থায় বঙ্গবিভাগ আর কি রোধ করা সম্ভব হইবে ?

গান্ধীজী এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া এ বিষয়ে নিজের কোন মত প্রকাশে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তবে তিনি বলেন যে,

যদি বাংলা ভাগ হইয়া যায় তবে মুসলমান সম্প্রদায়, বিশেষ বাংলার তৎকালীন ক্ষমতাশীল মুসলিম সরকারই এর জন্য দায়ী হইবেন। তিনি যদি বাংলার প্রধানমন্ত্রী হইতেন তাহা হইলে তিনি হিন্দু ভাইদের দ্বারে দ্বারে গিয়া অনুরোধ করিতেন, তাঁরা যেন অতীত ভুলিয়া গিয়া মিলনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি ঘোষণা করিতেন যে মুসলমান হইলেও তিনি বাঙালী, হিন্দুভাইরাও বাঙালী। ধর্মের বিভিন্নতা বাঙালীর একতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। বাংলার হিন্দু, বাংলার মুসলমান একই ভাষায় কথা বলে, একই ঐতিহ্য বহন করে। বাংলার যা কিছু গৌরব তাহাতে উভয়েরই সমান অধিকার। বাংলা পাঞ্জাব নয় বোম্বাইও নয়, বাংলা বাংলাই। বাংলার প্রধানমন্ত্রী যদি এই মনোভাব অবলম্বন করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি (গান্ধীজী) প্রধানমন্ত্রীর সহিত বাংলার সর্বত্র ঘুরিয়া হিন্দুদের মত পরিবর্তনের চেষ্টা করিবেন। এ কথা তিনি নিঃসংকোচে বলিতে পারেন যে, যে দেশে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়াইয়া লর্ড কার্জনের মত ক্ষমতাশালী বড়লাটের নিজস্ব অবদান, বঙ্গবিভাগকে নাকচ করিয়া বাংলার ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল সেই দেশে এমন কোন হিন্দু থাকিতে পারে না যিনি বাংলার ঐক্য রক্ষার বিরোধিতা করিবেন। জনাব সুরাবর্দির স্থানে তিনি যদি নেতা হইতেন তাহা হইলে তিনি ঘোষণা করিয়া বলিতেন যে, তাঁহার দেহ বিচ্ছিন্ন না করিয়া কেহ বাংলা দেশকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। যদি তাঁর অন্তরে বাংলা দেশ ও বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান সকলের জন্য সেই প্রবল প্রেম থাকিত এবং সেই প্রেম লইয়া তিনি আহ্বান করিতেন তাহা হইলে কঠোরতম বিরোধী হিন্দুর হৃদয়ও তিনি জয় করিতে সক্ষম হইতেন। হিন্দুর মন আজ ভয়ে ও সন্দেহে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। নোয়াখালি ও কলিকাতার ঘটনা যাহা শোনা যায় তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে হিন্দুদের এই মনোভাবের কারণ বুঝা যায় এবং বিহারে মুসলমানদের মনের অবস্থাও অনুমান করা

সম্ভব। বিহারের হিন্দুদের নিকট তাই তিনি (গান্ধীজী) আবেদন করিয়াছেন যে, প্রতিটি মুসলমানের মন হইতে ভয় ও সন্দেহ ঘুচাইতে হইবে। যে প্রেমের নীতির অনুসরণ তিনি সর্বদা করেন তার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের কোন পার্থক্য তিনি করিতে পারেন না।

প্রশ্ন—আপনার মতে বাংলার অখণ্ডতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য কিন্তু ভারতবিভাগ হইয়া গেলে বাংলাবিভাগ রদ হইবে কেমন করিয়া ?

উত্তর—তিনি এ পর্যন্ত যাহা বলিয়া আসিতেছেন তাহা বুঝিয়া থাকিলে ইহাও বুঝা যাইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মত না থাকিলে কোন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। যদি কোন তৃতীয় পক্ষ তাহাদের ভাগ্য নির্ধারণ করিবার অধিকার না পায় তাহা হইলে দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে এ বিষয় স্থির হইতে পারে। এখন পর্যন্ত ভারতবিভাগের প্রশ্ন ওঠে নাই। যদি সেই অনাগত দুর্ভাগ্য ভারতের ভাগ্যে ঘটিয়া যায় সেই ক্ষেত্রে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান স্থির করিবে কোন্ পক্ষে তাহারা যোগ দিবে।

প্রশ্ন—যখন উপরের স্তরে সব কিছুই বিগড়াইয়া যায় তখন তার কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে নীচের স্তরের লোকের শুভবুদ্ধি কতদূর কার্যকর হইতে পারে ?

উত্তর—ছাতা যদি কাজ না করে তাহা হইলে যে ছাতা উঁচু করিয়া ধরিয়া থাকে সে-ই ছাতা সরাইয়া দিতে পারে, তেমনই উপরের স্তরের লোক যখন অন্যায় করে তখন নীচের স্তরের লোকেরা তাহাদের সরাইয়া দিতে পারে ; শুধু পারে না—সরানোই উচিত।

পণ্ডিত নেহেরু আজ উপরে স্থান পাইয়াছেন। কিন্তু নীচের লোকেরাই তাঁহাকে সেই স্তরে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যদি তিনি অন্যায় করিতে থাকেন তাহা হইলে নীচের লোকেরাই তাঁহাকে নামাইয়া দিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। বাংলার ব্যাপারেও সেই রকম। আজ যদি জনসাধারণের চক্ষে বাংলার প্রধানমন্ত্রী

সুরাবর্দি সাহেব অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন তাহা হইলে যাঁরা তাঁকে সম্মান দিয়া উপরে তুলিয়া ধরিয়াছেন, কোনরূপ বলপ্রয়োগ না করিয়া যদি তাঁরা তাঁদের দেওয়া সম্মান ফিরাইয়া লন তাহা হইলে সুরাবর্দি সাহেব আর উপরে থাকিতে পারিবেন না।

সকল দিক বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, জনসাধারণের বিচারবুদ্ধির অভাব ঘটিলে চতুর ব্যক্তিরা তাহাদের ঠকাইবে। ইংরাজদের ব্যাপারেও এইরূপ ঘটিয়াছে। যখন তাহারা বুঝিবে যে নীচের লোকেরাই উপরের লোকদের তুলিয়া ধরিয়াছে তখন তারা নিজেদের শক্তি বুঝিতে পারিবে এবং সব কিছুই ঠিক ঠিক ভাবে চলিবে। তাই তিনি (গান্ধীজী) বলেন যে, যখন উপরের লোকেরা বিগড়াইয়া যায় তখন বুঝিতে হইবে যে নীচেতেও গলদ আছে। কাজেই এ বিপত্তির একমাত্র প্রতিকার জনসাধারণকে সর্বাগ্রে নিজেদের অজ্ঞতা ঘুচাইয়া দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে।

[হরিজন, ২৫-৫-৪৭, ১৬৫-১৬৬]

ভারতবিভাগের পরে

৫২৬। ১৯৪৭-এর ৩রা জুন সন্ধ্যায় প্রথমে বড়লাট পরে পণ্ডিত জওহরলাল, কোয়াইদ্-ই-আজম জিন্না ও সর্দার বলদেব সিং ভারতের জনগণের উদ্দেশ্যে বেতার মারফৎ বক্তৃতা দেন। ব্রিটিশ-রাজের এই ঘোষণা জনসাধারণের মনে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ আনিল। বেশীরভাগ হিন্দুর মনে দেখা দিল দুঃখ। ভারতকে বিভক্ত করা সকলেই অপছন্দ করিল। কিন্তু আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতে রক্তস্রোত বহিতে দেওয়াও সম্ভব নয়। রোগ কঠিন হইলে অস্ত্রোপচারও বাঞ্ছনীয় হইয়া ওঠে। ইংরাজ সরকারের এই ঘোষণার সমালোচনা করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, পশুশক্তির তিলমাত্র বশ্যতা স্বীকার করাও অন্যায় এ কথা বার বার তিনি বলিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসের

কার্যনির্বাহক সমিতি এই মত প্রকাশ করেন যে, তাঁরা যে অস্ত্রের ভয়ে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন তা নয়, অবস্থার অনিবার্য গতিকে স্বীকার করিয়াছেন মাত্র। কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই অনিচ্ছুক সহযাত্রী লইয়া চলার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাই মূল সমস্যাগুলির সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ভারতের যে সকল অংশ ভারতীয় সংবিধান-রচনা-সভার সহিত সহযোগিতা করে নাই তাহাদের বাদ দিয়াই ভারত-রাষ্ট্র গঠন করা হউক।

মুসলিম লীগের কর্মপদ্ধতিকে ভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গান্ধীজী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিন্দুপ্রাধান্যের ভয়ে তাঁহারা ভীত এ কথা স্বীকার করিয়া তাঁহারা কোন কোন অঞ্চলকে নিজেদের মাতৃভূমি জ্ঞানে নিজেরাই শাসন করিতে চাহিয়াছেন—ইহাতে তাঁহাদের ভ্রম বুঝা গিয়াছে। ভারতে যত লোক জন্মিয়াছে ও যাহারা ভারতে বসবাস করিতেছে সকলেরই মাতৃভূমি ভারত। মুসলমানেরা কি স্বদেশে সকল লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচা সম্ভব বলিয়া মনে করেন? পাঞ্জাবে যত হিন্দু, শিখ, খৃষ্টীয়ান, ইহুদী বা পার্শি বাস করেন, পাঞ্জাব কি তাঁহাদের সকলের মাতৃভূমি নয়?

ভারতবিভাগের জন্য গান্ধীজী ইংরাজ বড়লাটকে দায়ী করেন নাই। তাঁর মতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগই এই দুঃখজনক দেশ-বিভাগের জন্য দায়ী।

ক্যাবিনেট মিশন ১৬ই মে তারিখে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন, গান্ধীজী সকল দেশবাসীকে সেই মতের পক্ষে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই। আজ এই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের পরে আমাদের কর্তব্য কি? যেহেতু তিনি দেশের সেবক, তিনি কংগ্রেসেরও আজ্ঞাবহ সুতরাং তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। পণ্ডিতজী এবং বড়লাট উভয়েই বলিয়াছেন যে জোর করিয়া কাহাকেও কিছু করানোর চেষ্টা আদৌ হয় নাই।

সকলে একমত হইয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সকলে অন্যমত হইলে যে কোন অবস্থায় তাহা বাতিল হইতে পারে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, গান্ধীজী ও কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির মধ্যে মতভেদ ঘটায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবেন। গান্ধীজী বলেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস স্বয়ং এই কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচন করিয়া ইহাকে কাজের ভার দিয়াছেন সুতরাং ইহার সিদ্ধান্ত সহজে রদবদল করা উহার পক্ষে উচিত হয় না। যদি কার্যনির্বাহক সমিতি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন ঋণপত্রে সহি করেন তাহা হইলে নিখিল ভারত কংগ্রেসকে তাহার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কার্যনির্বাহক সমিতি ভুল করিতে পারে। কংগ্রেস সেরূপ বুঝিলে কার্যনির্বাহক সমিতিকে বাতিল করিয়া দিতে পারে কিন্তু তাহার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। তিনি নিজে কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্তে সায় না দিতে পারেন কিন্তু স্বয়ং স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিলেও কংগ্রেস কমিটীকে এই কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে পরামর্শ দিবেন। তাঁর মতে, যে ত্রুটি ঘটিয়াছে বহুলাংশে তাহা সংশোধন করা সম্ভব।

কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি ভারতবিভাগে রাজী হওয়ায় অনেকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন গান্ধীজী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করিবেন কিনা। পাকিস্তান রচনা করাকে তিনি পূর্বেই মহাপাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং উহার পক্ষে সকল প্রয়াস হইতে বিরত ছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, অপর কাহারও ইচ্ছায় অনশন করা যায় না। অনশন এত সহজে হয় না। সেরূপ অনশন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ক্রোধের বশে অনশন করা যায় না কারণ ক্রোধের বশে মানুষ স্বল্পকালের জন্য উন্মাদের ন্যায় আচরণ করে। অনশন তখনই সম্ভব যখন অন্তরের গভীর হইতে সেই নির্দেশ আসে। তিনি দেশের সেবা

করেন সেজন্য তিনি কংগ্রেসের অনুগামী। কংগ্রেসের সহিত তাঁহার নিজের মতের পার্থক্য ঘটিলেই কি উপবাস করা যায়? এরূপ অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করাই শ্রেয়। এমন অনেক ব্যাপার ঘটে যখন ধৈর্যরক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে। কংগ্রেস যে শিল্পায়নের পক্ষপাতী তাহাতে তিনি ভারতের নিঃসহায় জনসাধারণের দারিদ্র্য ঘুচিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছেন না। তিনি যন্ত্রসভ্যতায় বিশ্বাস করেন না—কলের কাপড়েও তাঁর কোন আস্থা নাই। ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সৈন্যবল পোষণ করা প্রয়োজন বলিয়া তিনি মনে করেন না। এই সকল কারণ ও অপরাপর মতানৈক্যের জন্য অধীর হইয়া তিনি যদি উপবাস করিতে আরম্ভ করেন তাহাতে অধীরতাই প্রকাশ পাইবে। তিনি বরং বুঝিয়াছেন যে চারিদিকের এই জ্বালাময়ী অগ্নিশিখার মধ্যে ধীরতা অবলম্বন পূর্বক অন্তে একমাত্র সত্যেরই জয় হইবে—এই বিশ্বাসে ধীর পদক্ষেপে সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়।

[হরিজন, ১৫-৬-৪৭, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৪]

৫৩০। উপায়ান্তর না দেখিয়া নেতারা সমবেতভাবে ভারত-বিভাগে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা ভুল করেন নাই। নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ক্লিষ্ট দেশকে বিরতির অবকাশ দিবার জন্য তাঁহারা দেশবিভাগে সম্মত হইয়াছেন। অন্য মত পোষণ করেন বলিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন যে সমগ্র দেশ জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়া গেলেও অহিংসার পথ হইতে লেশমাত্র বিচ্যুতি ঘটিতে দিতে তিনি রাজী নহেন।

[হরিজন, ২৭-৭-৪৭, ২৫৩]

৫৩৩। অহিংসা ছিল গান্ধীজীর ধর্ম। কংগ্রেস অহিংসাকে এভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কংগ্রেসের কাছে অহিংসা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায় মাত্র। বাদশা খান

ছিলেন একমাত্র নেতা, যিনি অহিংসাকে ধর্মজ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও অহিংসার নীতি সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

গান্ধীজীর স্বীকারোক্তি: "আমি মনে করিয়াছিলাম আমাদের সংগ্রাম অহিংসার ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিতেছে, বাস্তবিক পক্ষে আমরা নিরুপদ্রব প্রতিরোধের বেশী কিছু করিতে পারি নাই। এ প্রতিরোধ দুর্বলের অস্ত্র, বল সংগ্রহ করিতে পারিলেই এ প্রতিরোধ সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। আমার এই উক্তিতে আমার ভ্রম স্বীকার করা হইল।"

গান্ধীজী ট্রানসভালে যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ মাত্র ছিল না, তার মূলে ছিল অহিংসা। সে সংগ্রামে শক্তি যোগাইয়াছে আত্মিক বল, দৈহিক সামর্থ্য নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস সংগ্রামের সাফল্যের উন্মাদনা লইয়া তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। এখানেও সংগ্রাম ফলবতী হইল। কিন্তু পরে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে ভারতের সংগ্রাম অহিংসার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় নাই। যদি তিনি পূর্বে ইহা বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে এই সংগ্রামে তিনি অবতীর্ণ হইতেন না। ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়া এই কাজ করাইতে চাহিয়াছিলেন, তাই তিনি তাঁহার (গান্ধীজীর) দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সংগ্রামের প্রচেষ্টায় হিংসা লুকাইয়া ছিল, তাহারই ফলে আজ এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, এই নরহত্যা ঘটিতেছে।

[হরিজন, ২৭-৭-৪৭, ২৫৩]

৫৩৪। পৃথিবীর একাধিক প্রান্ত হইতে আমার নিকট একটি প্রশ্ন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। প্রশ্নকর্তাদের মনোভাব আমার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

সাধনের জন্য ক্রমশঃ অধিকতর বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে—এরূপ ঘটিতেছে কেন? ইংরাজশাসনমুক্ত হইবার জন্য দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী যে অহিংসার সাধনা করিয়াছে তাহার ফলেই কি এরূপ ঘটিতেছে? আপনার অহিংসার বাণী এ সংসারে কার্যকর হইবে বলিয়া কি আপনি এখনও আশা রাখেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে স্বীকার করিতে হয়, এ নিষ্ফলতা আমার নিজের—অহিংসার সাধনে এরূপ ফল হইতে পারে না। আমি পূর্বেই স্বীকার করিয়াছি যে, বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ভারত যে অহিংসার সাধন করিয়াছে তাহা দুর্বলের অহিংসা মাত্র। এ উত্তরে যথেষ্ট বলা হইল কিনা তাহা পাঠক বিচার করিবেন। আজ প্রয়োগ-ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলে সে অহিংসার আর বিশেষ কার্যকারিতা নাই। শক্তিমানের অহিংসার বিষয়ে ভারতের কোনই অভিজ্ঞতা নাই। শক্তিমানের অহিংসার তুল্য প্রবল শক্তি পৃথিবীতে আর কিছুরই নাই। এই উক্তির পুনরাবৃত্তিতে কোন ফল হইবে না কারণ এই সত্যকে প্রয়োগ-ক্ষেত্রে ব্যাপক আকারে প্রয়োগ করিয়া দেখানোই ইহার একমাত্র প্রমাণ। সর্বশক্তিপ্রয়োগে আমি সেই চেষ্টায় নিযুক্ত আছি। কিন্তু আমার সমগ্র শক্তির পরিমাণ যদি নগণ্য হয়? হয়তো আমি নির্বোধের ন্যায় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি। আমার আদর্শের এই ব্যর্থ অনুসরণে কোন্ সাহসে অপরকে আমার পথে চলিতে আহ্বান করিব? এই সকল প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে। আমার কাছে এ সকল প্রশ্নের উত্তর অতি সরল। আমি কাহাকেও আমার পথে চলিতে বলি না। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের বিবেকের নির্দেশে চলা উচিত। যদি কেহ অন্তরের সেই গূঢ় বাণী শুনিতে না পায় তাহা হইলে যত্নসহকারে তাঁহাকে নিজ পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। মেষপালের ন্যায় অপরের অনুকরণ করিয়া চলার কোনই সার্থকতা নাই।

[হরিজন, ২৯-৬-৪৭, ২০৯]

৫৩৫। একটি বিষয়ে আমার মনের কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে আচরণ করিয়াছি তাহাকে অহিংস প্রতিরোধ বলিলে ভুল হইবে। তাহাকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বলা যায়, যে প্রতিরোধ দুর্বল ব্যক্তিরাই অবলম্বন করে কারণ ইচ্ছা থাকিলেও সশস্ত্র প্রতিরোধের ক্ষমতা বা সাহস তাহাদের নাই। লৌহদৃঢ় হৃদয়ে বীর্যবান্ যোদ্ধা যে অহিংস প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতে পারে যদি আমরা তেমনই করিতে পারিতাম তাহা হইলে আজ দ্বিধা-বিভক্ত ভারত পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ যে গৃহবিবাদে লিপ্ত হইয়াছে তাহা দেখিতে হইত না। শুধু তাই নয়, এই বিবাদ-বিসংবাদের ফলে আজ ভারতের কোটি কোটি লোক অন্নবস্ত্রের কথাও ভুলিতে বসিয়াছে। এই সব অগণিত নিরন্ন ও নগ্ন লোক অন্নবস্ত্র ছাড়া আর কোন ধর্ম মানে না। তাহারা একমাত্র সেই ভগবানকে জানে, যে ভগবান তাহাদের সম্মুখে দৈনন্দিন অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির আকারে আবির্ভূত হন—অন্য কোন আকারে নহে।

[হরিজন, ২৭-৭-৪৭, ২৫১]

কাশ্মীর সম্পর্কে

৫৩৬। অহিংসাবাদী গান্ধীজী হিংসায় বিশ্বাসী কৃতী ব্যক্তিকে তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা করাকে অহিংসা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর ধ্যানধারণা ও কার্যকলাপ তিনি মানিতে পারেন নাই, কিন্তু অকুণ্ঠিত ভাষায় তাঁহার দেশপ্রেম, কার্যদক্ষতা ও বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। সেইরূপ কাশ্মীরে ভারত গবর্নমেণ্টের যুদ্ধপ্রচেষ্টা কিংবা শেখ আবদুল্লার সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে গান্ধীজী যদিও মত দিতে পারেন নাই তবুও তিনি এই যুগ্ম কর্মপ্রচেষ্টায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের কর্মতৎপরতা ও প্রশংসনীয় উদ্যমের গুণকীর্তন করিতে কার্পণ্য করেন নাই। বিশেষ করিয়া

বলিয়াছেন যে, সহায়ক ভারতীয় বাহিনী ও স্বদেশরক্ষাকারী কাশ্মীরী সেনাগণ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া নিশ্চিহ্ন হওয়া পর্যন্ত যেন যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া হয়। তিনি জানিতেন যে এরূপ করিতে পারিলে হয়তো ভারতের রূপের পরিবর্তন ঘটিবে। যদি এই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকে চিন্তায় ও কাজে সম্পূর্ণ অহিংস করা সম্ভব হইত তাহা হইলে তিনি এই 'হয়তো' শব্দটি ব্যবহার করিতেন না ; তিনি বলিতেন "ভারতের রূপ নিশ্চিত পরিবর্তিত হইবে। এই অহিংস প্রতিরোধের ফলে ভারতীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর এমনকি পাকিস্তানী মন্ত্রিমণ্ডলীরও হৃদয় পরিবর্তিত হইয়া স্বদেশরক্ষাকারী কাশ্মীরীদের সহিত সকলে একমত হইবেন।"

এই অহিংস সংগ্রামের জন্য ভারতের পক্ষে সশস্ত্র সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার প্রয়োজন হইবে না। অহিংসাধর্মী সহায়তা যত বেশী দেওয়া যায় ততই ভালো। বাহিরের কোন সাহায্য না পাওয়া গেলেও আত্মরক্ষাকারী কাশ্মীরীগণ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের বিপুল সমরসজ্জার সম্মুখীন হইবে। আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদল আক্রমণকারীর প্রতি মনে কোন বিদ্বেষ না রাখিয়া, ক্রোধ বর্জন করিয়া, কোন অস্ত্র এমনকি নিজেদের মুষ্টিবল পর্যন্ত ব্যবহার না করিয়া, নিজ নিজ কর্তব্য সাধনে যদি অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের বীরত্ব সংসারে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। কাশ্মীরের পুণ্যকীর্তি শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবীকে সুগন্ধে আমোদিত করিবে।

[হরিজন ১৬-১১-৪৭, ৪১৩]

স্বাধীন ভারতে রাজনীতি ও অর্থনীতি

৫৩৮। জনৈক পত্রলেখক জানিতে চাহিয়াছেন যে, ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আমি রাজনীতির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিব কি না ?

প্রথম কথা হইল, এই স্বাধীনতা দিয়া ভারত স্বর্গরাজ্যের দিকে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইবে না। স্বাধীনতার পূর্বে আমরা স্বর্গরাজ্য হইতে যত দূরে ছিলাম তত দূরেই রহিয়া যাইব। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন যেমনই হউক না কেন, কোটি কোটি জনতার জীবন লইয়াই আমার রাজনীতি—জনতার সেবা হইতে বিরত হইলে আমি আমার ধর্ম, আমার ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইব। ইহা সত্য যে, আমার রাজনীতি-চর্চা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিতে পারে—তাহার রূপ বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর করিবে।

[হরিজন, ১৭-৮-৪৭, ২৮১]

৫৪০। নানা বিষয়ে আলোচনার মধ্যে জনৈক জমিদার গান্ধীজীকে জানাইয়াছিলেন যে, চাষী ও শ্রমিকদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা না মানার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যাইতেছে। গান্ধীজী ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বিহারের সুনামে ইহা কলঙ্ক লেপন করিবে। শৃঙ্খলাহীনতা গুরুতর অপরাধ—এই অপরাধে কৃষাণ ও চাষীর সর্বনাশ ঘটিবে। মুষ্টিমেয় জমিদারের ভাল-মন্দতে তেমন কিছু যায় আসে না। তর্কের খাতিরে তিনি এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, অনেক অন্যায় কাজ করিয়া এবং অনেক করণীয় না করিয়া জমিদারেরা বহু অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। তাই বলিয়া চাষী ও কৃষাণ যারা ভারতের জনসমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি তারাও অন্যায় করিবে এরূপ ঘটা উচিত নয়। এই চাষী ও মজুরেরা ভারতের পবিত্রতার ধারক ও বাহক। তাহারাই যদি অধর্মাচরণ করে তাহা হইলে ভারতের গরিমা, ভারতবাসীর মর্যাদা রক্ষা করিবে কে?

অহিংস সত্যাগ্রহের স্বরূপ কি তাহা এই কিষাণদের ভালো করিয়া জানা আছে, তাহাদেরই অপূর্ব আত্মসংযমের ফলে চম্পারণে শতাব্দী-প্রচলিত নীলচাষের ও নীলকরদের অত্যাচার দূর করা সম্ভব হইয়াছিল। গান্ধীজী এ আশা পোষণ করেন যে, বিহারের কৃষক সেই সার্থক শিক্ষা বিস্মৃত হইবে না।

জমিদারদের গান্ধীজী বলেন যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল দুর্নাম শোনা যায় তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অবসান ঘটিতে বাধ্য। যদি তাঁরা দরিদ্র কৃষাণদের অছি হিসাবে চলিতে পারেন তবেই তাঁদের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে। কেবল নামে মাত্র অছি হইলে চলিবে না, পূর্ণ দায়িত্বশীল অছি হইতে হইবে। এইরূপ অছিরা এমন কিছু ভোগদখল করিতে পারিবেন না যাহা নিজের যত্নে ও শ্রমে উৎপাদন করিয়া ভোগের অধিকার অর্জন না করিয়াছেন। এই পন্থা অবলম্বন করিলে আইন তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং কৃষাণরাও তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিবে।

[হরিজন, ৪-৫-৪৭, ১৩৪]

৫৪১। তার পর গান্ধীজী যে বিষয়ের আলোচনা সেই সন্ধ্যায় করিতে চাহিয়াছিলেন সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"স্বাধীন ভারতে বিড়লারাজ বা ভূপালের নবাবের রাজত্ব হইবে না, হইবে পঞ্চায়েত রাজ।"

[হরিজন, ৮-৬-৪৭, ১৮৩]

৫৪২। প্রশ্ন—অধিকাংশ সমাজতন্ত্রবাদী বলেন যে, সমাজবাদী বিপ্লব ঘটিলে আর্থিক সমস্যার সমাধানই প্রবলতম প্রচেষ্টা হইয়া দাঁড়াইবে, যার ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না। এ যুক্তি কি গান্ধীজী স্বীকার করেন? যদি এরূপ বিপ্লব সম্ভব হয় তাহা হইলে তাহা হইতে ধর্মরাজ্য—গান্ধীজী যাহাকে বলেন রামরাজ্য—উদ্ভূত হইতে পারিবে কি?

উত্তর—যে অর্থনৈতিক বিরোধের সম্ভাবনা কল্পনা করা যায় তাহাতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ কিছুটা হ্রাস পাইতে পারে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বিরোধ একেবারে চলিয়া গেলেও আমাদের দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটিবে না। যাহা ঘটিতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, দাসত্বের যুগ শেষ হইয়া স্বাধীনতা দেখা দেওয়া মাত্রই

সমাজের যত গ্লানি সবই ক্রমে ক্রমে প্রকট হইয়া পড়িবে। এর জন্য অত্যধিক বিচলিত হওয়ার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি আমরা প্রকৃতিস্থ থাকিয়া মাত্রাসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারি তাহা হইলে সময়ে সকল জটিলতার মীমাংসা হইয়া যাইবে। আজ সর্বত্র আর্থিক অসাম্য বর্তমান। আর্থিক সাম্যই সমাজবাদের মূল ভিত্তি। আজ যে এক দিকে কয়েকজন ধনী ব্যক্তি ভোগবিলাসে মত্ত আছেন, অপর দিকে জনতা ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, এ অবস্থা বর্তমান থাকিতে রামরাজ্য কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আফ্রিকায় থাকাকালীনই আমি সমাজবাদের মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য সাম্যবাদীদের সম্বন্ধে আমার একমাত্র আপত্তি এইখানে যে, হিংসার শক্তিতে (বলপ্রয়োগ দ্বারা) মনুষ্যসমাজে কোন স্থায়ী সংস্কার সাধন করা যায় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

[হরিজন, ১-৬-৪৭, ১৭২]

প্রাদেশিকতা

৫৪৩। প্রতি প্রদেশেই যে প্রাদেশিকতার রোগ ছড়াইয়া পড়িতেছে সেই বিষয়ে গান্ধীজী আলোচনা করেন। তিনি সংবাদপত্রে দেখিতেছেন যে, আসামবাসীরা মনে করে আসাম একমাত্র তাহাদেরই সম্পত্তি। যদি বিভিন্ন প্রদেশের লোক এই মনোভাব অবলম্বন করে তাহা হইলে ভারত কাহার দেশ হইবে? তাঁর মতে সকল প্রদেশের লোকই ভারতের লোক তাই ভারত সকলের দেশ। আমাদের একমাত্র লক্ষণীয় যে, এক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশে বাস করিয়া সে প্রদেশকে যেন শাসন ও শোষণ করিবার চেষ্টা না করে কিংবা অপর কোন উপায়ে সেই প্রদেশের ক্ষতিসাধন করিবার চেষ্টা না করে। আমরা সকলেই ভারতের অধিবাসী এবং ভারতকে সেবা করিবার ভাব লইয়াই যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি।

[হরিজন, ৭-৯-৪৭, ৩১১]

৫৪৪। বিহার যে বিহারবাসীদের দেশ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু বিহার ভারতেরও অঙ্গ। যে কোন ভারতীয় পাকিস্তানে গেলে যেমন বিদেশী বলিয়া গণ্য হয়, বিহারে ভারতীয়েরা সেরূপ আচরণ পাইবে না বরং স্বদেশীয় বলিয়া আদৃত হইবে। এই বৈশিষ্ট্যটুকু বেশ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে নচেৎ অহেতুক অসুবিধা ও মনঃপীড়া ঘটিতে পারে।

ভারত ইউনিয়নের যে কোন ব্যক্তি বিহারে গিয়া বাস করিতে পারে কিন্তু সে বিহারীদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। এই কথা মনে রাখিয়া তদ্রূপ আচরণ না করিলে এমনও হইতে পারে যে, অ-বিহারী ভারতীয়দের ধাক্কায় বিহারীদেরই বিহার ছাড়িয়া পলাইতে হইবে। সুতরাং যিনি বিহারে বসবাস করিতে যাইবেন তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে তিনি বিহারকে সেবা করিতে যাইতেছেন। ইংরাজেরা যেমন বিদেশ হইতে আসিয়া ভারতকে শোষণ করিত সেরূপ মনোভাব ভারতীয়দের কাছে আশা করা যায় না।

চাকুরীগুলি কিভাবে বণ্টিত হইবে ইহাও ভাবিবার বিষয়। যদি সকল প্রদেশের সর্বথা সমান উন্নতি সাধন কাম্য হয় তাহা হইলে প্রত্যেক প্রদেশে প্রধানতঃ সেই প্রদেশের লোকদিগকে নিযুক্ত করিলেই সারা ভারতের কল্যাণ হওয়া সম্ভব। যদি জাতি হিসাবে ভারতকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেক প্রদেশকে উন্নত হইতে হইবে। সুতরাং বিহার, উড়িষ্যা বা আসামে যে নৃশংস আচরণ আমরা দেখিয়াছি তাহা না ঘটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। জনসাধারণের দ্বারা গঠিত সরকার প্রতিটি প্রদেশের কল্যাণের জন্য অপর প্রদেশের লোকের অবাঞ্ছিত আচরণ বা অহিতকর কার্যকলাপ রোধ করিবার জন্য সচেষ্ট আছেন। তাঁহাদেরই কর্তব্য অন্য রাজ্য হইতে আগত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সকল সুব্যবস্থা করা। সুবিচারের একটি বিখ্যাত নীতিবাক্য রহিয়াছে—"যাহা তুমি নিজের বলিয়া মনে কর তাহা

ভোগ করিতে বাধা নাই, শুধু দেখিতে হইবে যেন তাহাতে কাহারও ক্ষতি না ঘটে।" ধর্মজীবনের সম্বন্ধেও এই বাক্য নীতি হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আজ এই নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত।

এতক্ষণ আমি তাহাদেরই বিষয়ে বলিয়াছি যাহারা নূতন বিহারে আসিবে। যাঁহারা বিগত ১৫ই আগস্ট তারিখে সরকারী চাকুরীতে হউক বা অন্য কোন কাজে হউক বিহারে ছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে? তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বেচ্ছায় অ-বিহারী বলিয়া গণ্য হইতে না চাহেন তাঁহাদের সকলেরই বিহারবাসীদের সহিত একই অধিকার পাওয়া উচিত। ইহা স্বভাবতঃই আশা করা যায় যে, তাঁহারা প্রবাসীদের সহিত মিলিয়া স্বতন্ত্র গোষ্ঠী রচনা করিতে চেষ্টা করিবেন না। "রোমে বাস করিতে হইলে রোমীয়দের মত আচরণ করিও।" এ নীতিবাক্য এ ক্ষেত্রে সু-প্রযোজ্য, যদি রোমীয়দের দোষগুলির অনুকরণ করার চেষ্টা না থাকে। বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের সংমিশ্রণ তখনই হিতকর হয় যখন মন্দটুকু ত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রশংসনীয় আচরণটুকু গ্রহণ করা হয়। আমার মত গুজরাটী যখন বাংলা দেশে বাস করিবে তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাঙালীর সদ্‌গুণগুলি অভ্যাস করিয়া লওয়াই আমার কর্তব্য—তাহাদের আচরণে নিন্দনীয় যেটুকু আছে তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখিলেই আমি নিরাপদ। বাংলা দেশকে সেবা করাই হইবে আমার কাজ, বাংলাকে শোধন করার প্রয়াস সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। ভারতের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা। আমার দেশপ্রেম আমার প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া সারা ভারতে, ক্রমে ভারতের সীমা ছাড়াইয়া সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবে—তাহাই যদি না হয় তাহা হইলে এই দেশপ্রেম মানুষের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

[হরিজন, ২১-৯-৪৭, ৩৩২]

কংগ্রেস সংগঠন

৫৪৫। কোটি কোটি সদস্য লইয়া ভারতীয় কংগ্রেসের যে বিরাট্ প্রতিষ্ঠান স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ১৮৮৫ সালে সামান্য আকারে তাহা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দীর্ঘ ষাট বৎসরের কঠিন সাধনার ইতিহাস রহিয়াছে ইহার পশ্চাতে। আজ নানা দিক্ হইতে এই দুর্নাম রটিতেছে যে, দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কংগ্রেস তাহার কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগ ও সেবার ঐতিহ্য ত্যাগ করিয়াছে। লোকে বলিতেছে কংগ্রেসের ভাবধারার পরিবর্তন হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে স্বার্থপর ক্ষমতালোভী ও উচ্চপদপ্রার্থীর ভিড় জমিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস-সদস্যগণ জনগণের সেবক না হইয়া জনগণের প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া, কংগ্রেস আজ তুচ্ছ দলাদলি ও গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত। এ ছবি আজ প্রত্যেকটি প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি এই অবস্থা চলিতে থাকে তাহা হইলে যে স্বাধীনতার আশায় আমরা উৎসাহিত হইয়াছি সে স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। এই স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য চিত্তশুদ্ধি ও বোধ ও জ্ঞানের বিস্তার আবশ্যক। যদি কংগ্রেস বা লীগ যথাযোগ্য শুদ্ধভাব ও শক্তি ধারণ করিয়া রাখিতে না পারে তাহা হইলে সকল ক্ষমতাই তাহাদের হাত হইতে চলিয়া যাইবে। ইংরাজের মত অস্ত্রের জোরে তাহারা ক্ষমতাসীন থাকিতে পারিবে না কারণ তাহাদের সকল শক্তির উৎস দেশের জনসাধারণ। হয়তো এ সত্য সকলে তৎকালে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বহুদিন ধরিয়া জনসেবা করিয়া কংগ্রেস সাধারণের আনুগত্য অর্জন করিয়াছে। আজ যদি এই সেবকরা দেশকে বঞ্চনা করেন তাহা হইলে সমাজে যে সব ভদ্রবেশী গুণ্ডা আছে তাহারাই সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া দেশসেবকদেরও স্ববশে আনিতে সক্ষম হইবে।

[হরিজন, ১-৬-৪৭, ১৭৫]

৫৪৬। ভারতের প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই কংগ্রেস, বহু অহিংস সংগ্রাম করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আনিয়াছে; আজ তাহার মৃত্যু ঘটা বাঞ্ছনীয় নয়। তাহার মৃত্যু ঘটিলে জাতিও মরিবে। প্রাণবন্ত সত্তা হয় বাড়ে নয় মরে। কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনিয়াছে; এখনও দেশের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক স্বাধীনতা আনার কাজ বাকী আছে। যে কাজে উত্তেজনা নাই, বাহ্য গৌরবের আড়ম্বর নাই, সে কাজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন। কারণ তাহা তিলে তিলে গড়িয়া তুলিতে হয়। এই সর্বাত্মক গঠনকার্যে দেশে প্রত্যেক দলের প্রত্যেক অংশের উদ্যত প্রচেষ্টা জাগাইয়া কোটি কোটি দেশবাসীকে কে আহ্বান করিবে?

কংগ্রেস আজ স্বাধীনতার একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অংশটুকু মাত্র অর্জন করিয়াছে। কঠিন সাধনের পর্যায় এখনও আসে নাই। এই স্বাধীনতা অর্জন করিবার পথে অগ্রসর হইবার সময় কিছু কিছু পঙ্কিল ক্ষেত্র পার হইতে হইয়াছে, যার ফলে কিছু কিছু অসদাচরণ ঘটিয়াছে এবং কিছু কিছু জনসজ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা নামে মাত্র কেবল ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও জনমতের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। বস্তুতঃ তাহা ব্যক্তিস্বার্থের সহায়ক বলিয়াই গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। এই অবাঞ্ছনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এখন বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; উহাদের বিলোপ সাধনের পন্থা কী?

কংগ্রেসের যে বিশেষ রেজিস্টারে অনধিক এক কোটি সভ্যের নামের ফর্দ রহিয়াছে, যাহাদের অনেককেই হয়তো খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না—সেই রেজিস্টার বাতিল করিতে হইবে। আরও একটি অজ্ঞাত রেজিস্টারে কোটি কোটি লোকের নাম ছিল যাহাদের কখনও পাওয়া যাইত না। বর্তমানে কংগ্রেসের রেজিস্টারে তাহাদেরই নাম থাকা উচিত যাহাদের নাম দেশব্যাপী ভোটদাতার ফর্দে স্থান পাইবে। কংগ্রেসের কর্তব্য হইবে যেন কোন ভুয়া নাম রেজিস্টারে স্থান না পায়, আবার কোন প্রকৃত ভোটদাতার নাম যেন বাদ না পড়ে। কংগ্রেসের

নিজস্ব রেজিস্টারে তাহাদের নাম সেবকের ফর্দে যেন উল্লিখিত হয় যাঁরা সময়ে সময়ে বিশেষ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা পালন করেন।

আজ পর্যন্ত যে অবস্থা চলিতেছে তাহাতে এই সব সেবকদের শহর হইতেই সংগ্রহ করিয়া গ্রামে কাজ করাইতে হইবে। যতদূর সম্ভব গ্রামের কার্যক্ষেত্রে সেখানকার অধিবাসীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় নিয়োগ করাই সমীচীন হইবে।

এই সব কংগ্রেসসেবকদের কর্তব্য হইবে তাঁহাদের কর্মক্ষেত্রে যে সকল লোক বিধিমতে ভোটদাতা বলিয়া গণ্য হইবেন তাঁহাদের সেবা করা। অনেক ব্যক্তি, বহু দল গ্রামের ভোটদাতাদের ভোট প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইবে। যাঁরা যোগ্যতম তাঁহারাই ভোট পাইবেন। আজ কংগ্রেস যে প্রতিষ্ঠা হারাইতে চলিয়াছে তাহা পুনরুদ্ধারের অপর কোন পন্থা নাই। অতীতে কংগ্রেস ছিল দেশের সেবক—খুদাই খিদ্‌মত্‌গার বা ঈশ্বরের সেবক। আজ কংগ্রেস সেই আদর্শ মানিয়া লইয়া সেই ভূমিকায় কাজে অবতীর্ণ হইয়া ঘোষণা করুক যে তাহারা কেবল ঈশ্বরের সেবা করিবে—তার কম নয়, বেশীও নয়। আজ যদি কংগ্রেস ক্ষমতালোভের এই কুৎসিৎ দ্বন্দ্বে যোগ দেয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিলোপ অনিবার্য। ঈশ্বরের কৃপায় এই ক্ষেত্রে কংগ্রেস আজ একা নয়।

সুদূর ভবিষ্যতের ছবির কিছুটা অংশ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিলাম মাত্র। যদি সময় ও শক্তি থাকে তাহা হইলে কোন্ পথে চলিলে দেশের সেবক কংগ্রেস তাহার প্রভু ভারতবাসী, সকল পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিবে তাহা এই পত্রিকার স্তম্ভে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

[নিউ দিল্লী, ২৭-১-৪৮—হরিজন, ১-২-৪৮, ৪]

৫৪৭। [গান্ধীজীর লিখিত শেষ পত্র, যাহা ৩০শে জানুয়ারি প্রাতে কংগ্রেসের সেক্রেটারির হাতে দেওয়া হইয়াছিল।]

দ্বিধাবিভক্ত হইলেও, জাতীয় কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় ভারত আজ স্বাধীন হইয়াছে। এ যাবৎ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে প্রচার ও জনমত গঠনের কর্ম কংগ্রেস চালাইয়া আসিয়াছে তাহারও পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এখনও ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের (শহরের কথা স্বতন্ত্র) সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঘটানোর কাজ বাকী আছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অসামরিক শক্তি ক্রমে সামরিক শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিতে বাধ্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দলের সহিত গ্লানিকর প্রতিযোগিতা সর্বথা বর্জন করাই শ্রেয়। উপরিউক্ত এবং অন্যান্য অনুরূপ বহু কারণ বর্তমান থাকায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী বর্তমান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বাতিল করিয়া "লোকসেবক সঙ্ঘ" নামক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত হইবার প্রস্তাব গ্রহণ করুক। এই সঙ্ঘের সংবিধান নিম্নলিখিত রূপ হইবে, অবশ্য প্রয়োজনানুসারে রদবদল করিবার ক্ষমতা সঙ্ঘের থাকিবে।

গ্রামের অথবা গ্রামভাবনাবিশিষ্ট পাঁচজন স্ত্রী বা পুরুষের 'পঞ্চায়েত' হইবে গ্রামীণ ব্যবস্থার মূলাধার। পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি পঞ্চায়েত মিলাইয়া তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে নেতা নির্বাচিত করিয়া একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইবে। যখন পাশাপাশি এইরূপ একশত পঞ্চায়েতে পঞ্চাশ জন প্রাথমিক প্রধান নির্বাচিত হইবে তখন তাঁদের নেতৃত্বের জন্য তাঁরা দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন নেতা নির্বাচন করিবেন। এইরূপ প্রতি দুইশত পঞ্চায়েতের সমষ্টি গঠন করিবার জন্য পূর্বোক্ত নিয়মে দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতা নির্বাচন করিতে করিতে সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতারা একত্রে সর্বভারতের কার্য পরিচালনা করিবেন এবং সেই সঙ্গে নিজ নিজ ক্ষেত্রেরও সেবা করিবেন। প্রয়োজন ঘটিলে এবং ইচ্ছা থাকিলে ঐ দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতারা তাঁহাদের মধ্য হইতে

একজন প্রধান নির্বাচিত করিবেন, যিনি বিভিন্ন পঞ্চায়েতের সমন্বয় ঘটাইয়া সাধারণ কার্যপরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন।

যেহেতু এখনও পর্যন্ত প্রদেশ বা জেলার সীমানা চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই—এই সব দলগুলিকে প্রাদেশিক বা জিলা পরিষদের নাম দেওয়া গেল না—, যখন যেরূপ ব্যবস্থা বা নামকরণ হউক না কেন এই পঞ্চায়েত সঙ্ঘই সমগ্র ভারতের শাসনব্যবস্থা করিবার অধিকারী হইবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, এই সেবক সঙ্ঘের শাসনক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মূলে আছে তাহাদের প্রভু ভারতবাসীর প্রতি তাহাদের সুবুদ্ধিযুক্ত নিষ্ঠাময় সেবা।

(১) প্রত্যেক কর্মীকেই সতত নিজ হাতে কাটা অথবা সর্বভারতীয় কাটুনী সঙ্ঘের অনুমোদিত খাদি পরিধান করিতে হইবে। তাহাকে সর্বপ্রকার মাদক পরিহার করিতে হইবে। যদি তিনি হিন্দু হন তাহা হইলে নিজে ও স্বপরিবারে সর্বথা অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে হইবে। তিনি সাম্প্রদায়িক মৈত্রীতে বিশ্বাস করিবেন এবং সকল ধর্মকেই মান্য করিবেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে বা স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলের সমান মর্যাদা ও সুযোগ পাওয়া উচিত ইহা তিনি বিশ্বাস করিবেন।

(২) তাঁহার কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেকটি গ্রামবাসীর সহিত তিনি ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

(৩) তিনি গ্রামের লোকদের সংগঠিত করিয়া কর্মিদল গঠন করিবেন এবং এই কর্মিদলের একটি রেজিস্টার রাখিবেন।

(৪) তিনি তাঁর নিজের প্রাত্যহিক কাজের হিসাব রাখিবেন।

(৫) তাঁর কর্মক্ষেত্র গ্রামটিকে তিনি কৃষি ও কুটিরশিল্পের সাহায্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবেন।

(৬) গ্রামের লোকদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বাস্থ্য ও শুচিতা রক্ষা করিতে শিখাইবেন এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অস্বাস্থ্য ও রোগ নিবারণের সকল প্রচেষ্টা অবলম্বন করিবেন।

(৭) হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ কর্তৃক যে নববিধানের শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হইয়াছে তদনুসারে তিনি গ্রামের আবালবৃদ্ধের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইবেন।

(৮) গ্রামের কোন ব্যক্তির নাম যদি ভোটদাতাদের নামের ফর্দ হইতে বাদ পড়ে তাহা হইলে তাহার নাম যাহাতে নথিভুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

(৯) যাঁহারা তখনও সংবিধানানুযায়ী ভোট দিবার যোগ্যতা অর্জন করেন নাই তাঁহারা যাহাতে সেই যোগ্যতা লাভ করিয়া ভোটের অধিকার পান তার জন্য কর্মী সচেষ্ট হইবেন।

(১০) দেশসেবক সর্বদা নিজেকে উপরিউক্ত কাজের জন্য এবং লোকসেবক সঙ্ঘ ভবিষ্যতে যে সকল কর্মধারা স্থির করিবেন তাহার জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলার প্রয়াস করিতে থাকিবেন।

এই সঙ্ঘ নিম্নলিখিত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত পূর্ণসংযোগ সাধন করিবেন—

(ক) সর্বভারতীয় গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ

(খ) সর্বভারতীয় কাটুনী সঙ্ঘ

(গ) হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ

(ঘ) হরিজন সেবক সঙ্ঘ

(ঙ) গোসেবা সঙ্ঘ

আর্থিক ব্যবস্থা—গ্রামের লোক বা অন্য সহানুভূতিশীল ব্যক্তির নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া সঙ্ঘ এইসব কাজের ব্যয় নির্বাহ করিবেন। দরিদ্রের সামান্য দানের মর্যাদা যেন মনে থাকে।

[হরিজন, ৮-২-৪৮]

পঞ্চদশ পর্ব

সত্যাগ্রহ

৫৪৮। আমার স্বভাবের মূলে রহিয়াছে অহিংসা ; ইহারই প্রভাবে হিংসাবিহীন যুদ্ধে আমি বিশ্বাস করি।

[হরিজন, ১৪-৫-৩৮, ১১৫]

৫৪৯। আমার চলার পথের কোন বাঁধাধরা ছক নাই। সত্যাগ্রহের বিজ্ঞান সমগ্রভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া শেষ করিতে পারি নাই। আজও আমি অজানার অন্ধকারে হাতড়াইয়া চলিয়াছি। যদি এই সত্যের আহ্বান আপনাদের অন্তর স্পর্শ করে, আসুন, আমার সহিত এই গবেষণায় যোগ দিয়া সত্যকে প্রকট করুন।

[হরিজন, ২৭-৫-৩৯, ১৩৬]

নূতনের ডাক

৫৫০। জীবনে আগাইয়া যাইতে হইলে অতীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলে চলিবে না। আমাদের পূর্ববর্তিগণ যাহা করিয়াছেন তাহা তো আমরা পাইয়া গিয়াছি, নূতন কিছু সংগ্রহ করিয়া সে পিতৃধন বাড়াইয়া তোলাই আমাদের দায়িত্ব। বাহিরের জগতে আমরা নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটাইতেছি ; অন্তরলোকে নিত্য নব তত্ত্বের উদ্ভাবনে আমরা কি অক্ষম বলিয়া পরিচিত হইব? বহুক্ষেত্রে অন্তরের তাগিদ লক্ষ্য হয় না বটে, তাই বলিয়া অন্তর-লোকের প্রেরণা বিরল নয়। এ সত্য প্রমাণ করিতে বেশী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। মানুষকে মানুষ বলিয়া ভাবিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহাকে জন্তু বলিয়া ভাবা কি একান্ত প্রয়োজন? মানুষকে সরাসরি মনুষ্যজ্ঞানে বিচার করা কি যায় না?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৫-২৬, ১৬৪]

সত্যাগ্রহ কি ও তাহার পরিচয়

৫৫১। বিগত আট বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী যে প্রয়াস করিতেছে তাহাকে Passive Resistance বা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বলা যায় না। 'সত্যাগ্রহ' শব্দের প্রচলিত ভাষায় যে অর্থ হয় তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিলে অর্থ দাঁড়ায় "সত্যের শক্তি পরীক্ষা"। আমার মনে হয় টলস্টয়ও ইহাকে বলিয়াছেন 'আত্মিক শক্তি' বা 'প্রেম-শক্তি'—তাহাতেই বোধহয় ইহার সঠিক অর্থ প্রকাশ করে। এই শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটিলে ইহা আর আর্থিক বা অপর কোন বাস্তব সাহায্যের অপেক্ষা করিবে না। এই শক্তির প্রাথমিক বিকাশ ঘটিলেই আর বলপ্রয়োগ বা ভয় দেখানোর প্রয়োজন থাকে না। এই আত্মিক শক্তির সাধনে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত শক্তি হিংসাকে একান্তভাবে বর্জন করা প্রয়োজন। ব্যক্তি বা সম্মিলিত জনতা উভয়েই সমভাবে এ শক্তির প্রয়োগ ঘটাইতে পারে। পারিবারিক বা রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই এ শক্তি সমভাবে কাজ করে। সর্বক্ষেত্রে এ শক্তির প্রয়োগ সম্ভব করিয়া প্রমাণ করা যায় যে, ইহার ক্রিয়া চিরস্থায়ী এবং ইহা অপরাজেয়। স্ত্রী, পুরুষ বা শিশু সকলেই সমানভাবে এই শক্তির প্রয়োগ করিতে পারে। যদি কেহ বলে যে, যেখানে পশুবলকে পশুবল দিয়া প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে না সেখানেই দুর্বল পক্ষ এই শক্তির ব্যবহার করিয়া থাকে, এই যুক্তিতে কোন সত্যই প্রকাশ করা হয় না। ইংরেজী ভাষার অসম্পূর্ণতার জন্যই এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে দুর্বল মনে করে তার পক্ষে এই অধ্যাত্ম-শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ সার্থক করিতে পারে তাহারাই যাহারা উপলব্ধি করিয়াছে যে, মানুষের মধ্যে এমন শক্তি আছে যাহা তাহার জান্তব প্রকৃতির অনেক ঊর্ধ্বে থাকিয়া সেই প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতে পারে। আলোক যেমন অন্ধকারকে দূর করিয়া প্রকাশিত হয়, এই শক্তিও তেমনি সকল হিংসা সকল অত্যাচার

সকল অবিচার দূর করিয়া নিজেকে প্রকাশ করে। রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা চিরন্তনী সত্য যে, শাসন ততদিনই সম্ভব যতদিন শাসিতেরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শাসন মানিয়া চলে। এই সত্যের উপর ভিত্তি করিয়াই রাজনীতিক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ চলিতে পারে। ট্রান্সভালে ১৯০৭ সালে এসিয়াবাসীদের জন্য যে বিশেষ আইন রচিত হয় তাহা মানিতে অস্বীকার করিয়া এই সত্যাগ্রহের বিপুল শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তার ফলে সেই আইন বাতিল করিতে হইয়াছিল। আমাদের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা ছিল—ঐ আইনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করা, অথবা ঐ আইনের ধারামতে দেয় দণ্ড গ্রহণ করা। এই ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া যতদিন না শাসক ও আইনরচয়িতাদের অন্তরে সমবেদনা জাগ্রত করিতে পারা গিয়াছিল ততদিন পর্যন্ত আইন অনুসারে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অভীষ্ট লাভে বহু সময় লাগিয়াছিল কারণ আমাদের নির্বিরোধ প্রতিরোধ বিশুদ্ধ আকারে ঘটিতে পারে নাই। এই আত্মিক শক্তির পূর্ণ প্রভাব কি হইতে পারে তাহা সকল সত্যাগ্রহী উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার এমনও হইয়াছে যে, বহুলোক সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছে যাহারা স্বভাবতঃ অহিংসায় বিশ্বাস করে এমন বলা যায় না। সত্যাগ্রহের সাধনে দারিদ্র্য বরণ করিতে হয় অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কি হইবে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাই কর্তব্য হওয়া উচিত। এই সংগ্রামে যাঁরা যোগ দিয়াছিলেন তাঁদের সকলে এতদূর ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন কিনা সন্দেহ। হয়তো একজনও ছিলেন না। অনেকেই ছিলেন নামে মাত্র সত্যাগ্রহী, তাঁদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা ছিল না, তাঁহারা আসিয়াছিলেন নানা অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে, অবশ্য অসৎ উদ্দেশ্য লইয়া বেশী লোক আসে নাই। অতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি না রাখিলে হয়তো কেহ কেহ সংগ্রামক্ষেত্রে হিংস্র আচরণ করিতে দ্বিধা করিত না। এই সকল কারণে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। বিশুদ্ধ আত্মিক শক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগের সুফল ঘটে

অনতিবিলম্বে। এই কার্য সাধন করিতে হইলে সত্যাগ্রহীর দীর্ঘকালের সাধনা থাকা প্রয়োজন। ফলতঃ বলা যায় যে, পূর্ণ মানবতার অধিকারী না হইলে পূর্ণ সত্যাগ্রহী হওয়া যায় না—অন্ততঃ সেই লক্ষ্যে দীর্ঘকালের সাধন থাকিলে তবে যথার্থ সত্যাগ্রহী হওয়া সম্ভব। এই কারণে বলা যায় যে, প্রত্যেকটি লোকই সহসা মানবতার অধিকারী হইয়া উঠিতে পারে না; তবে যদি আমার যুক্তির মধ্যে সত্য থাকে (আছে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি), আমাদের মধ্যে সত্যাগ্রহের সাধন যত প্রবল হইবে ততই অধিকতর মানবতার অধিকারী আমরা হইব। এই কারণে আমার মতে সত্যাগ্রহের সুফল সম্বন্ধে দ্বিমত থাকা সম্ভব নয়। সত্যাগ্রহ এমন একটি শক্তি যাহা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিলে সমাজচিন্তায় বিপ্লব ঘটিবে, সর্বপ্রকার শোষণ ও দমন লোপ পাইবে; সর্বোপরি আজ যে সমরসজ্জার চাপে ইউরোপের জনসমাজ নিপীড়িত, মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, প্রাচ্যেও যার অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, সেই যুদ্ধবাদের অবসান ঘটাইতে পারে এই সত্যাগ্রহের সাধন। আমাদের বিগত সংগ্রামের ফলে যদি ভারতে এমন অল্প কয়েকজনও গড়িয়া উঠিয়া থাকেন যাঁহারা যতদূর সম্ভব নিজেকে অহিংস প্রতিরোধের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার পণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারাই প্রকৃত সেবাকার্যের অধিকারী হইয়া শুধু নিজের কর্তব্য সাধন করিবেন না—সমগ্র মনুষ্যজাতির সেবা করিতে সক্ষম হইবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে বুঝা যায়, অহিংস প্রতিরোধের চর্চাই সর্বোত্তম ও মহত্তম শিক্ষা। বালক-বালিকাদের সাধারণ শিক্ষার পর এই শিক্ষা হওয়া উচিত এ যুক্তিও ঠিক নয়—এই চর্চার জন্যই সাধারণ শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান করা উচিত। এই সত্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অক্ষরজ্ঞান অর্জন করিয়া নানা বিষয়ে জানার পূর্বেই শিশুকে বুঝিয়া লইতে হয় আত্মা কি, সত্য কাহাকে বলে, প্রেমের প্রকৃতি কেমন, আমাদের অন্তরের

গোপনে কোন্ পরমাশক্তি লুকাইয়া থাকিয়া কাজ করিতেছে। শিশুকে যথার্থ শিক্ষা দিতে হইলে তাহাকে জীবনসংগ্রামের তত্ত্ব শিখাইতে হইবে, তাহাকে বুঝিতে হইবে যে প্রেমের শক্তিতে বিদ্বেষকে সহজে জয় করা যায়, অসত্যকে সত্য দ্বারা, হিংসাকে দুঃখ-বরণের দ্বারা জয় করাই সহজ। এই সত্য উপলব্ধি করার পর, আমার আফ্রিকার সংগ্রামের শেষের দিকে—টলস্টয় ফার্ম ও ফিনিক্স ফার্মে—শিশুদের এইমত শিক্ষা দিবার যতটা সম্ভব চেষ্টা আমি করিয়াছি। অহিংস প্রতিরোধের সাধক হিসাবে আমার অপরিপক্বতার ত্রুটি আমি বেশ ভালো করিয়া জানি বলিয়াই আমি ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছি। এখানেই রহিয়াছে আমার সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং আমি জানি যে পূর্ণ দক্ষতা লাভের জন্য আমার দেশ এই ভারতেই কাজ করা প্রয়োজন।

[স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অব মহাত্মা গান্ধী, নটেশন—১৮৯]

৫৫২। এ কথা কেহ যেন মনে না করেন যে, কেবল তাঁহারাই অহিংস সৈন্যের দলে যোগ দিতে পারেন যাঁহারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ অহিংসার সাধনে সফল হইয়াছেন। যাঁহারা অহিংসা-ধর্মে বিশ্বাসী হইয়া সেই সাধনে সার্থক হইবার প্রয়াস করিতেছেন তাঁহারা সকলেই এই অহিংস সংগ্রামে যোগ দিতে পারেন। এ সংসারে কোনদিনই এমন সৈন্যদল গঠন করা যাইবে না, যার প্রত্যেকটি ব্যক্তি অহিংসার সাধনে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। চিরদিনই এই দলে এমন লোক থাকিবে যাঁরা অহিংসায় বিশ্বাসী হইয়া সেই আদর্শের সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

[হরিজন, ২১-৭-৪০, ২১৪]

৫৫৪। সত্যাগ্রহার ভরসাস্থল আইনের উর্ধ্বে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, সত্যাগ্রহী আইন বা তথানিযুক্ত কর্তৃপক্ষের

নির্দেশের বিরুদ্ধে চলিতেছে কিন্তু ফলে দেখা যায় সত্যাগ্রহী উভয়কেই মান্য করিয়া চলিয়াছে।

[স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অব মহাত্মা গান্ধী, নটেশন—৩০২]

সত্যাগ্রহী উচ্চতর নীতির অনুগামী

৫৫৫। রাজার আইন যখন ভগবানের আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে তখন সত্যাগ্রহীর কর্তব্য সেই আইন অমান্য করা।

[গান্ধীজী প্রণীত নীতিধর্ম—৪৫]

হিংসার স্থান নাই

৫৫৬। অহিংস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সর্বদাই বিপক্ষ পক্ষকে অসুবিধায় ফেলিবার মনোভাব থাকিয়া যায়; অবশ্য সেই সঙ্গে সহিংস প্রচেষ্টার ফলে যে দুঃখ আসিতে পারে তাহা বহন করিবার জন্য প্রস্তুতিও চলিতে থাকে। সত্যাগ্রহী কোনরকমেই বিপক্ষ পক্ষের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন করিতে চাহে না। সত্যাগ্রহী কেবল নিজে দুঃখ বরণ করিয়া বিপক্ষ পক্ষের হৃদয় জয় করিতে চাহে।

[আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—১৭৯]

হিংসা নয়, প্রেম অহিংসার মূল প্রেরণা

৫৫৭। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ কেবল প্রতিরোধেই সীমিত, তার মধ্যে প্রেমের শক্তিতে কিছু গড়িয়া তোলার প্রয়াস নাই। সত্যাগ্রহ সেই প্রেমের প্রেরণায় পরিচালিত যে প্রেম বলে, "যে তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া খাটাইয়া লয় তাহাকেও ভালোবাসো। যে তোমাকে ভালোবাসে তাহাকে ভালোবাসা সহজ কিন্তু যে তোমার শত্রুতা করে তাহাকেও ভালোবাসিতে হইবে।"

[হরিজন, ১৪-৫-৩৮, ১১১]

৫৬১। সত্যাগ্রহী কখনও দুষ্কৃতকারীকে অসুবিধায় ফেলিতে চাহে না। কাহাকেও ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় করা সত্যাগ্রহের ধর্ম নয়, অন্যায়কারীর হৃদয় জয় করাই সত্যাগ্রহের লক্ষ্য। জোর করিয়া কিছু করানো সত্যাগ্রহ চাহে না—হৃদয় পরিবর্তনই তাহার কাম্য। লোকদেখানো ভালো কাজ সত্যাগ্রহী করে না; সত্যাগ্রহী তার অন্তরের গভীরতম বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সরলভাবে চলিতে চাহে।

[হরিজন, ২৫-৩-৩৯, ৬৪]

বিপক্ষের প্রতি সঠিক মনোভাব

৫৬২। গ্লানিকর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই সত্যাগ্রহীর ধর্ম কিন্তু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধতা করা সত্যাগ্রহীর অনুচিত, ইহা অধর্ম। আমাদের প্রত্যেকেরই বহু দোষ বহু ত্রুটি আছে, তাই অন্যের দোষ সম্বন্ধে উদারভাবে বিচার করিয়া তাহার মনে মন্দ অভিসন্ধি আছে এরূপ মনে করার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

[হরিজন, ২৫-৫-২১, ১৫৪]

৫৬৩। বিপক্ষ পক্ষ যে মনোভাব লইয়া কোন-কিছুর বিচার করেন সেই মনোভাব লইয়া কোন-কিছু বুঝিতে পারিলে তবে বিপক্ষের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব। নিরপেক্ষ বিচারক্ষমতা থাকিলে তবেই এইরূপ করা যায়; এইরূপ বিচারক্ষমতা অর্জন করা বেশ আয়াসসাধ্য তবুও সত্যাগ্রহীর কর্তব্য পালন করিতে হইলে ঐ দুষ্কর কাজ করিতেই হইবে। যদি বিপক্ষ পক্ষের স্থানে নিজেকে বসাইয়া তাহার মনোভাব বুঝিতে সক্ষম হই তাহা হইলে আমাদের যত নালিশ যত দুঃখ তাহার তিন-চতুর্থাংশ স্বতঃই লোপ পাইবে। বিপক্ষ পক্ষ যে ভুল করিতেছেন তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে সেই ভুল বুঝাইয়া

দেওয়াই হইবে সত্যাগ্রহীর কাজ—সে কাজ কেবল দুঃখ বরণ করিয়াই করা যায়। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি যে, যেখানে অনাচার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং উহা কল্পিত ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা সমর্থিত, সেখানে কেবল যুক্তিপ্রয়োগে কাজ হয় না, সে ক্ষেত্রে একমাত্র দুঃখবরণের দ্বারাই কাজ হইতে পারে। যুক্তিকে দুঃখবরণের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় এবং দুঃখের শক্তিতে যুক্তির পথ সহজ হইয়া যায়। আমাদের চেষ্টায় বাধ্য করার মনোভাব থাকিলে চলিবে না, সত্যাগ্রহীর অধীর হওয়া উচিত নয়, নিজের কাজে অখণ্ড বিশ্বাস ও ধৈর্য লইয়া সত্যাগ্রহীকে অগ্রসর হইতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-৩-২৫, ৯৫]

৫৬৫। অহিংস সংগ্রামের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে স্থাপিত হয় বন্ধুত্ব; বিপক্ষের অবমাননা করা তো দূরের কথা, কেহ কাহাকেও বাধ্য করিতেও চাহিবে না।

[হরিজন, ২৩-৩-৪০, ৫৩]

৫৬৬। সত্যাগ্রহী সকল ভয় পরিহার করে, তাই সে বিপক্ষ পক্ষকে বিশ্বাস করিতে ভয় পায় না। বিপক্ষ পক্ষ যদি বিংশতি বার তাহাকে প্রবঞ্চনা করে তবুও একবিংশতি বারেও সে তাহাকে বিশ্বাস করিবে। সত্যাগ্রহ ধর্মের মূলে আছে মানবচরিত্রে বিশ্বাস।

[আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—২৪৬]

কিসের উপর সত্যাগ্রহের সফলতা নির্ভর করে?

৫৭২। (১) সত্যাগ্রহীরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিবে।

(২) নেতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকা চাই; এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় থাকা উচিত নয়।

(৩) সত্যাগ্রহী সর্বদা সর্বস্ব খোয়াইতে প্রস্তুত থাকিবে। কেবল

তাহার নিজের ধনসম্পত্তি ও স্বাধীনতা চলিয়া যাইতে পারে এমন নয়, তাহার পরিবারের সকলের ধনসম্পত্তি নষ্ট হইতে পারে। সত্যাগ্রহী সানন্দে বন্দুক ও বেয়নেটের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত থাকিবে, এমনকি দীর্ঘকাল কঠোর যন্ত্রণা পাইয়া মরিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না।

(৪) কি বিপক্ষ পক্ষ, কি সহকর্মী, কাহারও প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করা সত্যাগ্রহীর পক্ষে অধর্ম।

[হরিজন, ২২-১০-৩৮, ২৯৮]

৫৭৩। আইন অমান্য করিতে দুইটি সর্ত পূরণ করিতে হয়। আইন যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, বিবেক ও ধর্মকে যদি তাহা আঘাত না করে তাহা মানিয়া চলা উচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আইন অমান্য করার বিধিমত শাস্তি গ্রহণ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অহিংসাই আইন অমান্যের প্রাণ-স্বরূপ; কারণ মূল উদ্দেশ্য হইল দুঃখ বরণ করিয়া অর্থাৎ প্রেমের শক্তিতে বিপক্ষ পক্ষের হৃদয় জয় করা এবং তাহাকে স্বমতে আনা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১১-২১, ৩৪৬]

ব্যক্তি-স্বাধীনতার সাধনাই সত্যাগ্রহীর মূল প্রেরণা

৫৭৪। যে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রেরণা লইয়াই জন্মায় তাহার আচরণে সংযমের সাধনা সহজাত প্রবৃত্তি হইয়া ফুটিয়া ওঠে। যে ব্যক্তি মানুষ বা ভগবানের নিয়ম মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হয়, স্বাধীনতার সাধনাও তাহার কাছে সহজ বলিয়া মনে হয়। সংস্কার এবং শিক্ষা উভয় দিক হইতে আমি নিজেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদী বলিয়া মনে করি। যাঁহারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সাধনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা রাখেন, সংযমের কষ্টিপাথরে তাঁহাদের সাধনের পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। তদুপরি স্বাধীনতার সাধকের লেশমাত্র স্বার্থপরতা থাকা উচিত নয়।

তাঁর ধ্যানে নিজের বা দলের স্বার্থের চিহ্নও যেন না থাকে—সর্বপ্রযত্নে স্বাধীনতার ধ্যান করাই তাঁর একমাত্র করণীয়। এরূপ অবস্থায় আসিতে পারিলে তবেই তিনি আইন অমান্য করিবার অধিকার লাভ করিবেন। কেহ নিজের বিশ্বাসমত না চলিয়া নিজেকে জোর করিয়া দমাইয়া অন্যের মতে চলুক, এমন আমি কখনও কামনা করি না। যদি প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাসমত চলে তাহা হইলে মতপার্থক্য ঘটিতে পারে কিন্তু তাহাতে আমাদের লক্ষ্যের কোন অন্তরায় সৃষ্টি হইবে না। বরঞ্চ সুবিধা বুঝিয়া চলিলে বা ছলনার পথ অবলম্বন করিলে কিংবা বাহ্য একতার জন্য জোড়াতাড়া দিয়া চলার চেষ্টা করিলে সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করা হইবে। যদি অন্য মত প্রকাশ করিতেই হয়, সেক্ষেত্রে দলগত স্বার্থের খাতিরে কিছু না বলিয়া নিজের অন্তরের গভীরতম সরল বিশ্বাসের বলে নিজ মত প্রকাশ করা উচিত।

ব্যক্তির স্বাধীনতাকে আমি মূল্যবান মনে করি কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষ সামাজিক জীব—বহুদিন ধরিয়া তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সামাজিক অগ্রগতির আদর্শের দ্বারা সীমিত করিয়া চলিয়া মানুষ তাহার বর্তমান উন্নত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিয়াছে। বাধা-বন্ধহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবাধ প্রকাশ ঘটিতে পারে অরণ্যে। বহু অভিজ্ঞতায় মানুষ শিখিয়াছে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সমাজকল্যাণের বিচার দ্বারা সীমিত করিতে। মানুষ বুঝিয়াছে যে, যেটুকু সংযম সে অবলম্বন করে তাহাতে সমাজের মঙ্গল হয়, সেই সঙ্গে সমাজের অঙ্গ ব্যক্তিও সার্থকতা লাভ করে।

[হরিজন, ২৭-৫-৩৯, ১৩৬, ১৪৪]

আইন অমান্যের অধিকার

৫৭৬। সরকার যত কিছু আইনের বাধ্যবাধকতা প্রজাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে তাহার সব কিছুই মানিয়া চলা দেশবাসীর কর্তব্য এমন

মনে হয় না। যদি আমার দেশবাসীরা হৃদিস্থিত আত্মাকে এবং পরমাত্মা ঈশ্বরকে মানিয়া চলিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে ইহাও মানিতে হয় যে, আমাদের দেহ সরকারের হুকুমে চলিতে বাধ্য হইতে পারে যেহেতু সেই দেহকে কারারুদ্ধ করিতে পারা যায়, অন্তরীণাবদ্ধ করাও যায়; কিন্তু আমাদের মন, আমাদের ইচ্ছাশক্তি, আমাদের আত্মা চিরস্বাধীন, যেমন স্বাধীন আকাশের পাখী—অতিক্রুতগামী সায়কও তাহার নাগাল পায় না।

[স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অব মহাত্মা গান্ধী, নটেশন—৩০৬]

৫৭৮। পূর্ণ আইন অমান্য করা হিংসাবর্জিত বিপ্লবের তুল্য। যিনি পুরাপুরি অহিংস প্রতিরোধ সাধন করিতে চাহিবেন তিনি সরকারের আইন অমান্য করিয়াই চলিবেন। ফলে প্রতিটি ধর্ম-হানিকর আইনের প্রতিবাদ করার জন্য আইনের সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে বেআইনী জীবন যাপন করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, তিনি রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিতে পারেন এবং নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্মে সরকারের ক্ষমতা অমান্য করিয়া চলিতে পারেন। যাতায়াতের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তিনি সেনা-নিবাসের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন এবং সৈনিকদের মধ্যে সরকার-বিরোধী প্রচারকার্য চালাইতে পারেন। পিকেটিং সম্বন্ধে বাধানিষেধ অমান্য করিয়া তিনি নিষিদ্ধ স্থানে গিয়ে পিকেটিং চালাইতে পারেন। এই প্রকার কাজ করার সময় তিনি বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে পাল্টা বলপ্রয়োগ করিবার চেষ্টা করেন না বরঞ্চ বন্দী হওয়া বা ঐরূপ অপর কোন শারীরিক শাস্তি ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই অগ্রসর হন। যেটুকু দৈহিক স্বাধীনতা তিনি ভোগ করেন তাহা অসহনীয় বোঝা বলিয়া তাঁহার কাছে প্রতীয়মান হয়। তিনি মনে করেন যে, প্রজারা যে পরিমাণে সরকারের আইন মানিয়া চলে সেই পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগই তাহাদের প্রাপ্য। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য দিতে

হয় রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া। যদি রাষ্ট্রের আইন সর্বতোভাবে অথবা প্রধানতঃ নীতিবিরোধী হয় তবে তাহা মানিয়া চলিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করা অধর্মাচরণের সমতুল্য হয়। যদি কোন দেশবাসী রাষ্ট্রের দুর্নীতি উপলব্ধি করিয়া রাষ্ট্রের অনুগ্রহ ভোগ করিতে রাজী না হন তাহা হইলে অপর যাহারা রাষ্ট্রানুগত্যের জোরে শান্তিতে বাঁচিতে চাহে তাহাদের চোখে তিনি শান্তিভঙ্গের হেতু হইয়া দাঁড়ান; কারণ কোন দুর্নীতির আশ্রয় না পাইয়া বিদ্রোহী ব্যক্তি সর্বদা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের দ্বারা কারাবরণ করিতে সচেষ্ট থাকেন। এইভাবে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা রাষ্ট্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানবচিত্তের প্রবলতম প্রতিবাদ প্রকাশ করা যায়; যার ফলে রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে তৎকালে জনসাধারণের চক্ষে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইলেও দুর্নীতির সহিত সংযুক্ত অনেক নিরীহ প্রতীককে বিদ্রোহী ব্যক্তিরা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-১১-২১, ৩৬২]

সহকর্মীদের মধ্যে মতভেদ

৫৭৯। কেহ কেহ মনে করেন যে, কেবল তাঁহাদের মতই একমাত্র শ্রেয়, যাঁহারা তাঁহাদের মতে সায় দিতে পারেন না তাঁহারা দেশের শত্রু। এ রকম মনে করা একটি খারাপ অভ্যাস।

[হিন্দ্ স্বরাজ—৪]

সত্যাগ্রহে জোর করিয়া কিছু করানো যায় না

৫৮২। আমাদের সংগ্রামে বলপ্রয়োগে কিছু করানো আদৌ চলিতে পারে না। যদি আমরা কয়েকজন মাত্র সেবক স্বেচ্ছায় অসহযোগের সাধনে অন্যের মত পরিবর্তনের প্রয়াসে নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি তাহা হইলে সত্যধর্ম পালন করা হইল বলিয়া মনে

করা যায়। যদি আমরা বলপ্রয়োগে আমাদের দলে লোক সংগ্রহ করি তাহা হইলে আমরা সত্যকে হারাইব, ঈশ্বরকেও হারাইব। এরূপ ঘটিলে আমাদের সাময়িক অগ্রগতি হইতেছে মনে হইলেও বস্তুতঃ আমরা ভয়ানকের রাজত্ব স্থাপন করিব। যদি পরমত সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা বিরোধ ঘটাই তাহা হইলেও আমরা সাধনভ্রষ্ট হইব। কারণ তাহা হইলে কে আমাদের সঙ্গে চলিতে চায়, কে বা চায় না, তাহা আর বুঝার উপায় থাকিবে না। এই কারণে একমাত্র সত্য পথ হইল, প্রত্যেকের নিজস্ব মত প্রকাশ করিবার অধিকার স্বীকার করা। আমাদের বর্তমান শাসকদের কার্যে আমরা এই শিক্ষা খুব কমই পাই। তাঁহাদের দণ্ডবিধিতে বিরোধীমতাবলম্বীদিগের কঠোর সাজার ব্যবস্থা আছে, যে আইনের বলে আমাদের দেশের বহু মাননীয় ব্যক্তিকে নিজের মত প্রকাশের অপরাধে জেলে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা আমরা এই অন্যায়ের ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছি। অপরের মত চাপিয়া রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে গিয়া আমরা নিজেরাই যেন অন্যের মত প্রকাশের অধিকার নষ্ট না করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-১০-২১, ৩৪২]

জনসাধারণ অহিংসার পথে চলিতে পারিবে কি?

৫৮৫। প্রশ্ন—আমাদের দেশের লোক সামান্য বিষয় লইয়া সর্বদা বিবাদ-বিসংবাদ করিয়া থাকে। তাহারা সর্বদা ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্বেষের বশে চলিতে অভ্যস্ত। আপনি কোন্ বিচারে মনে করিতেছেন যে, এই জনতা অহিংসা মানিয়া চলিতে পারিবে?

উত্তর—আমাদের দেশের লোকের এই দোষ আছে তাহা আমি স্বীকার করি। তবুও আমি বিশ্বাস করি, সকলের কল্যাণের জন্য তাহারা অহিংসার সাধন করিতে পারিবে। যে শত সহস্র স্ত্রীলোক বেআইনী লবণ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহারা কাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ

পোষণ করিত? তাহারা কেবল বুঝিয়াছিল যে কংগ্রেস বা গান্ধী তাহাদিগকে এই কাজ করিতে বলিতেছে, তাই তাহারা মনে বিশ্বাস ও আশা লইয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। আমার ধারণামতে অহিংসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঘটিয়াছিল চম্পারণে। সেখানে সহস্র সহস্র কৃষক তাহাদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল, অথচ গভর্নমেণ্ট বা নীলকরদের প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। অহিংসার সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা বিশেষ স্পষ্ট ছিল না, যেমন পৃথিবী যে গোল তাহা অনেকেই অস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে মাত্র। কিন্তু তাহাদের নেতাদের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস ছিল অকুণ্ঠ ও দৃঢ়; সেই জোরেই প্রতিরোধ সফল হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এই প্রতিরোধ পরিচালনা করেন তাঁহাদের ধারণা এত অস্পষ্ট হইলে চলিবে না। তাঁহাদের কর্মপন্থা বিচারের উপর স্থাপিত হওয়া চাই এবং তাঁহাদের প্রতি কর্মে তাঁহাদের অন্তরের গভীর বিশ্বাস যেন ফুটিয়া ওঠে।

প্রশ্ন—কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ মানুষ এইরূপই নয় কি?

উত্তর—না, তা নয়। আমাদের দেশের অতীত এই অহিংসার পথ সহজ করিয়াছে, অন্যত্র তাহা নয়।

প্রশ্ন—যদি অহিংসা আমাদের দেশের লোকের মজ্জাগত সংস্কার হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহারা এই দাসত্বের অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল?

উত্তর—এই সমস্যার সমাধানই হইবে আমার কাজ—এ কথা বলিতে সংকোচ বোধ করিলেও বলিতে পারি যে ইহাই আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমাদের দেশের দুর্বলের অহিংসাকে আমি বীরের ধর্মাচরণে পরিবর্তিত করিতে চাই। হয়তো ইহা স্বপ্ন, কিন্তু এই স্বপ্নকে সফল করাই আমার জীবনের আদর্শ।

[হরিজন, ৪-১১-৩৯, ৩৩২]

গণ-আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ

৫৮৭। সত্যাগ্রহে কত বেশী লোক যোগ দেয় তাহা বিচার্য বিষয় নয়, কি পরিমাণ সত্যনিষ্ঠা আছে তাহাই বিচারের বিষয়—বিশেষতঃ আজ যখন হিংসাশক্তিই সকল কর্তৃত্ব দখল করিয়া বসিয়াছে।

[হরিজন, ২৫-৩-৩৯, ৬৪]

৫৮৮। যেহেতু সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি সেই কারণে সত্যাগ্রহীকে অন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা পরীক্ষা করিয়া তারপর সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ সকলের নিকট নিজ ধারণা ও মত শান্তভাবে ব্যক্ত করিয়া জনমত গঠন করিতে হইবে, ক্ষমতাশীল কর্তৃপক্ষের নিকট সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন আবেদন জানাইতে হইবে। এইরূপ করার পরও জনমত ও কর্তৃপক্ষকে স্বমতে আনিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইলে তখন সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন হইতে পারে। যখন অন্তরের প্রেরণা সকল প্রচেষ্টার পর সত্যাগ্রহের পথে আসিয়া পৌঁছিল তখন আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না, জীবন পণ করিয়া এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১০-২৭, ৩৫৩]

৫৯২। যেহেতু ভূস্বামীরা দেয় রাজস্ব না দেওয়ার আন্দোলনে সহজেই যোগ দিতে চায় এই কারণে সহসা এই পথ অবলম্বন করা উচিত নয়। কারণ এই আন্দোলন হিংসাবর্জিত সদাচারের পথে না চলিয়া হিংসামূলক অসদাচারে পরিণত হইবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। যখন চাষীরা কর-বন্ধ আন্দোলনের তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তাহাদের জমি ও গবাদি পশু এবং অন্যান্য সম্পত্তি আইনের বলে বাজেয়াপ্ত হইলেও শান্তভাবে সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে কেবল তখনই তাহারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়া কর না দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১-২২, ৫৭]

৫৯৪। স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ ও সহনের সুনির্দিষ্ট সীমা আছে। দুঃখ সহ্য করার ফল ভালো ও মন্দ দুইই হইতে পারে। যতখানি উচিত তার বেশী দুঃখ সহ্য করার চেষ্টা করিলে শুধু বোকামি হইয়া দাঁড়ায় না, চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতায় পরিণত হইতে পারে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৩-৩১, ৩০]

৫৯৫। সত্যাগ্রহীর সময়ের পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় না, তাহার সহ্যশক্তিরও অন্ত থাকে না, তাই সত্যাগ্রহে পরাজয় স্বীকার করিবার প্রশ্নই ওঠে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-২-২৫, ৬১]

৫৯৭। সত্যাগ্রহী যখন কারাবরণ করে তখন সে শাসকবর্গকে কোন অসুবিধায় ফেলার বাসনা পোষণ করে না। সত্যাগ্রহীর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে নিজের আচরণের দ্বারা নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করা। সত্যাগ্রহীর পক্ষে অপরিহার্য এই যোগ্যতা অর্জন না করিয়া যদি কেহ কারাবরণ করে তাহার ফল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

[হরিজন, ৫-১১-৩৮, ৩১৫]

সত্যাগ্রহীর প্রতি

৫৯৮। সত্যাগ্রহ কেবল দুঃখ বরণ করার ক্ষমতা হইতেই শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে ; যাহারা দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত তাহারাই এই সংগ্রামে যোগ দিতে পারে। এমন ঘটনাও হইতে পারে যেক্ষেত্রে জনসাধারণ সত্যাগ্রহীর প্রতি সমভাবনা প্রকাশ করিবার জন্য সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করিলে অন্যায় হয় না। সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য, দুষ্কৃতকারীর হৃদয় পরিবর্তন করিয়া সেই সঙ্গে তাহার বিচার পরিবর্তনের দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যে, যাহার সে ক্ষতি করে তাহার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ যোগ ব্যতিরেকে সে অন্যায়ও সংঘটিত করিতে পারে না। যে পর্যন্ত অত্যাচারিত ব্যক্তিরা দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত

না হয়, বাহির হইতে যত সাহায্যই করা হউক তাহাদের দুঃখ ঘুচিতে পারে না।

[হরিজন, ১০-১২-৩৮, ৩৬৯]

৫৯৯। যে-কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে তাহার সভ্যগণের, বিশেষতঃ কর্মকর্তাগণের, একান্ত নিষ্ঠার সহিত প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া চলা উচিত—যত বাধাই আসুক না কেন একচুল পথভ্রষ্ট হওয়া চলিবে না। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে লৌহদৃঢ় নিষ্ঠা প্রয়োজন। যাঁহারা অন্যরূপ চিন্তা করেন তাঁহাদের বুঝিয়া দেখিতে বলিব যে, আমরা যাহাদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছি তাহারা প্রত্যেকেই কর্মক্ষম, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, সৎসাহসী, সর্বোপরি নিয়মনিষ্ঠায় একান্ত অভ্যস্ত।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৮-২৪, ২৮৫]

৬০১। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমার অহিংসা-ধর্মে পূর্ণ-বিশ্বাসীর সংখ্যা নগণ্য। তবে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি যে, আমি স্পষ্টই বলিয়াছি এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য অহিংসা-ধর্মে পূর্ণ বা আংশিক বিশ্বাসীর কোনই প্রয়োজন নাই। যে সকল অহিংস কর্মধারা অনুসরণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয় জনসাধারণ তাহা পালন করিলেই যথেষ্ট হইবে।

[গান্ধী-পত্রাবলী, ১৬৯]

সংযমের শিক্ষা

৬০২। যে সংযম কেবল বাহিরের চাপে ঘটে না পরন্তু যাহার প্রেরণা অন্তরের গভীর হইতে স্বতঃই উৎসারিত হয়, সেই সংযমের অভ্যাস না হইলে অহিংস সংগ্রামের দ্বারা এই চল্লিশ কোটি লোকের স্বাধীনতা আসিতে পারে না। পর্যাপ্ত সংযম অভ্যাস করিতে না পারিলে অহিংসা কেবলমাত্র অছিলায় পরিণত হইবে।

[হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৬-৮-৪৪]

প্রচার ও সত্যাগ্রহ

৬০৩। আমি মনে করি আমাদের এই সংগ্রাম, যাহা প্রধানতঃ জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে, তাহা সংবাদপত্রের সহায়তা ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। আমার এই অভিজ্ঞতাও হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের সময়ে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজের মারফৎ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মধ্যে জনমত গঠন এবং সারা পৃথিবীতে সেখানকার ঘটনাবলী প্রচার না করিতে পারিলে এত অল্পায়াসে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইত না। ইহাতে বুঝা যায়, সংবাদপত্রটি সেই আন্দোলনে বিশেষ সহায়ক ও কার্যকর হইয়াছিল।

[দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ২১১]

৬০৪। সরকার যে-কোন দিন অসহযোগীদের জন্য টেলিগ্রাফ, ডাক ও রেল এবং সংবাদপত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারে। ইহাতে কি আন্দোলন বন্ধ হইয়া যাইবে? এরূপ হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। যেভাবে এই আন্দোলন রচনা করা হইয়াছে তাহাতে সরকারের অপেক্ষা রাখিয়া চলিবার প্রয়োজন নাই। জনসাধারণের সহায়তাই এ আন্দোলনের প্রধান ভরসা। এমনও হইতে পারে যে, মাত্র কয়েকজন লোক অসহযোগ আন্দোলন করিবে—তাহা হইলে তাহার কর্মপন্থাও তদুপযুক্ত বিশেষ আকার গ্রহণ করিবে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যখন সারা ভারতের লোক এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, এখন আর আমাদের টেলিগ্রাফ, ডাক, রেল বা সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নাই। এইগুলির সহায়তা ব্যতিরেকেই আমাদের কাজ বেশ ভালোভাবে সাধিত হইতে পারে। লোকের মুখে মুখে অতি দ্রুতবেগে সংবাদ পাঠানো সম্ভব। রেলের সাহায্যে নেতারা বিভিন্ন স্থানে তাড়াতাড়ি চলিতে পারিতেছেন—কিন্তু সেই সঙ্গে হুজুগপ্রেমী বহুলোক ছুটিয়া বেড়াইয়া কাজে বাধা ও দেশের অপচয় ঘটাইতেছে। যদি সরকার

এমন ব্যবস্থা করে যে সরকারের সহযোগী ছাড়া অপর কেহ রেলে চড়িতে পারিবে না, তাহাতে একটা সুবিধা হইবে, দেশে কত লোক সরকারের পক্ষে আছে তাহা যাচাই হইয়া যাইবে। এরকম সম্ভাবনা বেশ শান্তভাবেই কল্পনা করিতে পারা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাতে কাগজ কলম আছে, এমনকি যদি শ্লেট পেন্‌সিলও থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনের কথা লিখিয়া ফেলার কোন বাধা নাই। অবশ্য এ কাজে যথেষ্টসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হইবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খুব মূল্যবান বলিয়া মনে করা হয়। ছাপা সংবাদপত্রের বিশেষ সুবিধা আছে ইহা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। কিন্তু ১৯১৯ সালে সত্যাগ্রহের সময়ে প্রমাণ হইয়াছে যে, হাতে লিখিয়া সংবাদপত্র চালানো যায়। লিখিবার জন্য যদি যথেষ্টসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যায় তাহা হইলে লিখিত সংবাদপত্রের পর্যাপ্তসংখ্যক নকল লিখিয়া ফেলা যায়। কেবলমাত্র কলমের ভরসায় চলিতে পারিলে অসহযোগীদের বহু উপকার সাধিত হইবে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৩-২১, ৭৩]

নেতৃত্বের ভূমিকা

৬০৫। সত্যাগ্রহ সংগ্রামের মূলধন হইল চরিত্রশক্তি।

[দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ২১৮]

৬০৬। সংগ্রামের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে সৈনিকের চরিত্র পবিত্র হওয়া চাই।

[দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ২১৮]

৬০৭। যদি জনতার স্বেচ্ছাচার এড়াইয়া দেশের সুশৃঙ্খল অগ্রগতির জন্য কাজ করিতে হয় তাহা হইলে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া জনতার বশে চলিতে অস্বীকার করিয়া নিজ নেতৃত্বে জনতাকে পরিচালিত করিতে হইবে। নিজের স্বতন্ত্র মতটুকু প্রকাশ মাত্র

করিয়া জনতার বশে চলিলেই যথেষ্ট হইবে না, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যদি প্রয়োজন মনে হয় জনতার মতের বিরুদ্ধেই চলিতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-৭-২০]

৬০৯। তিনিই যোগ্য সেনাপতি, যিনি নিজের সুবিধামত স্থানে অনুকূল সময়ে যুদ্ধ ঘটাইতে পারেন। স্থান কাল ইত্যাদি নির্ণয়ের অধিকার শত্রুপক্ষের হাতে না দিয়া নিজের দখলে রাখাই সেনাপতির দক্ষতার লক্ষণ।

সত্যাগ্রহ সংগ্রামে কখনও অগ্রসর হইতে হইবে কখনও বা পিছাইয়া আসা উচিত হইবে, কখনও অহিংস প্রতিরোধের বাধা সৃষ্টি করিতে হইবে, কখনও বা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে অহিংসার শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। কখনও বা নিছক মনুষ্যপ্রেমের প্রেরণায় নিঃস্বার্থ সেবাকার্য চালাইয়া যাইতে হইবে। এইসব কর্মধারা অবস্থা-বিশেষে পরিবর্তন করিয়া সংগ্রামের কৌশল ও প্রকৃতি বদলাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বিশেষ অবস্থায় একবার ধারা নির্ণয় হইয়া গেলে সকল উত্তেজনা বা হতাশা ত্যাগ করিয়া অবিচলিত চিত্তে সত্যাগ্রহীকে সেই কর্মধারা অনুসরণ করিতে হইবে।

[হরিজন, ২৭-৫-৩৯, ১৪৩]

নেতা অনুপস্থিত তবুও সংগ্রাম চলিবে

৬১১। যাঁহারা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের কথায় বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা যদি-বা স্বরাজের অযোগ্য না হন স্বরাজে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। যখন সকল নেতার মৃত্যু হইবে তখন আমাদের হইবে কি ? কারাবাস বা মৃত্যুর ফলে নেতাদের সাহায্যে বঞ্চিত হইলেও যখন আমরা কাজ চালাইয়া যাইতে পারিব তখনই আমরা স্বরাজের যথার্থ যোগ্য হইব। কারাবাসের কথা মনে করিয়া আমাদের অধিকতর দৃঢ়তা সহকারে কাজ করিয়া চলাই উচিত।

নিঃশ্বাস লইতে যেমন কোন সহায়তা বা উপদেশ প্রয়োজন হয় না তেমনই স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারাই স্বাধীনতা অর্জনের উপায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১০-২১, ৩৩০]

৬১২। নেতার অনুপস্থিতিতে শৃঙ্খলাভঙ্গ হওয়া যেমন অনুচিত, তেমনই গোলাগুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়াও আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১১-২১, ৩৪৯]

৬১৬। আমার বিশ্বাস কেশাগ্র পরিমাণও শিথিল হয় নাই; যদি শেষ পর্যন্ত মাত্র একজন সত্যাগ্রহীও সংগ্রাম চালাইতে প্রস্তুত থাকে তাহা হইলেও জয়লাভ অনিবার্য।

[দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ৫]

৬১৭। যদি কেহ তাহার ন্যূনতম লক্ষ্য স্থির করিয়া লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য অবিচলিতভাবে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে পৃথিবী জয় করাও সম্ভব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৪-২৫, ১১৫]

৬১৯। অসহযোগের শক্তির উৎস ও প্রধান আশ্রয়স্থল হইল অহিংসা। যদি আমরা অহিংসাতে অবিচল থাকি তবে যত ত্রুটিই হউক না কেন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে পারিব। কিন্তু যদি অহিংসার আশ্রয় ত্যাগ করি তাহা হইলে লাঞ্ছিত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। এই কথা যেন স্মরণে থাকে যে, সরকারের ভরসা ও আশ্রয় হিংসাতে। যেহেতু সরকার এই হিংসাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমাদের সকল বলপ্রয়োগ ও হিংস্রতা প্রতিরোধের শক্তিও তাহার আছে। কাজেই যখন আমরা হিংসার আশ্রয় লই তখন সরকার যাহা চায় তাহাই করা হয় মাত্র অর্থাৎ সরকারের সহিত আমরা সহযোগ করি। আমাদের মধ্যে হিংসার প্রকাশমাত্রকেই আমাদের নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞতা এবং ব্যর্থ ক্রোধের লক্ষণ বলা যায়।

যুদ্ধের কুটনীতির প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন শত্রুর ছলনায় না ভুলিয়া সতর্কতা অবলম্বন করা। যুদ্ধবিদ্যায় নিতান্ত আনাড়ী ব্যক্তিও জানে যে শত্রুর রচিত ফাঁদে পা দিতে নাই। সরকারের প্রতিটি অত্যাচারকে ফাঁদ বলিয়া গণ্য করিয়া তাহাতে ভুলিয়াও পা দেওয়া উচিত নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৭-২১, ২৩৭]

আন্দোলনের পাঁচটি পর্যায়

৬২০। কল্যাণকর প্রত্যেক আন্দোলনই পাঁচটি পর্যায়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে—তাচ্ছিল্য, উপহাস, নিন্দাবাদ, দমন ও সম্ভ্রম। প্রথম কয়েক মাস সরকার তাচ্ছিল্যভরে আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিল। তারপর বড়লাট আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিলেন। পরের পর্যায়ে চতুর্দিক হইতে নিন্দাবাদ বর্ষণ করা হইয়াছে। সকল প্রদেশের লাট সাহেবেরা ও অসহযোগবিরোধী সংবাদপত্রগুলি সত্য-মিথ্যা যত রকম অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে আনা যায় সব কিছু প্রচারে নিয়োজিত হইয়াছিল। এখন আরম্ভ হইয়াছে দমন ও অত্যাচার। এ পর্যন্ত দমনকার্য লঘুভাবেই চালানো হইতেছে। যে আন্দোলন লঘু বা গুরু বলপ্রয়োগে দমানো যায় না তাহা সাধারণের সম্ভ্রম আকর্ষণ করে। ইহাতে আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে থাকে। এই কারণে সরকার দমননীতি অবলম্বন করিলে আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা আসে। যদি বলপ্রয়োগের ফলে ভীত বা ক্রুদ্ধ হইয়া পাল্টা বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিয়া বিপথগামী না হইয়া অহিংসার পথে অবিচলিত থাকি তাহা হইলে সমুচিত কাজ করা হইবে। বুঝা উচিত যে, শক্তির অহংকার সহজে নষ্ট হইতে চায় না, কাজেই সরকার স্বীয় অস্তিত্বের জন্য চরম দমনকার্যের দ্বারা আন্দোলন থামাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। দ্রুত সাফল্যলাভ করিতে হইলে এই সংকট-মুহূর্তে পূর্ণ আত্মসংযম অবলম্বন করাই একমাত্র পথ।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৩-২১, ৭৪]

সত্যাগ্রহীদের প্রতি সতর্কবাণী

৬২১। সরকারকে যথেচ্ছ অমান্য করিবার চেষ্টা করিলে আসে বিশৃঙ্খলা ও অসংযত অনাচার, যার ফলে ঘটে বিনাশ।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৪-৩১, ৫৮]

৬২৩। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে ছাত্ররা 'ধর্না দেওয়া'র পুরাতন বর্বর কুপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিতেছে। আমি ইহাকে বর্বরতা বলিয়া অভিহিত করিতেছি কারণ ইহা কাহাকেও কিছু করিতে বাধ্য করার স্থূল উপায় মাত্র। যেহেতু ছাত্রদের পদদলিত করিতে কেহ চাহে না, এজন্য 'ধর্না দেওয়া'র মধ্যে ভীরুতাও রহিয়াছে। 'ধর্না দেওয়া'কে হিংসামূলক বলা শক্ত কিন্তু বস্তুতঃ ইহা তার চেয়েও ঘৃণ্য। যদি বিপক্ষের সহিত খোলাখুলি যুদ্ধ করা যায় তাহা হইলে তাহাকেও আঘাত করার অধিকার দিতে হয়। কিন্তু যখন বিপক্ষকে বলা হয় "আমাকে পদদলিত করিয়া যাও", অথচ আমরা জানি তারা এ কাজ করিতে চাহিবে না ; তখন ইচ্ছাপূর্বক বিপক্ষ পক্ষকে সংকটে ফেলা হয়। যে ছাত্ররা অতি-উৎসাহের বশে 'ধর্না দিতে' বসিয়াছিল তাহারা এ কাজের হীনতা না বুঝিয়াই এরূপ করিয়াছিল। কিন্তু যারা বিবেকের নির্দেশে একাকী সত্যের জন্য সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হয় তাহাদের বিবেচনাহীন হইলে চলে না। অসহযোগ যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে নিজের দোষেই তাহা ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। অসহযোগ বার্থ হওয়ার কোনই কারণ নাই। অসহযোগ নিষ্ফল হইতে পারে না। আন্দোলনকারীরা এমন আচরণ করিতে পারেন যাহাতে দর্শকের মনে হইবে অসহযোগ ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং আমার অনুরোধ যে, তাঁরা বিশেষ বিচার পূর্বক নিজের কর্মধারা নির্বাচন করিয়া লইবেন। অসহযোগে বিপক্ষ পক্ষের প্রতি আচরণে কোন অধীরতা, নিষ্ঠুরতা, ঔদ্ধত্য বা অন্যায় চাপ থাকা উচিত নয়। যদি সত্যই আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হই তাহা হইলে পরমত-

অসহিষ্ণু হওয়া চলিবে না। অসহিষ্ণু হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের নিজের ধর্মে নিজেদের বিশ্বাস নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-২-২১, ৩৩]

৬২৫। বহু বাধা ও বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়াও কেন যে আমি নানা পন্থায় অহিংস বিদ্রোহের অবতারণা করিয়া বর্তমান হিংসা-নীতির বিরুদ্ধে অহিংস শক্তির প্রয়োগ ঘটাইতেছি তাহা বুঝা যায় না বলিয়া অনেকে বলিতেছেন। আকাশে বাতাসে যে বিদ্বেষ ও বিরোধের আবহাওয়া চলিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি সময় থাকিতে এই হিংসার গতি রোধ না করা যায় তাহা হইলে আজ বা কাল এই হিংসা বিসদৃশ হিংস্রতায় প্রকট হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, একমাত্র অহিংস প্রতিরোধই এই হিংসার স্ফুরণে বাধা দিতে সক্ষম। আমাদের দেশ স্বাধীনতার জন্য যত আগ্রহান্বিত তার চেয়ে বেশী আগ্রহ পোষণ করে সত্যিকার শক্তিমত্তা অর্জনের জন্য। সেই শক্তিমত্তা অর্জনের অর্থই হইল স্বাধীনতা।

অহিংস অসহযোগ যে-কোন মুহূর্তে হিংস্র সংগ্রামে পরিবর্তিত হইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা আমি স্বীকার করি। যদি এরূপও ঘটে এটুকু সান্ত্বনা থাকিবে যে, অহিংসা হইতে হিংসা সৃষ্টি হইতে পারে না। সমগ্র মানবসমাজ হিংসার স্পর্শে কলুষিত হইয়া আছে। সমাজমনের গভীরে যে হিংসাবিষ গোপনে সর্বত্র প্রসারিত হইতেছে, অহিংস বিপ্লবে সে বিষ বাহিরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে পারে। তবে তৎসত্ত্বেও উহা হইবে একটি শোধনাত্মক প্রক্রিয়া। ইংরাজ শাসকবর্গ এই অহিংস বিপ্লবকে বাধা দিয়া এমনভাবে ইহাকে পরিচালিত করিতে পারেন যে দেশের সকল প্রকার হিংসা-শক্তি দমিয়া যাইবে। হয়তো তাঁহারা সেইরূপই করিবেন অথবা অনেকে যেমন আশঙ্কা করেন, হয়তো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে, সমগ্র হিংসা শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়া বাড়াইয়া তুলিবেন। তাঁহারা যাহাই করুন না কেন, নির্দিষ্ট পথেই আমাকে

চলিতে হইবে। আমার দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ও অহিংস প্রতিরোধে অখণ্ড বিশ্বাস রাখিয়া আমার ধর্মবুদ্ধি যে পথ নির্দেশ করিয়াছে সেই পথ হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হইতে পারি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১-৩০, ২৯]

৬২৬। যদি আমরা দেশকে স্বাধীন করিতে চাই তাহা হইলে ভয়ানককে ভয় করা ছাড়িতে হইবে। এ কথা এখনও কি বুঝিতে বাকী আছে যে, চতুর্দিকে হিংসার ভয় আমাদিগকে অবদমিত করিয়া রাখিয়াছে? যাহা শান্তি মনে করিয়া আমরা চাহিতেছি তাহা শান্তির ছলনা মাত্র; অগণ্য বুভুক্ষু নর নারী শিশুর কঠোর দুঃখ ও মৃত্যুর পরিবর্তেই শুধু এই শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। যাঁরা বিরূপ সমালোচনা করেন তাঁরা যদি একবার চোখ খুলিয়া এই শোষিত পিষ্ট বুভুক্ষু নরনারীর অন্নাভাবে তিলে তিলে মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারাই বলিবেন, 'দেশ অরাজক হউক, যত বিপদই ঘটুক, এই দুর্দশার অবসান করিতেই হইবে; যে পন্থায় ইহা সিদ্ধ হয় সেই পন্থাই শ্রেয়।' বিচার করিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই শোষণের শাসন লোপ না পাইবে ততদিন এই দুর্দশার অবসান হইবে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১-৩০, ২৮]

৬২৭। এ কথা সত্য যে অহিংস আন্দোলনের ফলে হিংসার প্রাবল্য ঘটিতে পারে। তেমনই স্বাধীনতা পাওয়ার পর সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। অপব্যবহার হইতে পারে বলিয়া আমরা স্বাধীনতার চেষ্টা পরিহার করিতে পারি না। তেমনই বিপত্তি ঘটা সম্ভব বলিয়া আমরা অহিংস অসহযোগের পথও ছাড়িতে পারি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১২-২০, ঠাকুর, ৩৩৪]

চৌরীচৌরা প্রসঙ্গ

৬৩১। যে কয়েকবার আমি অহিংস প্রতিরোধের প্রয়াস বন্ধ করিয়াছি, হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটার জন্য তাহা করিয়াছি এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। কংগ্রেসের সভ্যরাই যখন জানিয়া বুঝিয়া হিংসাত্মক কার্যে প্ররোচনা ও উৎসাহ দিয়াছেন তখনই আমি আন্দোলন বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। হিংসাত্মক কাজ অনুষ্ঠিত হইলেই আন্দোলন বন্ধ করিয়াছি এ কথা ঠিক নয়, যেমন মোপলা বিদ্রোহের সময় আন্দোলন বন্ধ করা হয় নাই। কিন্তু চৌরীচৌরার ঘটনায় যখন দেখিলাম কংগ্রেসী ব্যক্তিরাই এই দুর্ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন তখন আন্দোলন বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-১০-২৫, ৩৬৮]

সত্যাগ্রহ—আত্মনিবেদনের ঘটনা

৬৩২। সত্যাগ্রহের ইহাই পরম শুভ অবদান। এই অহংকার ত্যাগের জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, সত্যাগ্রহের পথে চলিবার কালে আপনিই অহংকার খসিয়া পড়ে। সত্যাগ্রহের ধর্মেই এরূপ ঘটিতে বাধ্য। সত্যাগ্রহ এমন একটি ধর্মযুদ্ধ যাহাতে গোপনীয়তার প্রয়োজন হয় না, চতুরতার অবকাশ থাকে না, অসত্যের কোন স্থান থাকে না। যিনি ধর্মপথে চলিতে চাহেন তাঁহাকে এই সংগ্রামের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। সত্যের সাধনে জীবনে এ যুদ্ধ আপনিই আসিয়া দেখা দেয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যে যুদ্ধের আয়োজন করিতে হয় তাহা ধর্মযুদ্ধ নয়। সত্যের জন্য যে সংগ্রাম ঘটে তাহাতে পথ দেখান স্বয়ং ভগবান, যুদ্ধ পরিচালনা করেন তিনি। কেবল ঈশ্বরের নির্দেশে এই ধর্মযুদ্ধে নিযুক্ত হওয়া যায়—যুদ্ধে সত্যাগ্রহী যখন নিঃসহায় হইয়া মনে করেন আর উপায় নাই, চারিদিকে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে,

যখন নিজেকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন বলিয়া মনে হয়—তখন কোথা হইতে ঈশ্বরের বরদ হস্ত তাহাকে পথ দেখায়। নিজেকে পায়ের তলার ধূলিকণার অধম মনে করিতে পারিলে তবে ঈশ্বরের সহায়তা লাভ হয়। ভগবানের দয়া তারাই পায় যারা সকল শক্তি হারাইয়া নিঃসহায় হইয়া তাঁরই ভরসায় চলিতে থাকে।

[দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ৫]

ষোড়শ পর্ব

সত্যাগ্রহীর জীবন

৬৩৩। সত্যাগ্রহীকে সকল সম্পদ্ ত্যাগ করিতে হইবে। ধর্মের সাধন ও ধনের কামনা পরস্পরবিরোধী।

[সিংহলে গান্ধীজীর সহিত, ৬৫]

সত্যময় জীবন

৬৩৫। প্রত্যেক স্ত্রী বা পুরুষকে এই ক্ষণ হইতেই মনে করিতে হইবে যে, তাহারা স্বাধীন এবং এমনভাবে চলিতে হইবে যেন সাম্রাজ্যবাদের কঠিন শাসনকে তাহারা আর গ্রাহ্য করে না। এটা কল্পনার বিলাস নয়, বাস্তব সত্য বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করিতে হইবে। বাহিরে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করিতে হইলে অন্তরের স্বাধীনতা পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। যে মুহূর্তে কৃতদাস মনে করে সে স্বাধীন, তার দাসত্বের বন্ধন আপনিই খসিয়া পড়ে। সে তাহার প্রভুকে বলে, 'এতদিন আমি তোমার দাস হইয়া বাঁচিয়াছিলাম, আজ হইতে আর আমি কাহারও দাস নহি। তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে হত্যা কর, যদি তাহা না করিয়া আমাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দাও, তাহা হইলে আমি আর তোমার কাছে কিছুই চাহিব না। আজ হইতে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তোমার কাছে আর হাত পাতিব না, ভগবানই আমার ব্যবস্থা করিবেন। স্বয়ং ঈশ্বর আমার অন্তরে এই স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাইয়াছেন, তাই আমি আজ নিজেকে স্বাধীন মনে করিতেছি।'

[সরকারের সহিত পত্রালাপ, ৮৩]

বিশ্বাস ও কাজ

৬৩৭। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দেহ ও মনের কাজ থাকা চাই কিন্তু সে কাজ হইবে সাত্ত্বিক বা সত্যানুসরণ। যিনি সেবায় জীবন

উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার মুহূর্তমাত্র অবকাশ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাঁহাকে কাজের সদসৎ বিচার শিখিতে হইবে। সেবার একাগ্রতা থাকিলে বিচার আপনিই আসিতে থাকে।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ৩৯]

৬৩৮। নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আমি যেটুকু ফল পাইয়াছি, যে কেহ আমার মত ভরসা ও বিশ্বাস লইয়া প্রয়াস করিলে তাহা পাইতে পারে। বিশ্বাস না লইয়া চেষ্টা করিলে সকল প্রয়াস তলহীন গহ্বরের তলায় পৌঁছিবার চেষ্টার মত নিষ্ফল হয়।

[হরিজন, ৩-১০-২৬, ২৬৯]

৬৪৩। মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সংগ্রাম করিতে হইলে যোদ্ধদলের সংখ্যা বেশী হইলেই জয় নিশ্চিত হয় না—জয় নির্ভর করে যোদ্ধাদের গুণের উপর। পৃথিবার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সকলেই একাকী সংগ্রাম করিয়াছেন। লোকগুরু জরথুস্ত্র, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রত্যেকেই নিজের পথে একাকা চলিয়াছিলেন। আরও বহু মহাপুরুষের নাম করা যায়, যাঁদের জীবনও ছিল অনুরূপ। তাঁদের ছিল বিশ্বাস, তাঁরা নিজেকে বিশ্বাস করিতেন আর করিতেন ভগবানকে। যেহেতু তাঁরা সর্বদাই অনুভব করিতেন যে স্বয়ং ভগবানই তাঁহাদিগকে চালাইতেছেন, তাই তাঁহারা কখনও নিঃসঙ্গ অনুভব করিতেন না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-১০-২৯, ৩৩০]

নিখুঁতভাবে কাজ করা

৬৪৫। করণীয় কাজ যত সামান্যই হউক না কেন, সর্বপ্রযত্নে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বহুমূল্যবান কাজে যে পরিমাণ মনোনিবেশ করিতে হয় সামান্য কাজেও সমপরিমাণ মনোযোগ করা উচিত। ছোট ছোট কাজ দিয়াই মানুষের মূল্য নির্ণীত হয়।

[হরিজন, ২৭-৭-৩৫, ১৯১]

সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা

৬৪৭। অনেক সময়ে বন্ধুদের বলিয়াছি যে, অনাসক্তিতে ইংরাজরা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অভ্যস্ত। যত গুরুত্বপূর্ণ দেশের কাজই হউক না কেন, ইংরাজেরা নির্দিষ্ট সময়ে আহার করিতে ও বিরাম লইতে ভোলে না। বিপদ বা কোন দুর্বিপাক ঘটিলে তারা বিচলিত হয় না। এই আচরণই গীতোক্ত নিরাসক্ত কর্মযোগ। ভারতের যত লোক স্বাধীনতার চেষ্টায় যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে খুব কমজনাই ইংরাজের এই মানদণ্ডের কাছাকাছি পৌঁছিতে পারেন। আমাদের নেতারা ও কর্মীরা যদি সকল কাজের নির্দিষ্ট সময় মানিয়া চলিতে পারেন তাহাতে সমগ্র জাতি লাভবান হইবে।

কোন ব্যক্তিই সাধ্যের অতীত কিছু করিতে পারে না। যদি দিনের শেষে দেখা যায় যে, আরও কাজ পড়িয়া আছে যাহা আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া না করিলে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কোথাও না কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে যদি আমরা করণীয় কাজের ধারা নির্দিষ্ট করিয়া যথা-সময়ে যেটুকু করার করিয়া ফেলি তাহা হইলে সমগ্র জাতির কর্মক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে, ফলে আমরা দ্রুততর তালে জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব এবং দেশকর্মীরাও সুস্থভাবে দীর্ঘায়ু হইয়া দেশসেবা করিতে থাকিবেন।

[হরিজন, ২৪-৯-৩৮, ২৬৬]

ভয়শূন্যতা

৬৪৮। অনেক সময় আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলিয়া ভুল করি। ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান বা দার্শনিক আলোচনায় যোগ দিতে পারাকে আধ্যাত্মিকতা বলা যায় না। আধ্যাত্মিকতা অন্তরের ব্যাপার—অধ্যাত্মশক্তি সূক্ষ্মভাবে চরিত্রে বিকশিত হয়, এ

শক্তির সীমা নাই, অন্ত নাই। আধ্যাত্মিকতার প্রধান অবলম্বন ভয়শূন্যতা। ভীরুর ধর্ম নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-২১, ৩২৩]

৬৪৯। নির্ভয় হইয়া না চলিলে মনুষ্যচরিত্রে কোন মহত্ত্ব সৃষ্টি হইতে পারে না। মনে ভয় থাকিলে কেমন করিয়া সত্যের সাধন বা প্রেমের অনুসরণ করা সম্ভব হইবে? প্রীতম্ বলেন, 'হরির (ঈশ্বরের) পথ বীরের জন্য, ভীরু সে পথে চলিতে পারে না।' হরি বলিতে সত্য এবং বীর বলিতে যাঁদের অস্ত্র নির্ভয়তা, বুঝিতে হইবে।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ৪০]

৬৫১। বিনা-ত্যাগে যে স্বরাজ পাওয়া যায় তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। তাই আমি দেশবাসীকে বলিব, তাঁরা যেন সর্বোত্তম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। যথার্থ ত্যাগে সকল দুঃখ হাসিমুখে গ্রহণ করিতে হয়—ত্যাগের সংগ্রামে কাহাকেও না মারিয়া মরিবার কৌশল শিখিতে হয়। ভারত যেন এ মহামন্ত্রের সাধনে সফল হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৫-৩০, ১৬১]

৬৫২। দ্বিধা না করিয়া গোলাগুলির সামনে দাঁড়াইতে হইবে—শুধু তাই নয়, আত্মরক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করা চলিবে না। সত্যাগ্রহীকে আত্মরক্ষা করার অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে।

[হরিজন, ৯-৭-৩৮, ১৭৩]

বিনয়

৬৫৬। বিনয় না থাকিলে কেহই অসহযোগী হইতে পারে না। যখনই অগোচরে আত্মম্ভরিতা মনে আসে, তখনই সকল উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়, মানুষ স্বাধীনতার যোগ্যতা হারায়। মনে বিনীত ও সাত্ত্বিক ভাব রাখিয়া ত্যাগ স্বীকার করিলেই বুঝা যাইবে সে ত্যাগ কত অকিঞ্চিৎকর। ত্যাগের পথে চলিতে চেষ্টা করিলে বুঝা যায়

আমাদের স্বার্থপরতা কত প্রবল। তখন আরও অধিক ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে। ক্রমে মনে হয় সকল কিছু ত্যাগ করিয়া নিজেকে পরিপূর্ণভাবে দিতে না পারা পর্যন্ত শান্তি নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৯-২১, ৩০৬]

৬৫৯। জনসেবার ব্রত যিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে যাহাদের সেবা তিনি করিবেন তাহাদের প্রতি বিরক্তি বা ক্রোধ পোষণ করা উচিত নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৪-৩১, ৫৪

আদর্শনিষ্ঠা

৬৬২। আদর্শে পৌঁছিতে হইলে নিত্য নূতন ঘটনার মধ্যে আদর্শের প্রয়োগ পরীক্ষা করিয়া চলিতে হইবে—ইহার বিপরীত অবস্থার খাতিরে আদর্শকে কাটছাঁট করিতে গেলে আদর্শ তো নষ্ট হইবেই, বাস্তবকেও হারাইবার ভয় আছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১-২২, ৬২]

৬৬৩। আমার মন্তব্যে কেহ যেন হতাশ হইয়া প্রয়াস ত্যাগ না করেন। কোন আদর্শ অনুসরণের ব্রত গ্রহণ করিলেই যে প্রথম হইতে পরিপূর্ণভাবে আদর্শ অনুযায়ী চলিতে পারিব তাহা সম্ভব নয়। ব্রত গ্রহণ করার অর্থই হইল নিরন্তর কায়মনোবাক্যে সত্য পালন করার চেষ্টা করিতে হইবে। কল্পনার সাহায্যে আত্মপ্রবঞ্চনা করার কোন প্রয়োজন নাই।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ২৫]

৬৬৪। আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র শিখিতে পারিলে আমাদের নিত্যকার জীবনে সেই মন্ত্রের প্রয়োগ পরীক্ষা করিতে পারি। কিন্তু প্রত্যেকের যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুই করা সম্ভব, তার বেশী নয়। ইহাই সাধনের সহজ পন্থা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-২-২৫, ৪৮]

পরিমাণ নয়, গুণ

৬৬৬। এই সংসারে শ্রেষ্ঠ সার্থক কাজ সাধন করিয়াছেন মাত্র কয়েকজন লোক, তাহাও ঘটিয়াছে একান্তে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৩-২২, ১৩৫]

৬৬৭। ভীরুরাই সংখ্যাধিক্য পাইলে পরম আনন্দিত হয়। যাঁরা বীর তাঁরা একাই সংগ্রাম করিতে থাকেন। তাই সকলকে বলি, অন্তরের বীর্য লাভ করিবার প্রয়াস কর। চলিবার পথে বহু সাথী থাকুক অথবা যদি একেলাও চলিতে হয়—সকল অবস্থাতে অন্তরের বীরত্বই অবলম্বন, অন্য সব ভরসা মিথ্যা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৬-২৬, ২১৭]

প্রকৃত জয়ের লক্ষণ

৬৬৮। সংগ্রামই আনন্দের বস্তু। যিনি প্রকৃত যোদ্ধা, জয় পরাজয় যাহাই হউক না কেন, সংগ্রাম করাতেই তাঁর বীরত্বের সার্থকতা।

[দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ৩৯৪]

৬৬৯। জেলেই থাকুন বা জেলের বাহিরে থাকুন, সত্যাগ্রহী সকল অবস্থাতেই বিজয়ী। কেবল যখন অন্তরের বাণী না মানিয়া সত্য ও অহিংসাকে ত্যাগ করেন তখনই তাঁর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। সুতরাং যখন সত্যাগ্রহী পরাস্ত হয় তখন তিনি নিজেই নিজের পরাজয় ঘটান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

৬৭৫। প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজের দুর্বলতা কোথায় ও কতটুকু তাহা বুঝিয়া লওয়া। যিনি নিজের দুর্বলতা বুঝিয়াও শক্তিশালী ব্যক্তির নকল করিতে চেষ্টা করেন তাঁহার পরাজয় অনিবার্য। তাই আমি সাবধান করিতেছি প্রত্যেকেই যেন নিজের দুর্বলতা বুঝিয়া তদনুযায়ী আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিতে অভ্যাস করেন।

[হরিজন, ২৭-৭-৪৭, ২৫২]

ভুল স্বীকার

৬৭৯। নিজের ভুল স্বীকার না করার মত অগৌরবের আর কিছু নাই।

[হরিজন, ৮-১০-৩৮, ২৭৯]

৬৮০। কোন কোন সময়ে নিন্দা মানিয়া লওয়া ভালো।

[রাইটিংস্ এ্যাণ্ড স্পীচেস্ অব মহাত্মা গান্ধী, নটেশন, ৩২৬]

৬৮১। চিরদিনই আমার সম্বন্ধে অনেক ভুল সংবাদ বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। সকল জনসেবকের ভাগ্যেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ইহা সহ্য করিবার মত শক্তিও সেবককে অর্জন করিতে হয়। যদি প্রত্যেকটি মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়া তাহার অ-যথার্থতা প্রমাণ করিতে হয় তাহা হইলে জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিবে। এই কারণে বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে কাজের ক্ষতি হয় তাহা ছাড়া অন্যত্র গুজবের ভ্রম নিরসন না করাই নিয়ম করিয়া লইয়াছি। ইহাতে আমার বহু সময় ও দুশ্চিন্তা লাঘব হইয়াছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৫-২৬, ১৯৩]

আত্মসংযম

৬৮৩। সকলের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের গোপনতম চিন্তাও আমাদের জীবনে প্রকট হয় এবং অন্যে তাহা বুঝিতে পারে। এজন্য এমন সংযম অভ্যাস করা উচিত যাহাতে মন্দ চিন্তা যেন আদৌ অন্তরে স্থান না পায়; কেবল মহৎ ধ্যান সর্বদা আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। ভিতরে বাহিরে সকল মলিনতা মার্জনা করিয়া দেহ মন নির্মল করিয়া রাখিতে হইবে।

[নীতিধর্ম, ৫৯]

৬৮৫। যে সাধক ঈশ্বরকে মানিয়া চলিতে আকাঙ্ক্ষা রাখেন এবং যিনি ঈশ্বর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল, তাঁহার পক্ষে যেমন বাক্য

ও চিন্তায় সংযম প্রয়োজন তেমনই খাদ্যেরও পরিমাণ ও প্রকৃতির বিষয়ে সংযমের প্রয়োজন হয়।

[আত্মচরিত, ৩৩৪]

৬৮৮। আমার ধর্ম বলে যে, যেখানে এমন বাধা আসিবে যাহা অতিক্রম করা সাধ্যের অতীত; তখন কর্তব্য হইবে উপবাস করিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৯-২৪, ৩১৯]

৬৯০। মানুষের দুঃখ যিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ে কখনও কামবাসনার উদয় হয় না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৪-২৬, ১৫৭]

৬৯১। কামবাসনার পরিপূর্ণ নিবৃত্তি ভিন্ন ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৬-২৬, ২৩০]

৬৯৩। যদি সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হয় তাহা হইলে 'ব্রহ্মচর্য' শব্দের অর্থ বলা যায়—সেই আচরণ যাহা আমাদিগকে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে সক্ষম করে। এই আচরণ আমাদের সকল প্রবৃত্তির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আনিয়া দেয়। ইহাই ব্রহ্মচর্য শব্দের বাস্তব ও সঙ্গত অর্থ।

সাধারণ লোক ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থে জননেন্দ্রিয়ের সংযম মাত্র বুঝে। এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করার ফলে ব্রহ্মচর্য শব্দটির গুরুত্ব নষ্ট হইয়া উহার আচরণ প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম বাদ দিয়া বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সংযম পালন করা অসম্ভব নয়। আমাদের সকল প্রবৃত্তি পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। দেহবুদ্ধির ক্ষেত্রে মন সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত সমভাবে যুক্ত থাকে। মনের উপর সংযম অভ্যাস না করিলে কেবল দৈহিক আনন্দবিমুখতা কিছুকালের জন্য সম্ভব হইলেও ফলদায়ী হয় না।

[হরিজন, ১৩-৬-৩৬, ১৩৭]

অপরিগ্রহ

৬৯৭। আমরা সর্বদাই মানুষের প্রকৃত অবস্থা উপেক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গতভাবে নিজের নিজের অভাব বাড়াইয়া চলিয়াছি। এই তথ্য আবিষ্কার করার ফলেই অসহযোগ আন্দোলনের সংকল্প মনে আসিয়াছে। অসহযোগ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নহে। যে মনোভাব অবলম্বন করার ফলে আমরা নিঃসহায়ভাবে এই অসার আত্মতৃপ্তির ব্যর্থ চেষ্টায় ছুটিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের বিনাশ সাধনে তৎপর হইয়াছি, সেই বিশেষ মনোভাবের সহিত অসহযোগ করাই লক্ষ্য। এই মূঢ়তার দোষে আমরা যারা অধিকতর ভোগের জীবন কামনা করি, তারা দেশবাসীর দুরবস্থা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া জীবনযাত্রার মান বাড়াইবার জন্য অসঙ্গত আচরণ করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। ভারত কোনদিন অন্য দেশকে শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই কিন্তু আজ ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যারা এতদিন ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের সহিত সকলের যোগসূত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তারাই আজ ভারতের দরিদ্রদের শোষণ করিয়া তাহাদের বিলোপ সাধনে উদ্যত হইয়াছে। ভারতের ছোট ছোট গ্রামগুলি এইভাবে নিঃশেষিত হইয়া মরিয়া যাইতেছে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ত্যাগপরায়ণ কর্মীরা যখন দলে দলে এই দরিদ্রদের সেবায় লাগিয়া যাইবেন তখনই দেশের উন্নতি সম্ভব হইবে। সেই উন্নতি না ঘটিলে স্বরাজের কোন অর্থ ই থাকিবে না। যত অধিক সংখ্যায় দেশসেবক কর্মীরা দরিদ্রের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে আগাইয়া আসিবে, স্বরাজের পথে তত বেশী অগ্রসর হইতে পারা যাইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৬-২৬, ২২৬]

৬৯৮। গান্ধীজী যখন চাহেন যে যারা গ্রামে সেবাকার্য করিবে তাহাদিগকে গ্রামের লোক যেমন আহার করে সেইরূপ আহার—ধরা যাউক দিনে তিন আনার অনধিক ব্যয়ের আহার—করিতে হইবে, তার

অর্থ ইহা নয় যে তিনি অনাহার বা অনুরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের অনুকূলে মত প্রকাশ করিতেছেন।

জনৈক কর্মী গান্ধীজীকে জানাইলেন যে, খাদ্য বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করিয়া সারা দিনে তিনি একবার মাত্র খাইতেছেন—পনের তোলা ভাত, আমতি (তরকারি ও দাল দিয়া তৈয়ারী) এবং ঘোল। ইহাতে তাঁহার দিন একআনা ব্যয় হয়। তৎক্ষণাৎ গান্ধীজী তাঁহাকে লিখিলেন—"তোমার খাদ্য অতি অল্প, প্রায় না খাইয়া থাকার মত। আমার মতে ভগবান তোমাকে যে দেহযন্ত্র দিয়াছেন তাহার পূর্ণ প্রয়োগ তুমি করিতেছ না। যাহাকে যে ক্ষমতা বা ধন দেওয়া হয় তাহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে অথবা জানিয়াও তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে ন্যস্ত ক্ষমতা বা ধন তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। এই বিষয়ে কাহিনীটি তোমার জানা আছে কি ?

"যখন দেহ বিরুদ্ধাচরণ করিবে তখন দেহকে কষ্ট দেওয়া চলিতে পারে কিন্তু যখন দেহ স্ববশে থাকে তখন দেহকে কষ্ট দেওয়া পাপ। সংক্ষেপে বলিলে বলিতে হয় যে, দেহকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য নাই।"

[হরিজন, ২-১১-৩৫, ২৯৯]

মনেরও সংযম প্রয়োজন

৬৯৯। অসংগ্রহ নীতিটি যেমন বাহিরের সম্পত্তির বিষয়ে প্রযোজ্য তেমনি মনের বিষয়েও প্রযোজ্য। যিনি নিষ্প্রয়োজনে নানা জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া মন বোঝাই করেন তিনিও অসংগ্রহের নীতি লঙ্ঘন করার অপরাধ করেন। যে সকল চিন্তা আমাদের ঈশ্বর হইতে বিমুখ করে অথবা ঈশ্বরমুখীন হইতে বাধা দেয়, তাহা আমাদের ধ্যানের বাধা স্বরূপ।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ৩৮]

৭০০। যিনি সত্যের সাধনে আগ্রহশীল, বাক্‌সংযম তাঁহার

আধ্যাত্মিক সংযমের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। বাড়াইয়া বলা, সত্য গোপন করা বা অযথার্থ রূপে সত্যকে প্রকাশ করা ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা। এই দোষ পরিহার করিবার জন্য বাক্‌সংযম বিশেষ প্রয়োজন। কম কথা বলা অভ্যাস করিলে আর বাজে কথা বলিতে হইবে না, প্রতিটি কথা ওজন করিয়া ব্যবহার করা সম্ভব হইবে।

[আত্মচরিত, ৮৪]

ত্যাগের আনন্দ

৭০১। যাহাতে আনন্দ নাই এমন ত্যাগকে ত্যাগ বলা যায় না। ত্যাগ করিয়া কেহ বিষণ্ণ মুখে থাকে না। ত্যাগের সাক্ষাৎ ফল ধন্য হওয়া। ত্যাগ করার ফলে যাহার সহানুভূতির প্রয়োজন হয় সে খাট মাপের মানুষ।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৮-২৮, ২১৭]

প্রকৃত সংযম

৭০৪। মহাপণ্ডিত নিষ্কুলানন্দের যে বাণী গান্ধীজীর খুবই প্রিয় ছিল তাহা এই—"কামনা ত্যাগ না করিয়া বস্তুত্যাগের প্রয়াস যতই প্রবল হউক না কেন তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র।"

[আত্মচরিত, ২০]

৭০৬। মদ্য ও অনুরূপ উত্তেজক নেশার সামগ্রী এবং মাংসাদি উত্তেজক আহার ত্যাগ করিলে মনের উন্নতি সাধনে সহায়ক হয় বটে কিন্তু ঐ সকল খাদ্য পানীয় ইত্যাদি ত্যাগ করিলেই সাক্ষাৎ কোন ফলের আশা করা যায় না। যে সকল লোক মাংস ভক্ষণ করে এবং যারা করে না, সকলেই যদি ঈশ্বরকে মান্য করিয়া চলে তাহা হইলে সকলেই মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু যিনি কঠোরতার সহিত

মাংসাদি বর্জন করিয়া চলেন কিন্তু প্রতি কার্যে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করেন তাঁহার মুক্তি বহু দূরে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-২১, ৩১৮]

৭০৯। অহিংসা মাত্র খাদ্যবিধি নয়, তার চেয়ে অনেক বড়। কে কী খায় তাহার মূল্য সামান্য, তাহার পিছনে আত্ম-ত্যাগ ও আত্মসংযম আছে কিনা তাহাই বিবেচ্য। খাদ্য বিচারে যেরূপ মনে হইবে বাদ দিয়া যাইও। খাদ্যে সংযম প্রশংসনীয় এবং প্রয়োজনীয়ও বটে, কিন্তু অহিংসার জন্য যে সংযম প্রয়োজন ইহা তাহার বহিরঙ্গ মাত্র। যে ব্যক্তির হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ, যার মন পরের দুঃখে গলিয়া যায়, যিনি সর্ব ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিয়াছেন, তিনি খাদ্য ব্যাপারে যাহাই করুন না কেন, শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে অহিংসার মূর্তি বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু যে করুণাবিহীন ব্যক্তি খাদ্য সম্বন্ধে কঠোর বিচার করিয়া চলিয়াও ষড়রিপুর দাসত্ব করে, সে দুরাত্মা অহিংসা হইতে বহু দূরে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৯-২৮, ৩০০]

সপ্তদশ পর্ব

ধর্ম ও নীতি

৭১০। আমার ধর্ম কি তাহা জানিতে হইলে লক্ষ্য করিতে হইবে আমি কেমন করিয়া চলি, কেমন করিয়া খাই, বসি, কথা বলি ; মোট কথা দেখিতে হইবে আমার আচরণ স্বভাবতঃ কিরূপ। এই সকল মিলাইয়া যে চিত্র মনে আসিবে তাহাই আমার ধর্ম।

[হরিজন, ২২-৯-৪৬, ৩২১]

প্রকৃত ধর্ম

৭১১। সত্য ও সদাচারের অপেক্ষা বড় কোন ধর্ম থাকিতে পারে না।

[নীতিধর্ম, ৪৯]

৭১২। ধর্ম বলিতে আমি কি বুঝি তাহা বলিতে চেষ্টা করি। হিন্দুধর্মকে অবশ্যই আমি অন্য ধর্মের তুলনায় সমধিক আদর করি কিন্তু আমার ধর্ম হিন্দুধর্মকেও অতিক্রম করিয়া বিরাজিত। ধর্ম মানুষকে নূতন করিয়া গড়ে, মানুষকে পরিশুদ্ধ করিয়া অচল সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে। আমার ধর্ম মানুষী প্রকৃতির সনাতন ধর্ম, যাহার সাধনে সকল দুঃখ সকল ত্যাগ তুচ্ছ। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে না জানা পর্যন্ত ধর্ম মানুষকে তিলার্ধ বিরাম দেয় না। ধর্মের সাধনে মানুষ স্রষ্টাকে জানিয়া স্রষ্টার সহিত নিজের সাযুজ্য উপলব্ধি করিয়া ধন্য হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৫-২০, ঠাকুর, ১০৭০]

প্রকৃত নীতি

৭১৪। যে কাজ নিজের প্রেরণায় নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় করা না হয় তাহাকে নৈতিক কাজ বলা যায় না। যখন আমরা যন্ত্রের মত কাজ করিয়া যাই তখন নীতির কোন প্রশ্নই আসে না। যে কাজ

বিচারপূর্বক কর্তব্যবোধে করা হয় কেবল সেই কাজকেই নীতিধর্মসংগত বলা যায়। ভয়ের বশে অথবা বাধ্য হইয়া যাহা করিতে হয় তার মধ্যে নৈতিকতা থাকে না। এই যুক্তির বলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পরলোকে সুখ সুবিধার জন্য যে কাজ করা হয় তাহাও নীতিধর্মের আওতায় আসে না।

[নীতিধর্ম, ৪৩]

৭১৭। ধর্মের যে বাণী যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না অথবা যে ধর্মাচরণ নীতিবিরুদ্ধ তাহা আমি মানিতে পারি না। ধর্মভাব যদি নীতিবিরুদ্ধ না হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত না হইলেও আমি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৭-২০, ঠাকুর, ১৭৩]

৭১৯। আমাদের কামনা ও লক্ষ্যকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—স্বার্থযুক্ত ও নিঃস্বার্থ। স্বার্থপর কামনা মাত্রেই নীতিবিরোধী, কেবলমাত্র মানবকল্যাণের জন্য নিজের মঙ্গলের চেষ্টাই যথার্থ নীতিধর্ম-সংগত। মানুষের কল্যাণের জন্য নিরন্তর প্রয়াস করাই শ্রেষ্ঠ নীতিধর্ম।

[নীতিধর্ম, ৩৬]

ধর্ম ও বাস্তব সংসার

৭২০। স্বরাজ বা রামরাজ উভয়েরই অর্থ এক—উভয়েরই লক্ষ্য সংসারে ধর্মের রাজত্ব স্থাপন করা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৫ ২১, ১৪৩]

৭২১। হনুমান নিজের বুক নিজের হাতে চিরিয়া দেখাইয়াছিলেন যে তাঁর হৃদয়ে রামনাম ছাড়া আর কিছুই নাই। হনুমানের মত বুক চিরিয়া দেখাইবার অলৌকিক শক্তি আমার নাই, কিন্তু যদি কেহ দেখিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে দেখিবেন রামের প্রেমে আমার হৃদয়

পরিপূর্ণ হইয়া আছে। সে রামকে আমি ভারতে বুভুক্ষু জনগণের মলিন মুখে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৩-২৭, ৯৩]

৭২৪। প্রশ্ন—আপনার আত্মচরিতে আপনি বলিয়াছেন যে, ধর্মবুদ্ধি বাদ দিয়া রাজনীতির বিষয় আপনি চিন্তা করিতেও পারেন না। আজও কি আপনি সেই মত পোষণ করেন? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ভারতের মত দেশে, যেখানে বহু পরস্পরবিরোধী ধর্মমত প্রচলিত আছে, সেখানে কেমন করিয়া একটি সাধারণ রাজনীতি চলিতে পারে?

উত্তর—ধর্মবিচারের প্রয়োজন নাই এমন রাজনীতি সম্ভব বলিয়া আমি ধারণা করিতে পারি না। আরও বলিতে চাই যে, আমাদের প্রত্যেকটি কাজ ধর্মবিচারের উপর স্থাপিত হওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে ধর্ম বলিতে আমি সাম্প্রদায়িক ধর্মাচরণ বুঝি না। সমস্ত সংসার ধর্মের দ্বারা সৃষ্ট ও সুবিন্যস্ত রহিয়াছে এই বিশ্বাসই ধর্মবুদ্ধি। এই ধর্ম-নিয়ন্ত্রণ চোখে দেখা যায় না বলিয়াই কম সত্য নয়। এ ধর্ম হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চিয়ান প্রভৃতি ধর্মের বহু উর্ধ্বে। প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে এ ধর্মের কোন বিরোধ নাই। এই সনাতন ধর্মই বিভিন্ন ধর্মমতকে সংগতি দান করিয়া সত্যের আশ্রয়ে স্থান দিয়াছে।

[হরিজন, ১০-২-৪০, ৪৪৫]

বিভিন্ন ধর্মমত

৭২৬। সংসারের বিভিন্ন ধর্মগুলি একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র। যদি লক্ষ্য স্থির থাকে তবে যে পথেই যাও না কেন, কি যায় আসে। বাস্তব অবস্থা বিচার করিলে দেখা যায়, প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ পথে চলিয়া একই লক্ষ্যে পৌঁছায়। যত মত তত পথ।

[ইণ্ডিয়ান হোমরুল, ২৪, ২৩]

ধর্মীয় প্রচার ও রাষ্ট্র

৭২৯। রাষ্ট্রশক্তিকে ধর্মনিরপেক্ষ পথে চলিতে হইবে, এ প্রয়োজন নিঃসন্দেহে সত্য। রাষ্ট্রে যত লোক বাস করিবে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ও বিশ্বাস অনুসারে নিজ ধর্ম প্রতিপালন করিবে। অবশ্য রাষ্ট্রের সাধারণ বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ধর্মপ্রচারে কোন বাধা-বন্ধ সৃষ্টি করিবার অধিকার রাষ্ট্রের নাই। তবে কোন বিশেষ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রচারকার্যে রাষ্ট্রের সহায়তা পাইতে পারে না, যেমন বিদেশী শাসনকালে পাইয়াছিল।

[হরিজন, ২৪-৮-৪৭, ২৯২]

সহনশীলতা

৭৩১। Tolerance বা সহনশীলতা শব্দটি আমার ভালো লাগে না, কিন্তু এর চেয়ে সুষ্ঠুতর শব্দও খুঁজিয়া পাই না। Tolerance বলিলে মনে আসে নিজের ছাড়া অন্য ধর্মের প্রতি অনুকম্পার ভাব— যেন সেগুলি আমার ধর্ম হইতে নিম্নস্তরের। অহিংসার পথে চলিতে হইলে মনে করিতে হইবে, আমার ধর্মের যে মূল্য, অন্য ধর্মেরও তাই ; অর্থাৎ মনুষ্যসৃষ্ট কোন ধর্মই ত্রুটিশূন্য হয় না সুতরাং আমার ধর্মেও ত্রুটি থাকিতে পারে ইহা স্বীকার করিতে হয়। যিনি সত্যাশ্রয়ী, যিনি সংসারে প্রেমের বিধান মানিয়া চলিতে চাহেন, তিনি সহজেই এই সত্য স্বীকার করিবেন। যদি আমরা সত্যের অনাবরণ রূপ দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে আমরা কেবল সাধকই থাকিতাম না, আমরা ঈশ্বর-সত্তার সহিত এক হইয়া যাইতাম। কারণ সত্যই ভগবান। কিন্তু যেহেতু আমরা সত্যসন্ধানী মাত্র, কোনদিনই পূর্ণ সত্য বুঝিয়া শেষ করিতে পারিব না, তাই আমরা আমাদের অক্ষমতা বুঝিয়া চলি। আমরা, মানুষেরা, যেহেতু পূর্ণতা হইতে অনেক দূরে আছি, সেজন্য আমরা যে ধর্ম রচনা করি তাহাতে ত্রুটি থাকিতে

বাধ্য। আমরা যেমন পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরকে জানিয়া শেষ করিতে পারি না, তেমনই ত্রুটিবিহীন ধর্মও রচনা করিতে পারি না। আমাদের ধর্মবুদ্ধি এই অসম্পূর্ণতা দোষদুষ্ট হওয়ায় ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশ হইতেই থাকিবে—যুগে যুগে নূতন করিয়া ধর্মতত্ত্বের নব নব বোধ ও ব্যাখ্যা জন্মিবে। এই ক্রমবিকাশের ফলে সত্যের দিকে, ঈশ্বরের দিকে, আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি। মানুষ যত ধর্ম রচনা করিয়াছে তাহার সব কয়টিই যখন অপূর্ণ সত্যের প্রকাশ তখন কোন্‌টি বড় কোন্‌টি ছোট এ প্রশ্ন উঠে না। সকল ধর্মবিশ্বাসই পরম সত্যের প্রকাশ, কিন্তু সীমাবদ্ধ মানুষের সৃষ্ট ধর্মমত চরম সত্য নিঃশেষে প্রকাশ করিতে পারে নাই; তাই সকল ধর্মেই ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করি বলিয়া তাহাদের ত্রুটি অস্বীকার করিব এমন হইতে পারে না। আমাদের নিজের ধর্মের অসম্পূর্ণতাও ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে কিন্তু সেজন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নাই। নিজের ধর্মের দোষগুলি সংস্কার করাই আমাদের কর্তব্য। সর্ব ধর্মে শ্রদ্ধাবান হইলে নিজ ধর্মে সকল ধর্মের সৎগুণগুলি গ্রহণ করা সম্ভব, এ বিষয়ে কোন দ্বিধা থাকার কারণ নাই।

যেমন গাছের একটি মূল কাণ্ড হইতে বহু শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া পড়ে তেমনি একমাত্র পরিপূর্ণ ধর্মবোধ হইতে বহু মানুষী ধর্ম জন্মিয়াছে। সেই সত্যধর্ম বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। অপূর্ণ মানুষ যেটুকু পারে সক্ষম ভাষায় সেই ধর্মকথা বলিয়াছেন, অপর অপূর্ণ মানুষ সেই বাণীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এরূপ কাহার ব্যাখ্যা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিব? প্রত্যেক প্রবক্তা নিজ নিজ উপলব্ধি অনুসরণ করিয়া সাধ্যমত যথাযথ সত্য প্রকাশ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেই ভ্রান্ত হইতে পারেন না। এইজন্যই পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। অবশ্য এজন্য নিজের ধর্মমতকে অবহেলা করার প্রয়োজন হয় না। বরঞ্চ ইহার ফলে দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ, আরও উদার হয়, শ্রদ্ধা বাড়িয়া চলে।

সহিষ্ণুতা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আনিয়া দেয়। ধর্মের গোঁড়ামি তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অনেক দূরে, যেমন সুমেরু হইতে কুমেরু অনেক দূরে। ধর্ম বিষয়ে সম্যক্ সত্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে বিভিন্ন ধর্মমতের ব্যবধান লোপ পাইবে।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ৫৫]

গান্ধীজীর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী

৭৩৪। বহু অভিজ্ঞতা ও বহু বিচারের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি—

(ক) সকল ধর্মই সত্য।

(খ) সকল ধর্মেই কিছু না কিছু ভ্রান্তি থাকা সম্ভব।

(গ) আমার নিজের হিন্দুধর্মের তুলনায় অপর সকল ধর্মমত আমার নিকট কম প্রিয় নয়, যেহেতু সেই সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ আমার আপন জনের মতই প্রিয়।

আমি নিজের ধর্মমতকে যতটা শ্রদ্ধা করি অন্য ধর্মমতকে ততটাই শ্রদ্ধা করিতে চেষ্টা করি। এই কারণে ধর্মান্তর গ্রহণের কোন চিন্তাই আমার মনে আসে না। সকল ধর্মের এই সম্প্রাতি হিন্দুকে শুদ্ধতর হিন্দু করিবে, মুসলমানকে অধিকতর শ্রদ্ধাবান মুসলমান করিবে এবং ক্রিশ্চিয়ানকে আরও নিষ্ঠাবান ক্রিশ্চিয়ান করিয়া তুলিবে। আন্তর্জাতিক মৈত্রীর দিক দিয়া বিচার করিলে, পরধর্মের প্রতি অনুগ্রহপরবশ দাক্ষিণ্যের ভাব পোষণ করিলে তাহার দ্বারা সেই মৈত্রী গড়িয়া উঠিতে পারে না। যদি আমার মনের গোপনে এমন ভাব থাকে যে, আমার ধর্মই মোটামুটি সত্য, অন্যের ধর্ম সত্য নয়, তাহা হইলে অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি আমি যতই সদয় ভাব দেখাই না কেন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সত্যকার আন্তর্জাতিক মৈত্রী গড়িয়া উঠিবে না। সেজন্য অন্য মনোভাব গড়িয়া উঠা প্রয়োজন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জন্য যদি প্রার্থনা করি—'হে ভগবান, তাহাদেরও তুমি সেই দৃষ্টি দাও

যাহা আমাকে দিয়াছ', ইহাতে কাজ হইবে না। যদি মিলন লক্ষ্য হয় তাহা হইলে প্রার্থনা করিতে হইবে—'হে, ভগবান, তাহাদের পূর্ণ বিকাশের জন্য যে আলো যে সত্যজ্ঞান প্রয়োজন তাহা তাহাদের দিও।' তোমার বন্ধুদের যে ধর্মই হউক না কেন তাহারা যাহাতে মহত্তর মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারে তাহাই প্রার্থনা করিও।

যে ভাবনা তোমার মনে থাকে তাহার প্রভাব তাহাদের ভাবনা রঞ্জিত করিবে, হয়তো তুমি তাহা জানিতেও পারিবে না।

[সবরমতি, ১৯২৮, ১৮-১৯]

খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের প্রতি

৭৩৫। ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মমত যতই অজ্ঞ বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, প্রত্যেকের ধর্ম তার কাছে মূল্যবান, এ কথা মনে রাখিয়া কাজ করিলে কাজের মূল্য অনেক বাড়িয়া যাইবে। প্রত্যেকটি লোকের বিশ্বাস ও ধারণাকে অবজ্ঞা না করিয়া তাহাকে আরও জানিবার আরও বুঝিবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। আমরা যেন যোগ্যতর হিন্দু অর্থাৎ উন্নততর মানুষ হইতে পারি তাহাতে সাহায্য করা কর্তব্য। যদি কেহ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাকে তাহার সমাজ, তাহার প্রীতির বন্ধন হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করার প্রয়োজন কোথায়?

সত্য পথে চলিবার চেষ্টা করা মাত্র কুসংস্কার ও গোঁড়ামি চলিয়া যাইবে। কে কি বিশ্বাস করে তাহার জন্য আমি ব্যস্ত নহি, সকলকেই বলি বিচারসংগত কাজ করিতে। ন্যায়সংগত কাজ করিতে আরম্ভ করিলে ধর্মমত আপনিই ঠিক হইয়া যাইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১৮৮-২৭, ২৫০, ২৫১]

৭৩৭। ঈশ্বরের মাহাত্ম্যে বহু ধর্ম ও বহু ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। কেমন করিয়া আমি মনের গোপনেও ভাবিব আমার প্রতিবেশীর ধর্ম আমার ধর্ম হইতে কম উন্নত, কেমন করিয়া চাহিব সে

নিজের ধর্মমত ত্যাগ করিয়া আমার ধর্ম গ্রহণ করুক ? যদি আমি সত্যই তাহাকে ভালবাসি ও তাহার মঙ্গলকামী হই তাহা হইলে আমার প্রার্থনা করা উচিত সে যেন তাহার ধর্মে থাকিয়াই পরিপূর্ণতা লাভ করে। পরমেশ্বরের আলয়ে অনেক গৃহ আছে, সকল গৃহই সমান পবিত্র।

[হরিজন, ২০-৪-৩৪, ৭৩]

৭৩৮। একজনের ধর্মবিশ্বাস অপরকে বলিয়া বুঝানো, বিশেষ করিয়া কাহাকেও ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে, উচিত হয় না বলিয়া আমার মনে হয়। ধর্মবিশ্বাস বলার অপেক্ষা রাখে না—নিজের জীবনে সাধনের দ্বারা ধর্মকে প্রকট করাই বিশ্বাসের রীতি। কর্মে বিকশিত হইয়া উঠিলে ধর্মবিশ্বাস সকলকে আকর্ষণ করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১০-২৭, ৩৫২]

৭৪১। বই পড়িয়া ভগবানকে জানা যায় না। ঈশ্বরজ্ঞান অন্তরে উপলব্ধি করার বস্তু। সৎগ্রন্থ কিছু সাহায্য করিতে পারে, আবার এমনও হয় গ্রন্থপাঠ সত্যজ্ঞানের অন্তরায়ও হইতে পারে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৭-২৪, ২৩৮]

প্রকৃত পরীক্ষা

৭৪৩। যে তত্ত্ব স্থির বুদ্ধি দিয়া যুক্তিতে গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় না, যাহা আমার অন্তর গ্রহণ করিতে চায় না, সে তত্ত্ব ত্যাগ করাই শ্রেয়। যদি শাস্ত্রবাক্য যুক্তিসংগত হয়, উহার দ্বারা দুর্বলের যুক্তি বলবত্তর হইতে পারে। কিন্তু অন্তরের গভীর হইতে যে যুক্তি জাগিয়া ওঠে তাহার ক্ষীণ স্বর যদি শাস্ত্রবাক্যের গুরুগম্ভীর গর্জনে চাপা পড়িয়া যায় তাহা হইলে মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-২০, ঠাকুর, ৬১৬]

৭৪৫। যাহা ভ্রান্ত, পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থ মিলিয়া বলিলেও তাহা সত্য হইতে পারে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-২-২৫, ৭৩

৭৪৬। বহু ব্যক্তি মানিয়া লইলেও মিথ্যা কখনও সত্য হইতে পারে না ; কেহই যদি না মানে তবুও সত্য সত্যই থাকে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-২-২৫, ৭৫]

৭৪৮। অতীতকে আমরা ভালো করিয়া জানিতে পারি না। সেই অতীতের দোহাই দিয়া, পাপপুণ্যের বিচার ত্যাগ করিয়া যদি চলিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে সকল প্রগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অতীতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু মহৎ তাহা আমরা এক গৌরবজনক উত্তরাধিকার রূপে লাভ করিয়াছি। সেই উত্তরাধিকার আমরা পণ্ড করিব যদি অতীতের নকল করিয়া সে যুগের ভ্রান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৯-২১, ২৯২]

হিন্দুধর্ম

৭৫০। আমার স্ত্রীর প্রতি আমার মনোভাব বলিয়া বুঝানো যেমন দুঃসাধ্য, হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে আমার মনোভাব প্রকাশ করাও সেইরূপ কঠিন। পৃথিবীর অন্য যে-কোন স্ত্রীলোক অপেক্ষা আমার জীবনে আমার স্ত্রীর প্রভাব অনেক বেশী। তাঁর সব কিছুই ভালো বলিয়া এ প্রভাব জন্মে নাই, তাঁর বহু ত্রুটি আছে—সম্ভবতঃ আমি যত দেখিতে পাই তদপেক্ষা অনেক বেশীই আছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার যে যোগ আছে তাহারই প্রভাব আমার জীবন আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তেমনই হিন্দুধর্মের যতই দোষত্রুটি থাকুক না কেন তাহার প্রভাব আমার জীবনে সর্বত্র ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। গীতা বা তুলসীদাসের রামায়ণের বাণী আমাকে যত উৎসাহিত করে তেমন আর কিছুতে করে না। হিন্দু ধর্মপুস্তকের মধ্যে এই দুইটি গ্রন্থ ভালো করিয়া পড়িয়াছি। আজ হিন্দু তীর্থগুলিতে ধর্মের নামে যে গ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি। কিন্তু শত ত্রুটি সত্ত্বেও তীর্থগুলি আমার পরম প্রিয় হইয়া আছে।

পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়ার চেষ্টাই আমার জীবন, কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল্যবান পুরাতন তত্ত্বগুলির পরিবর্তন বা ত্যাগ কোনটিই আমি করিতে পারি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-২১, ৩১৮]

গুরুবাদ

৭৫২। হিন্দুধর্মে গুরুর নিকট দীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। আমি বিশ্বাস করি, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য তাহা বিশেষ মূল্যবান। এই গুরুবাদ বহু পরিমাণে সত্য, গুরুর সহায়তা ভিন্ন সত্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। সাংসারিক ব্যাপারে স্বল্প-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক কার্যকরী হইতে পারে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সেরূপ একেবারে অচল। যিনি অনেক জানিয়াছেন, যিনি জ্ঞানী ও দ্রষ্টা, কেবল তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করা যায়।

[আত্মচরিত, ১১৩]

৭৫৩। বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন অযোগ্য ব্যক্তিকে গুরুর পদে বরণ করা না হয়। বরঞ্চ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বহু ভুল-ত্রুটির মধ্য দিয়া সত্যে পেঁাছানো ভালো, তাই বলিয়া এমন লোকের কাছে দীক্ষা নেওয়া কখনও উচিত নয় যিনি জানেন না তাঁর কি জানা নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১২-২৫, ৪২২]

মূর্তিপূজা

৭৫৫। আমরা যে মানুষ তাহা ভুলিয়া গিয়া আঘাতের বদলে আঘাত হানিয়া আমরা কি গৌরব বোধ করিব? যদি কোন নির্বোধ মন্দির অপবিত্র করে বা দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া দেয় তাহার পরিবর্তে হিন্দুরা কি মসজিদ্ ভাঙ্গিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে? এরূপ করিলে কি মন্দির রক্ষা পাইবে, বা হিন্দুধর্ম নিরাপদ হইবে? যাহারা মন্দির বা মসজিদ নষ্ট করে তারা নিজেরাই ঘোর পৌত্তলিক এবং যারা তার পক্ষে

বলে তারাও তা-ই। এ কথা তাহারা মনে মনে জানে, যদিও প্রকাশ্যে কেহই নিজেকে পৌত্তলিক বলিয়া স্বীকার করিবে না। সকলেই জানে মানুষ ধ্যানকে বাস্তব রূপ দিতে খুবই আগ্রহশীল। মসজিদ বা গির্জা এ বিষয়ে মন্দির হইতে ভিন্ন কিসে? ভগবান সর্বত্র বিরাজ করেন, তিনি কাষ্ঠখণ্ডে আছেন, পাথরে আছেন, আবার মানুষের প্রতিটি চুলেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু মানুষ বিশেষ বিশেষ স্থানে বা বস্তুতে দেবত্ব আরোপ করে, অপর স্থান বা বস্তুতে তেমন পবিত্রতা আছে বলিয়া মনে করে না। যদি এই অধিকার সকল মানুষের সমানভাবে থাকে তাহা হইলে এ প্রবৃত্তিকে নিন্দা করিবার কিছুই নাই। সকল হিন্দু-মুসলমানকে গান্ধীজী বলেন যে, যদি কোথাও কোন বলপ্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। গান্ধীজীর নিজের মত হইল, তাঁহার পূজা করার স্বাধীনতায় যদি কেহ বলপ্রয়োগের দ্বারা বাধা দেয় তাহা হইলে তিনি দেবমূর্তিকে রক্ষা করিতে প্রাণ বিসর্জন করিতেও প্রস্তুত।

[হরিজন, ৩০-৩-৪৭, ৮৬]

অবতারবাদ

৭৫৬। হিন্দুদের মতে, যিনি মানুষের জন্য মহৎ কিছু করিয়া যান তাঁহাকে অবতার আখ্যা দেওয়া হয়। এ সংসারে প্রাণের লীলায় যত জীব সৃষ্টি হইয়াছে সকলকেই ভগবানের অবতার বলা যায়—যদিও প্রচলিত সংস্কার মতে সব কিছুকে ভগবানের অবতার বলা হয় না। যদি ধর্মাচরণের জন্য কেহ বহু লোকের ভক্তির পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন, ভবিষ্যৎ বংশ তাঁহাকে অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। ইহাতে আমি কোন দোষ দেখি না। এতদ্দ্বারা ভগবানের মহিমা তিলমাত্র লাঘব করা হয় না—সত্যের সহিত কোন বিরোধও ঘটে না। একটি উর্দু প্রবাদে বলে, 'আদম ভগবান নহেন, তবে ঈশ্বরের জ্যোতির একটি কণিকা দিয়াই আদম রচিত

হইয়াছেন।' যাঁদের আচরণে ধর্ম প্রকাশ পায় তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের জ্যোতির আধিক্য নিশ্চয়ই আছে। এই ভাবনা হইতে হিন্দুরা কৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার বলিয়া জ্ঞান করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৮-৩১, ২০৫]

বংশানুক্রম

৭৫৭। সন্তান পিতৃপুরুষের আকৃতি লাভ করে, আবার তাঁদের প্রকৃতিরও অংশ পায়। শিশুর চরিত্রগঠনে আবেষ্টনের প্রভাব প্রবল—কিন্তু আবেষ্টন যে স্বভাবের উপর কাজ করে তাহা পিতৃপুরুষের দান।

[আত্মচরিত, ৩৮১]

বর্ণাশ্রম

৭৫৯। বর্ণাশ্রমের দ্বারা জন্মগত কর্মবিভাগ সহজ হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আজকালকার জাতিভেদ বর্ণাশ্রমের বিকৃতি। বর্ণাশ্রমে কেহ উচ্চ কেহ নীচ নয়, যে যাহার কর্তব্য পালন করে মাত্র। অবশ্য আমি বলি যে, বর্ণ জন্মগত ব্যাপার। সেই সঙ্গে আমি ইহাও বলিয়াছি যে, একজন শূদ্র বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বৈশ্যের করণীয় করার জন্য তাহার বৈশ্য আখ্যা নেওয়ার প্রয়োজন নাই। যিনি এ জীবনে ব্রাহ্মণের কর্তব্য পালন করিবেন তিনি পরজন্মে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৪-২৫, ১৪৫]

৭৬২। শাস্ত্রগ্রন্থের বহু শ্লোক পরিষ্কার বলে যে, কে কোন ঘরে জন্মিয়াছে তাহার কোন আত্যন্তিক মূল্য নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ কর্মের দ্বারা ও চরিত্রের দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে যে সে নিজ বর্ণের কর্তব্য পালন করিয়া বর্ণের মর্যাদা রক্ষা করিতেছে। এই সকল শাস্ত্রবাক্যে এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে—

(ক) কোন ব্যক্তি যদি তাহার বর্ণানুযায়ী গুণ অর্জন বা প্রদর্শন করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার বর্ণ লোপ পাইবে।

(খ) অন্য বর্ণের সহিত আহার করিলে বা বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হইলেই বর্ণ লোপ হয় না, হয় নিজ বর্ণের গুণ প্রকাশ করিতে না পারিলে।

(গ) জন্মের ফলে প্রারম্ভে সুবিধা হইলেও এবং পিতামাতার সাহায্যে বর্ণানুযায়ী শিক্ষা ও অভ্যাস গড়িয়া উঠিলেও যদি কাজে কোন ব্যক্তি বর্ণের গুণ দেখাইতে না পারে তাহার বর্ণ স্থায়ী হইতে পারে না।

[হরিজন, ১৫—৪-৩৩, ২]।

জাতিভেদ

৭৬৬। আমাদের বর্তমান জাতিভেদ প্রকৃতপক্ষে বৃত্তি অনুযায়ী দল বাঁধা মাত্র।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-৪-২১, ১১৪]

৭৬৫। এই যে বিরাট জাতিভেদ প্রথা, ইহার বলে সমাজের ধর্মসম্বন্ধীয় প্রয়োজনই শুধু সাধিত হইত না, ইহার দ্বারা রাজ্য-শাসনব্যবস্থাও সম্পন্ন হইত। গ্রামীণ সমাজ এই জাতিভেদ প্রথার সাহায্যে গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাপনা চালাইতে পারিত। আবার বাহির হইতে রাজশক্তির জুলুম এই জাতিভেদের সাহায্যে প্রতিরোধ করাও সম্ভব হইত। যে জাতি এইরূপ একটি সুশৃঙ্খল কর্মধারা রচনা করিতে পারিয়াছিল তাহার ব্যবস্থাপনার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

[রাইটিংস এ্যাণ্ড স্পীচেস অব মহাত্মা গান্ধী, নটেশন, ৩৫৯]

৭৬৭। জাতিভেদ বনাম বর্ণভেদের সম্বন্ধে আমার মনে হয় চতুর্বর্ণের বিভাগই মূল, স্বাভাবিক ও একান্ত প্রয়োজনীয়। যে অগণ্য ছোট জাতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সুবিধা যেমন হইয়াছে তেমনি অসুবিধাও অনেক হইয়াছে। এখন যত তাড়াতাড়ি এই

ক্ষুদ্র ভেদগুলি লোপ পাইয়া মূল .চারি বর্ণ গড়িয়া ওঠে ততই মঙ্গল।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-২০, ঠাকুর, ৬১০]

৭৭০। জাতির সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। জাতিভেদ, আধ্যাত্মিক ও জাতীয় উন্নতি উভয়েরই পক্ষে ক্ষতিকারক।

[হরিজন—]

৭৭১। আজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কেবল নাম মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ণ বলিতে আমি যাহা বুঝি সেই সূত্রে বিচার করিলে বলা যায়, পুরাপুরি বর্ণবিভ্রাট ঘটিয়া গিয়াছে। মনে হয় এখন হিন্দুমাত্রেরই নিজেকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মাহাত্ম্য প্রকট ও বর্ণাশ্রম ধর্মকে উহার যথার্থ গৌরবে পুনরুজ্জীবিত করিবার উহাই একমাত্র পথ।

[হরিজন, ২৫-৩-৩৩, ৩]

আন্তঃবর্ণ বিবাহ ও পানভোজন

৭৭২। আমি বিশ্বাস করি না যে, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে একত্র ভোজনের প্রথা চলিলে বা অন্য বর্ণের সহিত বিবাহ ঘটিলে কোন ব্যক্তির জন্মগত গুণ নষ্ট হয়। চতুর্বর্ণের দ্বারা প্রত্যেক পরিবারের কর্মধারা নির্দিষ্ট হয় মাত্র, তাহার দ্বারা সামাজিক মেলামেশার কোন বাধা সৃষ্টি হইতে পারে না। বর্ণাশ্রম প্রত্যেকের কর্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়, তদ্দ্বারা কোন বিশেষ সুখ সুবিধা পাওয়ার প্রশ্ন আসে না। আমরা সকলেই ভগবানের রাজ্যে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে জন্মিয়াছি—ব্রাহ্মণ তাঁহার জ্ঞান দিয়া, ক্ষত্রিয় তাঁহার আর্তকে রক্ষা করার শক্তি দিয়া, বৈশ্য তাঁহার ব্যবসায়িক বুদ্ধি দিয়া, শূদ্র তাঁহার কায়িক পরিশ্রম দিয়া ভগবানের নির্দেশ পালন করিবে। কিন্তু এই নিয়মের দোহাই দিয়া এমন ঘটিতে দেওয়া যায় না যে ব্রাহ্মণ শরীরশ্রম বর্জন করিবেন বা নিজেকে ও অপরকে রক্ষার চেষ্টা করিবেন

না। জন্মের ফলে ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ জ্ঞানের চর্চা করিবেন যেহেতু জন্ম ও সংস্কার তাঁহাকে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছে। আবার বর্ণাশ্রম শূদ্রকে জ্ঞান অর্জন করিতে বাধা দেয় না। কেবল এইটুকু বলে যে, শূদ্র তাহার দৈহিক শক্তি দিয়া সংসারের সেবা করুক, সে যেন অপরের অন্য বিশেষ শক্তি আছে বলিয়া ঈর্ষা না করে। বর্ণাশ্রম শিক্ষা দেয় আত্মসংযম, উহা শক্তির অপচয় নিবারণ করিয়া সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করে।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে পানভোজন ও বিবাহাদি ক্রিয়া চলিলে বর্ণাশ্রম ক্ষুণ্ণ হয় না, কিন্তু হিন্দুধর্ম বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পানভোজন বা বিবাহে বাধা দেয়। হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেয়, দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আত্মার মুক্তির সন্ধানে রত হও। হিন্দু নিজের পুত্রের সহিত ভোজন করাকেও কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। বিশেষ দলের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ সীমাবদ্ধ করিয়া হিন্দু আত্মসংযম শিক্ষা দেয়। হিন্দুর মতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহ বা একত্র ভোজন সম্বন্ধে বাধানিষেধ আত্মার উর্ধ্বগতির সহায়ক। কিন্তু বর্ণাশ্রমে এই কঠোরতার কোন মূল্য নাই। ব্রাহ্মণ তাঁর শূদ্র মিত্রের সহিত একত্র ভোজন করিলে কিছুই ক্ষতি নাই, যদি তিনি জ্ঞানের সাধনের দ্বারা তাঁর নিজ কর্তব্য প্রতিপালন করিতে থাকেন। এই যুক্তি দিয়া বিচার করিলে বুঝা যায়, আহার বা বিবাহ সম্বন্ধে বিধিনিষেধগুলি কোন বর্ণকে ছোট বা কোন বর্ণকে বড় করার জন্য রচিত হয় নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-২১, ৩১৭]

অস্পৃশ্যতা

৭৮০। ছুৎমার্গ হিন্দুসমাজের ব্যাধি স্বরূপ। যাহাকে এই ব্যাধিতে ধরিয়াছে তাহার নির্মম হৃদয় আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ হয়। ধর্ম ও নীতি তুইয়ের দৃষ্টিতেই এ ব্যাধি অতি জঘন্য।

[হরিজন, ২০-৪-৩৪, ৭৩]

৭৮২। আবার জন্মাইতে হইবে এমন বাসনা আমার নাই ; তবে যদি জন্মাইতেই হয় তাহা হইলে আমি যেন অস্পৃশ্যের ঘরে জন্মলাভ করি। অস্পৃশ্যদের যে দুঃখ, যে কষ্ট, যে অপমান জোটে, আমি যেন তাহার ভাগী হইয়া নিজের ও সেই সঙ্গে তাহাদের দুর্দশা ঘুচাইতে পারি—এই প্রার্থনা করি। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র হইয়া জন্মাইতে চাহি না, যদি জন্মগ্রহণ করিতেই হয় তাহা হইলে আমি যেন অতি-শূদ্র হইয়া জন্মাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৫-২১, ১৪৪]

জীববলি

৭৮৪। শোনা যায় বেদে জীববলির ব্যবস্থা আছে। তাহাতে কি আসে যায়? সত্য ও অহিংসার ধর্মে প্রাণিবধ চলিতে পারে না তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। বেদ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের অভাব আমি সরলভাবে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এই বিষয়ে বিচারের জন্য সে অক্ষমতায় কিছু বাধা সৃষ্টি করে না। যদি এমনও হয় যে বৈদিক সমাজে নিত্য প্রাণিহত্যা হইত, তাহা অহিংসার পূজারীর পক্ষে কোন নজীর সৃষ্টি করে না।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ৭৭]

শব্দার্থের ক্রমবিকাশ

৭৮৭। অভিজ্ঞতার ফলে আমি মানিয়া লইয়াছি যে, মানুষ যেমন ক্রমপরিবর্তনের ফলে বদলাইয়া যাইতেছে, শব্দের অর্থেরও সেইরূপ ক্রমবিকাশ ঘটে ও পরিবর্তন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সর্বজানিত ও বহুব্যবহৃত শব্দ God বা ঈশ্বর সকল লোকের মনে একই চিত্র ফুটাইয়া তোলে না। বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ফলে ঈশ্বর শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বুঝিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-২৭, ২৫০]

৭৮৯। "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ
মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

এই সংস্কৃত শ্লোকের আমি এইরূপ অর্থ বুঝি—

'সত্য কথা মধুরভাবে বলা উচিত। যদি কেহ মধুরভাষণে সত্য বলিতে না পারে, তাহার তাহা না বলাই ভালো, অর্থাৎ যাহার বাক্সংযম নাই তাহার সত্যোপলব্ধিও নাই।'

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-৯-২০, ৩১৮]

অষ্টাদশ পর্ব

ভারতে নারীর সমস্যা

৭৯০। ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তাহার রমণীকুলের ত্যাগ ও চেতনার উপর, ইহা আমার সুস্পষ্ট অভিমত।

[হরিজন, ২৭-৬-৩৬, ১৫৩]

৭৯১। যখন আমি সত্যাগ্রহের পন্থা আবিষ্কার করিলাম, তখনই যথার্থভাবে নারীর সেবা করিবার পথ পাইলাম ভাবিয়া আনন্দলাভ করিলাম। জনৈক পত্রলেখক বলিয়াছেন যে একই পন্থায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। যদি তাই ঠিক হয়, তাহা হইলে বুঝিব কোন পুরুষই নারীর কল্যাণের পথ দেখিতে পাইবে না। যতই চেষ্টা হউক না কেন পুরুষ নারীর সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না, কারণ প্রকৃতি তাহাকে নারী হইতে অন্যরূপ করিয়া গড়িয়াছে। লাঙ্গলের ফালের নীচে থাকে বলিয়াই ভেক বুঝিতে পারে ফালের তীক্ষতা কেমন। সুতরাং কেবল স্ত্রীলোকই বুঝিতে পারিবে তাহাদের সমস্যার সমাধান কোথায়। এ বিষয়ে আমার মত স্বতন্ত্র। যেহেতু স্ত্রী ও পুরুষ মূলতঃ ভিন্ন নয়, তাহাদের মূল প্রয়োজনও এক হইতে বাধ্য। স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের আত্মার ভেদ নাই। উভয়ের অনুভূতির প্রকৃতি অভিন্ন। স্ত্রী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। পরিপূর্ণ জীবন লাভ করিতে হইলে স্ত্রী ও পুরুষকে পরস্পরসাপেক্ষ হইয়া চলিতে হইবে।

এই যুক্তি সত্য হইলেও বাস্তব জীবনে দেখা যায়, অতি প্রাচীন কাল হইতে পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে, যার ফলে স্ত্রীলোক নিজেকে ছোট ভাবিয়া অভিযোগ পোষণ করিয়া আসিতেছে। নিজের সুবিধার জন্য পুরুষ স্ত্রীলোককে শিখাইয়াছে পুরুষের অধীনে থাকিতে, নারীও সে যুক্তি স্বীকার করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু দ্রষ্টা ও জ্ঞানী পুরুষ চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে সমান।

এতৎসত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে তুইয়ের ভিতর স্বাতন্ত্র্য আছে। যদিও উভয়ে মূলতঃ এক, তথাপি এ কথা সত্য যে আকৃতিতে তুইয়ের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান রহিয়াছে। কাজেই তুইয়ের কার্যধারার পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। সন্তান ধারণ ও পালনের যে কর্তব্য বেশীর ভাগ স্ত্রীলোককে সর্বদা মান্য করিয়া চলিতে হইবে সেজন্য যে বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা থাকা দরকার পুরুষের তাহা প্রয়োজন হয় না। সংসারের জন্য পুরুষ নিজ প্রেরণায় কাজ করিয়া চলে, নারী সংসারকে মাধুর্য দেয়। গৃহ পরিবারে নারীই গৃহিণীর পদে অধিষ্ঠিতা। পুরুষ আহার্য সংগ্রহ করিয়া আনে, নারী সকল ভোজ্য সযত্নে রক্ষণ ও বণ্টন করিয়া তৃপ্ত হয়। নারীই প্রকৃতপক্ষে সংসার রক্ষা করিয়া থাকে। সমাজের শিশুদের লালন পালন করা নারীরই বিশেষ অধিকার। নারী যদি এ কাজে মন না দেয়, মনুষ্যজাতি লোপ পাইবে।

নারী যদি গৃহকর্ম ত্যাগ করিয়া গৃহ পরিবার রক্ষার জন্য অস্ত্রগ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই অধঃপতন হয়। এরূপ ঘটিলে মানুষ বর্বরতায় ফিরিয়া যাইবে ও মনুষ্যসমাজের ধ্বংসের সূচনা ঘটিবে। পুরুষের করণীয় কাজ যদি স্ত্রীলোক করিতে যায় তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষ তুইয়েরই অধঃপতন ঘটিবে। নারীকে নিজ কার্য ছাড়িয়া পুরুষের কাজে প্রলুব্ধ বা বাধ্য করার অপরাধ পুরুষেরই হইবে। বাহিরের আক্রমণ হইতে গৃহ পরিবারকে রক্ষা করিতে যে বীরত্বের প্রয়োজন হয় গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে তার চেয়ে কম বীরত্বের প্রয়োজন হয় না।

লক্ষ লক্ষ কৃষক স্ত্রী ও পুরুষকে তাহাদের স্বাভাবিক আবেষ্টনে লক্ষ্য করিয়াছি, আজও সেগাঁও-এর মত ক্ষুদ্র গ্রামে প্রত্যহ তাহাদিগকে দেখিতেছি। ফলে স্ত্রী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র যে ভিন্ন এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে। কোথাও দেখি নাই যে স্ত্রীলোক কামার বা ছুতারের কাজ করে। উভয়েই ক্ষেতে কাজ করে বটে, ভারী কাজগুলি সবই করে পুরুষে। স্ত্রীলোক গৃহকর্ম করিয়া সকলের

সেবার ভার লয়। তাহারা নানা ভাবে গৃহস্থের আয়বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচ করে বটে কিন্তু সংসারের ব্যয়নির্বাহের ভার প্রধানতঃ পুরুষেরই দায়িত্ব।

স্ত্রী ও পুরুষের কাজের ক্ষেত্রের বিভিন্নতা মানিয়া লইয়াও বিচার করিলে দেখা যায় উভয়ের একই প্রকার সদ্‌গুণ ও শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন।

এই মহাসমস্যার সমাধানকল্পে, কি জাতি কি ব্যক্তির জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার সার্থকতা প্রমাণ করাই আমার বিশেষ কাজ। আমি এই আশা সাগ্রহে পোষণ করি যে, এই প্রচেষ্টায় নারী অবিসংবাদিতভাবে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে এবং মানুষের জয়যাত্রায় নিজের যোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া নারী তাহার ন্যূনতা পরিহার করিতে সক্ষম হইবে। যদি দক্ষতার সহিত নারী তার উপযুক্ত আসনে বসিতে পারে তাহা হইলে তাহার কর্তব্য হইবে, মানুষের সকল কিছুই কামপ্রবৃত্তির দ্বারা নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়—আধুনিক এই যে কুশিক্ষার প্রচলন হইয়াছে, দৃঢ়ভাবে এই কুসংস্কার বর্জন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা। হয়তো প্রস্তাবটি তেমন সুষ্ঠুভাবে উপস্থিত করিতে পারিলাম না, এরূপ আশঙ্কা সত্ত্বেও আশা করি আমার মনের কথা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি। আমার মনে হয় না যে, কোটি কোটি লোক যারা এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত রহিয়াছে তারা কামপ্রবৃত্তির ধোঁকাবাজীর এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। যে কোটি কোটি কৃষক স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে মাঠে কাজ করে তারাও এই অলীক ধোঁকার প্রকোপে ভ্রান্ত বা পরিচালিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না এ কথা আমি বলি না বা বুঝাইতেও চাহি না যে, এই সকল স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতিদত্ত কামপ্রবৃত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত। কিন্তু যারা আধুনিক কামকাহিনীরঞ্জিত রাশি রাশি প্রচলিত পুস্তক পড়িয়া কামপ্রভাবে পরিচালিত হইতেছে তাদের মত এদের জীবনে কামপ্রবৃত্তির প্রভাব নিশ্চয়ই তেমন নয়। স্ত্রী বা পুরুষ

যারা কঠিন বাস্তব জীবনে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে চায় তাদের এই অবাস্তব চিন্তার সময় কোথায় ?

এই পত্রিকায় পূর্বে বলিয়াছি যে, নারী অহিংসার মূর্ত প্রকাশ। অনন্ত প্রেমই অহিংসা—তাহার অর্থ হইল দুঃখ বরণ করিবার অশেষ শক্তি। যে মা মানুষকে বুকে করিয়া বাঁচাইয়া রাখেন তাঁর মত আর কে সে শক্তি ধারণ করে ? মা সেই শক্তি দেখান যখন নয় মাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও পোষণ করিয়া সানন্দে গর্ভ-যন্ত্রণা সহ্য করেন। প্রসবযন্ত্রণার মত কষ্ট আর কী হইতে পারে ? সৃষ্টির আনন্দে মা সেই কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন না। তারপর প্রতিটি দিন কত কষ্টে কত চেষ্টায় শিশুকে বড় করিয়া তোলেন। নারী তার অপার প্রেমের ক্ষেত্র পরিবর্ধন করিয়া সমগ্র মানবসমাজের দিকে প্রবাহিত করিয়া দিক আর সে ভুলিয়া যাক যে সে পুরুষের কামনার সামগ্রী। দেখা যাইবে, জন্মদাত্রী মাতৃরূপে নারী পুরুষের সমকক্ষ হইয়া নীরব নেতৃত্বের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। যুদ্ধক্লিষ্ট পৃথিবী শান্তির পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া আছে, নারী সেই আকাঙ্ক্ষিত শান্তির কৌশল মানুষকে শিখাইবে। সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব করিবার শ্রেষ্ঠ অধিকার নারীর। সত্যাগ্রহে পুঁথি-পড়া বিদ্যার প্রয়োজন হয় না—সত্যাগ্রহে চাই ত্যাগ ও বিশ্বাসের উপর যে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত সেই ত্যাগনিষ্ঠ আত্মচেতনা।

পুনায় স্যাসুন হাসপাতালে যখন আমি রোগশয্যায় পড়িয়া ছিলাম সেই সময়ে যে দয়াবতী মহিলা আমার শুশ্রূষা করিতেন তিনি এক নারীর কাহিনী বলিয়াছিলেন। সেই নারীর দেহে অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁহাকে ক্লোরোফর্ম সাহায্যে অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। তাঁহার গর্ভে ছিল সন্তান। পাছে ক্লোরো-ফর্মের ক্রিয়ায় গর্ভস্থ সন্তানের কোন ক্ষতি হয় এজন্য ক্লোরোফর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া অস্ত্রোপচারের নিদারুণ কষ্ট সহ্য

করিয়াছিলেন। সন্তানের প্রতি অপার মমত্বই ছিল তাঁহার ধর্ম, সন্তানকে বাঁচাইতে কোন দুঃখবরণেই তাঁহার আপত্তি ছিল না। যে মহীয়সী নারী এমন অনেক দুঃখ বরণ করিতে পারেন, সেই নারী যেন নারীত্বকে ছোট বলিয়া মনে না করেন বা পুরুষ হইয়া না জন্মানোর জন্য মিথ্যা আক্ষেপ মনে না রাখেন। সেই বীর রমণীর কথা স্মরণ করিয়া বহুবার আমি তাঁহার মাহাত্ম্যকে ঈর্ষা করিয়াছি। সে কথা যদি সকল নারীকে জানাইতে পারিতাম! নারী যদি পুরুষ হইয়া জন্মাইতে চায়, পুরুষেরও নারী হইয়া জন্মাইতে চাহিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এ কামনা তো পূরণ হইবার নয়। যেভাবে ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সানন্দে মানিয়া লইয়া স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেকে নিজের কর্তব্য সুসম্পাদন করার চেষ্টা যেন করি।

[হরিজন, ২৪-২-৪০, ১৩]

সমস্যা কোথায়?

৭৯২। সকল মন প্রাণ দিয়া আমার দেশের নারীজাতির সর্বপ্রকার স্বাধীনতা কামনা করি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া সর্বান্তঃকরণে মন্দ বলিয়া মানিয়াছি। শিশুকন্যা বিধবা হইয়াছে দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আবার যখন দেখি সদ্য মৃতদার পুরুষ কালবিলম্ব না করিয়া পরম ঔদাসীন্যভরে আবার বিবাহ করিতে চলিয়াছে তখন ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে। বহু পিতামাতা কন্যাকে লেখাপড়া শেখানো দূরে থাক, কোনরূপ শিক্ষাই না দিয়া অবস্থাপন্ন ঘরের বরের সহিত বিবাহ দিবার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। এই অমানুষিক অবহেলায় আমি পরম লজ্জা অনুভব করি। কিন্তু আমার যত আক্ষেপ, যত দুঃখই হউক না কেন, সমস্যার জটিলতা অস্বীকার করা যায় না। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার থাকা চাই এবং সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত সমান

অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু এইটুকু হইলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। যেখানে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে স্ত্রীলোক নিজের মত কার্যকর করিতে পারিবে সেখান হইতে সমস্যার সূত্রপাত বলা যায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৭-১, ২২৯]

বিবাহের আদর্শ

৭৯৩। দৈহিক মিলনের পথে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেমে পৌঁছানোই বিবাহের আদর্শ। বিবাহের দ্বারা যে মানুষী প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয় সাধনা দ্বারা সেই প্রেম আমাদিগকে অমর বিশ্বপ্রেমের দ্বারে আনিয়া দিতে পারে।

৭৯৪। স্ত্রী স্বামীর দাসী নয়—স্ত্রী স্বামীর সহযাত্রী ও সহকর্মী। স্বামীর সকল সুখদুঃখের অংশভাগিনী। নিজের কর্তব্য বাছিয়া লইতে স্বামীর যতটুকু অধিকার আছে স্ত্রীর অধিকারও তাহা হইতে বিন্দুমাত্র কম নয়।

[আত্মচরিত, ৩৮]

৭৯৫। শিশু-বিবাহে পিতা কন্যাকে দান করেন; কন্যা কি পিতার সম্পত্তিবিশেষ যে তিনি কন্যাকে ইচ্ছামত দান করিতে পারেন? পিতা সন্তানের রক্ষক মাত্র; পিতৃত্বে কোন মালিকানা সৃষ্টি হইতে পারে না। যদি পিতা কন্যার স্বাধিকারের সম্মান রক্ষা করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর রক্ষক বলা যাইবে না।

যে পিতা শিশুকন্যাকে বৃদ্ধের সহিত বিবাহে সম্প্রদান করিয়াছেন বা বালকের সহিত বিবাহ দিয়া মহাপাপ করিয়াছেন তার পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হইল বিবাহযোগ্যা বিধবা কন্যার বিবাহের চেষ্টা করা। পূর্বেই বলিয়াছি যে, অযোগ্য বিবাহ ঘটা মাত্রই তাহা আইনে অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা উচিত।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-১১-২৬, ৩৮৮]

পণপ্রথা

৭৯৮। পণপ্রথার উচ্ছেদ করিতে হইলে স্কুলে ও কলেজে এবং কন্যাদের পিতামাতাদের মধ্যে (পণপ্রথা-বিরোধী ভাবনার) বহুল প্রচার ঘটানো প্রয়োজন। পিতামাতা কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দিবেন, তারা যেন পণমূল্য দিয়া বিবাহিত হওয়ার গ্লানি বহন না করিয়া বরং চিরদিন অবিবাহিত থাকাই শ্রেয় মনে করে। বর ও কন্যার পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও স্বাধীন সম্মতি বিবাহের একমাত্র সর্ত বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-১২-২৮, ৪ ১]

৮০০। একটি আত্মহত্যার ঘটনা উপলক্ষ্যে গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন—

যে বিবাহ বিশেষ কোন সমাজ স্বীকার করিতে চাহে না, সে বিবাহ সহসা মানিয়া লওয়া যায় না, এমনকি ব্যক্তিবিশেষের প্রবল আগ্রহ থাকিলেও মানিয়া লওয়ার পক্ষে মত দিতে পারি না। অপর দিক দিয়া বিচার করিলে, কি সমাজ, কি বিবাহার্থীদের আত্মীয়স্বজন, তাঁহারা তাঁহাদের মত জোর করিয়া বিবাহার্থী যুবকযুবতীর উপর চাপাইয়া তাহাদের স্বাধীনতা ব্যাহত করিবেন ইহাও ভালো মনে করি না। পত্রলেখক যে ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে বিবাহার্থী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ছিলেন পূর্ণবয়স্ক, নিজের ভালো-মন্দ বিচার করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তারা বিবাহেচ্ছু হইলে জোর করিয়া বাধা দিবার অধিকার কাহারও ছিল না। সমাজের অধিকার ছিল তাহাদের বিবাহ স্বীকার না করার, তাই বলিয়া চরম অত্যাচারের দ্বারা তাহাদিগকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করা পরম পরিতাপের বিষয়।

বিবাহের পথে যে সংস্কারগত বাধা আছে তার সকলগুলি সর্বত্র প্রযোজ্য নয়, সেগুলি বিশেষ দেশের বিশেষ সমাজের সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্কার বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আবার সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পৃথক্ আকারে বর্তমানে আছে। ইহার অর্থ

এইরূপ নয় যে, যুবকযুবতীরা ইচ্ছামত সমাজের সংস্কারগত বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করিবে। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে হইলে বিবাহ করার পূর্বে নিজপক্ষে মতপরিবর্তনের যথেষ্ট চেষ্টা করিতে হইবে। এই মতপরিবর্তন সময়সাপেক্ষ, বিবাহার্থীদের এজন্য ধৈর্য অবলম্বন করিতে হইবে। যদি শান্তভাবে ধৈর্য সহকারে এ কাজ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে বিবাহ করিয়া এই প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

এ বিষয়ে সমাজেরও কিছু করণীয় আছে। কেহ প্রচলিত সংস্কারের পথে না চলিলেই যে তাহার উপর বিমাতৃসুলভ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে হইবে ইহাও কাম্য নয়। সাংবাদদাতা যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে সমাজের যে অত্যাচারে বর-বধূ আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহার পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের স্কন্ধেই রহিয়া গিয়াছে।

[হরিজন, ২৯-৫-৩৭, ১২৫]

৮০২। "আপনার উক্তিতে বুঝা যায় যে, আপনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ অনুমোদন করেন ; আবার সেই সঙ্গে ইহাও বলেন যে, সেরূপ ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী নিজের নিজের ধর্ম অনুসরণ করিবেন। এ কথাও বলিয়াছেন যে, ধর্মসম্পর্কহীন আইন-সিদ্ধ বিবাহও আপনি অনুমোদন করেন। ভিন্নধর্মাবলম্বী দুইজন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমরণ নিজ নিজ ধর্ম পালন করিয়া চলিয়াছেন এমন ঘটনা কি আপনার জানা আছে? যে বিবাহ কেবলমাত্র আইনসিদ্ধ তাহা কি ধর্মবিরুদ্ধ বা ধর্মহানিকর নয়?"

গান্ধীজীর উত্তর—গান্ধীজী প্রশ্ন দুইটির যাথার্থ্য স্বীকার করেন। এমন কোন ঘটনা তাঁহার মনে পড়ে না যেখানে ভিন্নধর্মাবলম্বীরা বিবাহ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত নিজ নিজ ধর্মে নিষ্ঠা রাখিয়া চলিয়াছেন ; কারণ তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে যেখানে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাঁহারা সকলেই আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। তবে তিনি এইরূপ কয়েকটি

দম্পতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিয়াছেন। এইরূপ ঘটনার বিষয়ে তিনি ইহাও বলিতে পারেন যে, অতীতে নজীর খুঁজিয়া না বেড়াইয়া সকলে যদি নব নব দৃষ্টান্ত স্থাপনে অগ্রসর হন তাহা হইলে ভীরু ব্যক্তিরা দুর্বলতা পরিহার করিবার ভরসা পায়।

সিভিল বা আইনসিদ্ধ বিবাহ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এইরূপ বিবাহপদ্ধতিতে তাঁহার বিশ্বাস নাই, তবে জাতির কল্যাণের জন্য এই নব অভিযানের যে প্রয়োজন ছিল তাহা সাধিত হইয়াছে।

[হরিজন, ১৬-৩-৪৭, ৬৭]

বিবাহিত জীবন

৮০৪। গুণবতী, দেশসেবিকা জনৈকা ভগিনী পণ করিয়াছিলেন যে দেশের সেবার জন্য তিনি আজীবন অবিবাহিতা থাকিবেন। সহসা তাঁহার মনের মানুষের সাক্ষাৎ পাইয়া ইদানীং বিবাহ করিয়াছেন। তিনি মনে করিতেছেন যে, উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিতে সংকল্প করিয়াও সংকল্পচ্যুত হইয়া তিনি অন্যায় করিয়াছেন। আমি তাঁহার এই ভ্রম দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেবার জন্য বিবাহ না করা অবশ্যই অতি মহৎ আদর্শ, কিন্তু ইহাও সত্য যে লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে একজনও সে কাজ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। বিবাহ মনুষ্য-জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজন—বিবাহকে অন্যায় জ্ঞান করার কারণ নাই। যদি কেহ মনে করেন তাঁহার পতন হইয়াছে তাহা হইলে বহু প্রয়াস করিয়াও হৃতগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন। বিবাহকে ধর্মসাধনের অঙ্গ মনে করিয়া বিবাহিত জীবনে সংযম অবলম্বনের আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। হিন্দুধর্মে বিবাহকে চারি আশ্রমের একটি বলিয়া গণ্য করা হয়, বস্তুতঃ অপর তিনটি আশ্রম একই আদর্শের উপর নির্ভর করে।

এই ভগ্নী অথবা তাঁর মত আদর্শপরায়ণা অপর সকল ভগ্নীর

বিবাহকে নিন্দনীয় মনে করা উচিত হইবে না। বিবাহ একটি ধর্মানুষ্ঠান, সেইভাবেই বিবাহ-ধর্ম প্রতিপালন করা উচিত। যদি বিবাহিত দম্পতি যথোপযুক্ত আত্মসংযম অভ্যাস করেন, দেখিতে পাইবেন তাঁহাদের সেবার শক্তি বাড়িয়া চলিয়াছে। যিনি সেবাকেই অবলম্বন করিতে কামনা রাখেন, তিনি নিজ আদর্শের অনুগামী ব্যক্তিকেই যেন বিবাহ করেন। তাঁহাদের যুগ্ম সেবায় দেশের উন্নতি হইবে।

[হরিজন, ২২-৩-৪২, ৮৮]

বিবাহবিচ্ছেদ

৮০৫। বিবাহের দ্বারা একজন স্ত্রী একজন পুরুষ অন্য সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরস্পরের স্বাধীন ইচ্ছায় মিলনের অধিকার লাভ করে। কিন্তু বিবাহের ফলে কোন পক্ষই এমন অধিকার লাভ করে না যাহার দ্বারা একজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপর জন তাহাকে মিলনে বাধ্য করিতে পারে। যখন বিবাহিত দম্পতির কোন একজন নৈতিক বা অপর কোন কারণে অপরজনের মিলনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে পারে না তখন কি হইবে, ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। যদি কেবলমাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের (Divorce) দ্বারা এ স্বাধীনতা বজায় রাখা যায় তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিবাহবিচ্ছেদে রাজী আছি। তাহা না হইলে মানুষের নীতিধর্মের অধঃপতন ঘটিবে। অবশ্য এ যুক্তি কেবল সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে নৈতিক প্রয়োজনেই এই সমস্যার উদ্ভব হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১০-২৫, ৩৪৬

৮০৭। বিধবা-বিবাহে কোন পাপ নাই। পাপই যদি হইবে তাহা হইলে বিপত্নীকের বিবাহে যে পাপ ঘটে তাহার অপেক্ষা অধিক পাপ ইহাতে স্পর্শে না। সকল বিধবাই পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারেন না। যিনি পারেন তাঁহার গৌরব নিশ্চয়ই আছে। এই

ভগ্নীটির যদি সাহস থাকে তাহা হইলে তাঁহার কাকা ও ভাইদের সব ব্যাপার খোলাখুলি বলিয়া তাঁহাদের সহায়তা প্রার্থনা করুন। যদি আত্মীয়স্বজন এ বিবাহে মত না দেন তাহা হইলে ভগ্নীকে তাঁহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোন বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

[হিন্দী নবজীবন হইতে, ৯-৫-২৯]

পর্দা-প্রথা

৮০৯। পর্দা-প্রথার বেড়া-প্রাচীরে ঘিরিয়া সতীত্ব রক্ষা করা যায় না—সতীত্ব কেবল অন্তঃপুরের অন্তরালেই গড়িয়া ওঠে না। সতীত্ব জন্মায় অন্তরে, সেখানেই তার আশ্রয়। সেই সতীত্বই সতীত্ব নামের যোগ্য ক্ষণিকের মোহ যাহাকে টলাইতে পারে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১-২৭, ৩৭]

৮১০। নারীর সতীত্বের জন্য পুরুষের এত ব্যস্ততার কারণ কি? পুরুষের পবিত্রতা ও নিষ্ঠার ব্যাপারে নারীর দাবী খাটে কি? পুরুষের সততা দাবী করিবার রীতি স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায় না। কোন্ অধিকারে পুরুষ নারীর সতীত্ব দাবী করিয়া প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছে? বাহির হইতে এ অধিকার চাপানো যাইতে পারে না। কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজ অন্তরের প্রয়াসের ফলে অন্তরের এই শুদ্ধ প্রকাশ ঘটিতে পারে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-১১-২৬, ৪১৫]

সহশিক্ষা

৮১২। বালক ও বালিকাদের একত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সফল হইবে কিনা তাহা এখনও বলা যায় না। পাশ্চাত্য সমাজে এ ব্যবস্থায় সুফল হয় নাই। অনেক বৎসর আগে আমি এই ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এমনকি একই বারান্দায় কোন পর্দা না দিয়া

বালক ও বালিকাদের স্বতন্ত্র অংশে ঘুমানোর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। অবশ্য উভয় দলের মধ্যে আমি ও আমার স্ত্রী শয়ন করিতাম। স্বীকার করিতে হইবে যে এ প্রয়াসে সুফল ফলে নাই।

প্রশ্ন—কিন্তু যেখানে পর্দার খুব বাড়াবাড়ি আছে এমন সমাজেও কি এর চেয়ে গুরুতর মন্দ ঘটে না ?

উত্তর—সেরূপ ঘটিতেও পারে তবে সহশিক্ষা ব্যবস্থা আজও পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে, ফল কি হইতে পারে তাহা এখনও বলা যায় না। আমার মনে হয় পারিবারিক জীবনে সহশিক্ষার ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট চর্চা হইতে পারে। সেখানে স্বাধীনভাবে সহাবস্থানের অভ্যাস করিয়া একত্রে চলিতে শিখিলে বড় হইলে সহশিক্ষা ব্যবস্থা আপনিই কার্যকর হইবে।

[অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২-১-৩৫]

জন্মনিয়ন্ত্রণ

৮১৪। প্রশ্ন—বহু-সন্তান-জন্মের ফলে যে মায়ের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহার এবং তাহার সন্তানদের মঙ্গলের জন্য যদি আত্মসংযম অবলম্বন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে বাধ্য হইয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা প্রয়োজন নয় কি ?

উত্তর—স্ত্রীর উচিত স্বামীকে নিরস্ত করা। যন্ত্রাদির সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের ফল বিষময় হইবে। এমন হইবে যে, স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই কেবল কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে চাহিবে। ভবিষৎ বংশ হইবে দুর্বলমস্তিষ্ক, তাহাদের মানসিক ক্ষমতা লোপ পাইবে, যার ফলে মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের অধঃপতন ঘটিবে।

প্রশ্ন—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেখানে স্বাস্থ্যহীনতার জন্য স্ত্রীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা নাই, অথবা স্বামী স্ত্রীর কোন একজন রোগগ্রস্ত, সেরূপ ক্ষেত্রেও কি জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিত হইবে না ?

উত্তর—না, সেখানেও এ ব্যবস্থা চলিতে দেওয়া উচিত নয়। যে অবস্থার বিষয় বর্ণনা করা হইল, সেরূপ ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রীর পৃথক্ বাস করাই উচিত হইবে।

আইনের দ্বারা সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা লোপ করা অমানুষিক কাজ বলিয়াই মনে করি। কেবল যে সব ব্যক্তি দুরারোগ্য রোগে ভোগে তাহাদের সন্তান জন্ম দিবার ক্ষমতা লোপ করার প্রয়োজনীয়তা আছে, যদি তাহারা স্বেচ্ছায় এ ব্যবস্থায় সম্মত হয়। সন্তান-জন্মক্ষমতার বিলোপ সাধন এক প্রকারের জন্মনিরোধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে সকল প্রকার জন্মনিরোধের ব্যবস্থার আমি বিরোধিতা করি। কিন্তু জননক্রিয়ায় যেহেতু পুরুষের ভূমিকাই প্রধানতর সেইহেতু সে যদি স্বেচ্ছায় প্রজননক্ষমতা লোপ করিতে চাহে তাহাতে বাধা দেওয়ার পক্ষপাতী হইতে চাহি না।

(শ্রীযুক্তা নেয়ার গান্ধীজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের যন্ত্রাদির ব্যবহার অনুচিত হয় তাহা হইলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হইবে কিরূপে? উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, প্রকৃতিই এই সমস্যার সমাধান করিবে। মানুষ যদি শশকের ন্যায় বংশ বিস্তার করে, শশকের ন্যায় তাহাদিগকে মরিতে হইবে।)

[অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২-১-৩৫]

উনবিংশ পর্ব

শিক্ষা বিষয়ক

৮১৬। মানুষের অন্তরে যে কল্যাণী শক্তিসমূহ নিহিত আছে তাহার পূর্ণ বিকাশ সাধনই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। মনুষ্যসমাজই শিক্ষার ক্ষেত্র, কোন পুস্তকই ইহা অপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ নহে।

[হরিজন, ৩০-৩-৩৪, ৫৫]

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা

৮১৭। জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে আমার মতের সমালোচনায় এত অদ্ভুত কথা প্রচারিত হইয়াছে যে এ বিষয়ে আমার নিজের বক্তব্য গুছাইয়া সর্বজনে প্রকাশ করিলে অবান্তর হইবে না—

আমার মতে এ দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করে যে সরকার তাহার ন্যায়পরায়ণতার লেশমাত্র নাই। উহার ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার নিম্নলিখিত প্রধান দোষগুলি দেখিতে পাইতেছি—

(ক) এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিদেশী সভ্যতার অনুকরণে সৃষ্ট, ইহাতে নিজের দেশের সংস্কৃতির চিহ্নমাত্র নাই।

(খ) এ শিক্ষায় কেবল বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার ব্যবস্থা মাত্র আছে, হৃদয়বৃত্তির বা হাতের কাজের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই।

(গ) বিদেশী ভাষার মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

এই ত্রি-দোষ কিভাবে বর্তমান তাহা বুঝিয়া দেখা দরকার। শিক্ষার আরম্ভ হইতে যে সকল পাঠ্যপুস্তক বালকবালিকাগণের হাতে দেওয়া হয় তাহাতে তাহাদের নিত্যকার পরিচিত বস্তুর কোন উল্লেখ নাই ; যে সকল বস্তুর উল্লেখ আছে তাহা ছাত্রদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহাদের গৃহস্থালীতে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ, বালক-বালিকারা তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে তাহা শিখিতে পায় না। এই

শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কিছু নাই যাহার চর্চার দ্বারা ছাত্র তাহার গৃহসমাজকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে পারে। ছাত্র যতই অগ্রসর হয় গৃহসমাজ হইতে তত বেশী দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। যখন সে তার ছাত্রাবস্থা সাঙ্গ করে তখন সে নিজের গৃহসমাজ হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহার গৃহপরিবেশে কোন মাধুর্য সে আর খুঁজিয়া পায় না। তাহার গ্রামের জীবনের কোন চিহ্নই তাহার জীবনে বজায় থাকে না।

এই শিক্ষা তাহাকে ভাবিতে শেখায় যে, তাহার নিজের দেশের সভ্যতা অসার, বর্বর, কুসংস্কারাপন্ন এবং নিষ্প্রয়োজন। এই শিক্ষা তাহাকে নিজ সংস্কৃতি হইতে দূরে, অতি দূরে লইয়া যায়। যখন দেখি যে শিক্ষিত যুবকদের জাতীয়তাবোধ একেবারে লুপ্ত হয় নাই, তখন বুঝিতে পারি আমাদের প্রাচীন সভ্যতা তাহাদের অন্তরের গভীরে এমন দৃঢ়ভাবে বাসা বাঁধিয়া আছে যে বিরূপ শিক্ষা বহু প্রয়াসেও তাহা সমূলে দূরীভূত করিতে পারে নাই। যদি আমার সে ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে এই সকল পাঠ্যপুস্তক ধ্বংস করিয়া এমন পুস্তক রচনা করাইতাম যাহা ছাত্রদের গৃহস্থজীবনের উপযোগী ও অনুগামী করিয়া তোলে, যেন শিক্ষার ফলে ছাত্ররা তাহাদের পারিপার্শ্বিক জীবন বুঝিবার সুযোগ পায় ও তাহাদের শিক্ষায় সমাজকে প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয়তঃ, অন্য দেশের ব্যাপারে যাহাই হউক না কেন, ভারতের শতকরা আশিজন চাষের সহিত যুক্ত, আরও দশজন শিল্পকর্মে নিযুক্ত। এ দেশে ছাত্রদের নিছক কেতাবী শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে তাহাদের হাতের কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য করিয়া তুলিলে গুরুতর অপরাধ ঘটে। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য হইল—যেহেতু আমরা জীবনের বেশীর ভাগ সময় জীবিকা উপার্জনের কাজে নিযুক্ত থাকি, শিক্ষার আরম্ভ হইতেই ছাত্রেরা যেন শ্রমকে মর্যাদা দিতে শেখে। শিক্ষা কখনও এমন হওয়া উচিত নয় যাহার ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা শ্রমকে অবজ্ঞা করিতে

শেখে। চাষীর ছেলে স্কুলে পড়িলে চাষের কাজের অনুপযুক্ত হইয়া চাষের কাজ ছাড়িয়া দেয়। এইরূপ ঘটিবার কোন কারণ নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয়, স্কুলের ছেলেরা শরীরশ্রমকে ঘৃণা না করিলেও শ্রম করিতে অনিচ্ছুক হয়। যদি মানিয়া লওয়া হয় যে ভারতের প্রত্যেকটি বালক বালিকার স্কুলে শিক্ষা পাওয়া উচিত তাহা হইলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এতই ব্যয়সাধ্য যে দরিদ্র ভারতবাসীর সাধ্য নাই যে তদনুযায়ী যথেষ্ট-সংখ্যক স্কুল করেন। আবার কোটি কোটি ছাত্রদের দরিদ্র পিতা-মাতার ক্ষমতা নাই যে পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য আধুনিক যুগে যে-পরিমাণ ব্যয় করা হয় সেইরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বিনাব্যয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। সকলের জন্য স্কুল করিতে দুইশত কোটি টাকা ব্যয় হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থা যত উচ্চাঙ্গেরই হউক না কেন, ওই দুইশত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সকলের বিনাব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে শিক্ষার ব্যয় ছাত্রদের শ্রমের দ্বারাই আংশিক বা পুরাপুরি যোগাইতে হইবে। এই সর্বজনীন শ্রম (আমার মতে) কেবল সুতাকাটা ও কাপড় বোনাতেই নিয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য প্রমাণ করিতে, সে শ্রম যে-কোন কাজে নিয়োগ করা যায় তাহাতে আয় করিতে পারিলেই যথেষ্ট। বিচার বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহা করা সম্ভব, করিলে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, এত বড় দেশের বিরাট্ ক্ষেত্রে যাহা করা যাইতে পারে, সেরূপ কাজ এই কাপড় তৈয়ারী অর্থাৎ তুলা উৎপাদন হইতে সুতা কাটা, কাপড় বোনা ইত্যাদি সকল আনুষঙ্গিক কাজ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সারা ভারতে স্কুলে স্কুলে এই কাজের প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

স্কুলে হাতের কাজের প্রচলন আমাদের মত দরিদ্র দেশে দুইটি

উদ্দেশ্য সাধন করিবে। এই উপায়ে আমাদের দেশে স্কুল চালানোর ব্যয় সংগ্রহ হইবে এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের এমন একটি কাজ শিখানো হইবে যাহা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োজন হইলে জীবিকার্জনের উপায় করিয়া দিবে। এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের ছেলেমেয়েরা আত্মনির্ভর হইয়া গড়িয়া উঠিবে। শরীরশ্রমকে ঘৃণা করিতে শিখিলে আমাদের দেশকে পঙ্গু করিয়া ফেলিব।

হৃদয়বৃত্তির শিক্ষার বিষয়ে একটিমাত্র কথা বলিবার আছে। এ শিক্ষা পুস্তকপাঠের দ্বারা হওয়া সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করি না। এ শিক্ষা একমাত্র শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কের দ্বারাই ঘটিতে পারে। বিচার করিয়া দেখা দরকার, সেই সব শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের চরিত্র ও ধর্মবিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছে কিনা; তাঁহাদের নিজেদের হৃদয় উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছে কিনা। আমাদের ছেলে-মেয়েদের যাঁদের হাতে সমর্পণ করিয়াছি তাঁরা কি শিক্ষার্থীদের মূল প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাদের গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন? যেভাবে প্রাথমিক শিক্ষকদের বাছিয়া নিয়োগ করা হয় তাহাতেই চরিত্রবান লোক বাদ পড়িয়া যায়। আমরা কি শিক্ষকদের জীবনধারণের উপযুক্ত বেতন দিয়া থাকি? আমরা সকলেই জানি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিক্ষকতা করিতে আসেন না। যাহারা অন্য কোন কাজ যোগাড় করিতে পারে না তাহারাই হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

সর্বশেষে, যে ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই বিষয়ে ভাবা যাউক। এ বিষয়ে আমার মতামত সকলেই জানেন, তাই আর নূতন করিয়া সে কথা বলিতে চাহি না। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েদের সহজে মস্তিষ্কের ক্লান্তি দেখা দেয়, তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে, যার জন্য অনুকরণ করিয়া বা মুখস্থ করিয়া চালাইবার চেষ্টাই তাহারা করিয়া থাকে। ইহার ফলে তারা নিজের মতে চলিবার বা ভাবিবার

যোগ্যতা লাভ করে না। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ওই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজ নিজ পরিবারে বা জনসাধারণের মধ্যে লব্ধ জ্ঞান বিতরণ করিতে পারেন না। বিদেশী শিক্ষা আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিজ দেশে পরবাসী করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই আধুনিক ব্যবস্থার সর্বনাশা কুফল। বিদেশী ভাষার প্রাবল্যের ফলে আমাদের দেশীয় ভাষার উন্নতি হইতেছে না। আজ যদি আমার সেই অধিকার থাকিত তাহা হইলে এই মুহূর্তে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতাম। যে শিক্ষক এই নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তদনুযায়ী কাজ না করিতেন তাহাদের তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করিবার হুকুম দিতাম। দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতাম না। পরিবর্তন ঘটিলে আপনিই পাঠ্যপুস্তক রচিত হইবে। এই 'মহতী বিনষ্টি'র এইরূপ বৈপ্লবিক প্রতিকারই প্রয়োজন।

বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে আমার অনমনীয় প্রতিবাদের ফলে আমার বিরুদ্ধে নানা ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। যেমন, আমি বিদেশী সভ্যতার বিরোধী, আমি ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধতা করিতেছি, ইত্যাদি। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় মাঝে মাঝে আমি যে সকল উক্তি করিয়াছি তাহা পড়িলে পাঠক-মাত্রেই বুঝিবেন যে ইংরাজী ভাষাকে আমি বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভাষা বলিয়া মনে করি, যেজন্য আমাদের দেশের কিছু লোকের এ ভাষায় অধিকার থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই ভাষায় বহু মূল্যবান চিন্তা ও সাহিত্য রচিত হইয়াছে, এজন্য ইংরাজী শিক্ষায় উৎসাহ দিতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। যাঁদের সাহিত্য শিখিবার মত প্রতিভা আছে, তাঁরা ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজী ভাষার মূল্যবান বস্তুগুলি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত করিলে দেশের উপকার হইবে বলিয়া মনে করি।

এ কথা আমি ভুলিয়াও মনে করি না যে, বাহিরের সকল সাহচর্য

বর্জন করিয়া বা চারিপাশে প্রাচীর তুলিয়া আমরা নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা গড়িয়া তুলিতে পারিব। সবিনয়ে এইটুকু বলিতে চাই যে, নিজের সংস্কৃতির বিষয়ে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইলে তবেই অন্য সভ্যতার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এর বিপরীত ধারায় চলিলে তাহা সম্ভব নয় বলিয়াই মনে করি। আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, আমাদের দেশের সংস্কৃতির মধ্যে অতি মূল্যবান সম্পদ্ আছে, যাহা আর কোথাও আমরা পাইব না। নিজ ধনের সন্ধান না রাখিয়া কুশিক্ষার প্রভাবে আমরা শিখিয়াছি নিজ দেশের সংস্কৃতির চর্চাকে তাচ্ছিল্য করিতে, এমনকি তাহার যোগ্যতার মূল্য বুঝিতেও আমরা শিখি নাই। সেই ধারা অনুযায়ী বাঁচার চেষ্টা আমরা প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছি। মাত্র বুদ্ধিপ্রসূত চেষ্টায় কিছু কিছু জানার চেষ্টা করি মাত্র ; কিন্তু তাহার কোন সাধনের প্রয়াস না থাকায় আমাদের জ্ঞান কোন প্রেরণা আনে না, কোন মহত্ত্ববোধ সৃষ্টি করিতে পারে না। মৃতদেহকে আরকে তাজা রাখিয়া সাজাইয়া রাখিলে কোন কোন ক্ষেত্রে সুন্দরও দেখায় কিন্তু তাহা হইতে জীবনের স্পর্শ পাওয়া যায় না। আমার ধর্মবুদ্ধি বলে, কাহারও সংস্কৃতিকে ছোট মনে করা উচিত নয়। সেই ধর্মই আমাকে শিখাইয়াছে নিজের ধর্ম বুঝিতে ও তদনুযায়ী বাঁচিতে চেষ্টা না করিলে আমার সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-২১, ২৭৬]

মাতৃভাষার পক্ষে

৮১৮। সহজেই বুঝা যায় যে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রচলন না করিতে পারিলে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি ও আচরণের পার্থক্য ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে। ইহাও একান্ত সত্য যে, জনসাধারণের মধ্যে অধিকতম লোকের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটাইতে হইলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়াই একমাত্র উপায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-২-২০, ঠাকুর, ৪৬৫]

ধর্মশিক্ষা ও রাষ্ট্রশক্তি

৮২০। ধর্মশিক্ষা বিস্তারের কাজ রাষ্ট্রের নয়, সে ক্ষমতাও রাষ্ট্রের নাই। একমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিই ধর্মশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। ধর্ম ও নীতিকে এক বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। আমার বিশ্বাস মনুষ্যজীবনের মূলনীতিগুলি সকল ধর্মেই স্বীকৃত হয়। সেই মূলনীতিগুলি শিক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য। এই ক্ষেত্রে ধর্ম বলিতে আমি মানুষের মূল নীতিধর্মকে বুঝি না, প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম-প্রতিষ্ঠানকেই ধর্ম বলিতেছি। রাষ্ট্র-সাহায্যপ্রাপ্ত ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের করুণ অভিজ্ঞতা আমাদের রহিয়াছে। যে সমাজ বা বিশেষ দলের ধর্ম-প্রতিষ্ঠান অংশতঃ বা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সাহায্যের উপর নির্ভর করে তাহাদের ধর্মকে ধর্ম বলা উচিত নয়, হয়তো তাহাদের ধর্ম ধর্মই নয়। এই প্রকট সত্যের সমর্থনে দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই।

[হরিজন, ২৩-৩-৪৭, ৭৬

সর্বাগ্রে চরিত্রগঠন

৮২২। প্রশ্ন—ভারত স্বাধীন হইলে ভারতের শিক্ষার আদর্শ, আপনার মতে, কিরূপ হওয়া উচিত?

উত্তর—চরিত্রগঠনই শিক্ষার আদর্শ। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা যেন ভারতবাসীর মনে সাহস আনিয়া দেয়, শক্তি দেয় এবং বহু সদ্‌গুণ সৃষ্টি করিয়া উচ্চ আদর্শের সাধনায় তাহারা যেন ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যায়। অক্ষরজ্ঞান অপেক্ষা চরিত্রগঠনই অধিক মূল্যবান, পুঁথিগত বিদ্যা চরিত্রগঠনে সাহায্য করে বলিয়াই তাহার প্রয়োজনীয়তা। এই কারণেই ভারতের জনগণের অক্ষরজ্ঞানের প্রভূত অভাবকে শোচনীয় ঘটনা জানিয়াও আমি বিচলিত হই না এবং এই অপরাধে ভারতবাসী স্বাধীনতার অযোগ্য বলিয়াও মনে করি না।

প্রশ্ন—শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থা ঘটাইবার আশা করেন কি ?

উত্তর—আমি বুঝি ব্যক্তির চরিত্র গঠন করিতে পারিলেই সমাজ নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইবে। চরিত্রবান ব্যক্তিরা নিজেদের সমাজের ব্যবস্থা নিজেরাই করে এই বিশ্বাসে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব।

প্রশ্ন—ভারতে জাতীয়তাবোধ বাড়াইবার চেষ্টায় দেশপ্রেম কি এতই বাড়াইতে চাহেন যে তাহার নির্দেশ ব্যক্তিগত বিবেকের আহ্বানকেও ছাড়াইয়া যাইবে ?

উত্তর—ভগবান আমাদের এই দুর্বলতা হইতে রক্ষা করুন। মানুষের অন্তরের নির্দেশের স্থান সব কিছুর উপরে। যেখানে জন-সাধারণের চরিত্র উন্নত হয় সেখানে দেশপ্রেম ও বিবেকের মধ্যে কোন সংঘাত হইতে পারে না।

[কার্লটন ওয়াশবার্ন কৃত 'রিমেকার্স অব ম্যানকাইণ্ড' (১৯৩২), পৃ. ১০৪—০৫]

অক্ষরজ্ঞানের স্থান

৮২৩। শুধু অক্ষরজ্ঞানের দ্বারা মানুষের নৈতিক বোধ বিন্দুমাত্রও বাড়ে না—চরিত্রগঠন লেখাপড়া শেখার উপর নির্ভর করে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৬-২১ ১৭২]

৮২৬। ইহা সত্য যে অক্ষরজ্ঞান না থাকিলেও সৎ ও সার্থক জীবন লাভ করিতে পারা যায়, তবুও স্বীকার করিতে হয় যে লেখাপড়া না জানিলে সংসারে সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারা কঠিন। লেখাপড়া শেখার চেষ্টায় আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর ও উন্নত হয়, ফলে আমাদের সৎকার্য সাধনের ক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। লেখাপড়া জানার মধ্যে আমি অতি উচ্চগুণ আরোপ করিতেছি তাহা নয়, কেবল ইহার যথাযোগ্য সদ্‌গুণের বিচার করিতেছি মাত্র। একাধিকবার আমি

বলিয়াছি যে, মেয়েরা লেখাপড়া জানে না বলিয়াই পুরুষ তাহাদের সমান অধিকার দিতে রাজী হয় না—লেখাপড়ার সেরূপ মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আবার ইহাও সত্য যে, নারী যদি তাঁহার প্রকৃতিদত্ত অধিকার দখল করিয়া তদনুযায়ী বিচারপূর্বক কাজ করিতে চাহেন তাহা হইলে লেখাপড়া জানা নিতান্ত প্রয়োজন। যে লক্ষ লক্ষ লোক লিখিতে পড়িতে শেখে নাই, নিজেদের সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান লাভ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক পুস্তক পাঠে নির্দোষ আনন্দ পাওয়া যায়, লেখাপড়া না শিখিলে সেগুলি পড়া যায় না। এ কথা বলিলে বেশী বলা হয় না যে, লেখাপড়া না জানা মানুষ পশু হইতে বেশী উচ্চস্তরে উঠিতে পারে না। এই কারণে কি পুরুষ কি নারী, সকলের পক্ষেই লেখাপড়া শেখা অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

[২০-২-১৮ তারিখের বক্তৃতা হইতে, 'নারী ও সামাজিক অবিচার', ৩]

বুনিয়াদী শিক্ষা

৮২৯। আমি বিশ্বাস করি যে, বুদ্ধিকে যথার্থ শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে হাত পা চোখ কান নাক ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকৃষ্ট প্রয়োগশিক্ষার মাধ্যমেই তাহা হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির দ্রুত ও উপযুক্ত উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথোপযুক্ত অনুশীলনের দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি মন ও শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আত্মা পূর্ণবিকশিত না হইয়া ওঠে তাহা হইলে উন্নতির ভারসাম্য রক্ষা না হইয়া বিকৃতি ঘটে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি হৃদয়-বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন। সমতালে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন চলিতে থাকিলে তবেই মনের সামগ্রিক উন্নতি ঘটিতে পারে। সব কিছু মিলিয়া তবেই শিশুকে সম্পূর্ণ শিক্ষিত করিতে পারে। সুতরাং পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ভাবে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব মনে করিলে ভ্রান্তিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

[হরিজন, ৮-৫-৩৭, ১০৪]

৮৩০। শিক্ষার অর্থ, শিশু ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের মধ্যে যে সকল শক্তি নিহিত আছে—দেহ মন ও আত্মার সকল শক্তি, সকল সৌন্দর্য—তাহা প্রকাশিত করা বা কাজে লাগানো। এ শিক্ষা অক্ষরজ্ঞান দিয়া আরম্ভ হয় না বা পুঁথিগত বিদ্যাতেই পরিসমাপ্ত হয় না। অক্ষরজ্ঞান মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তোলার একটি উপায় মাত্র। ইহাই শিক্ষা নয়। এই কারণে শিশুর শিক্ষা কোন একটি প্রয়োজনীয় হস্তশিল্প দিয়া আরম্ভ করিতে চাই, যেন শিক্ষার প্রারম্ভ হইতে শিশু কিছু সৃষ্টি করিতে শেখে। এই উপায়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ের ব্যয় সেখানকার হাতের কাজের দ্বারা সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে, যদি বিদ্যালয়ে প্রস্তুত সামগ্রী সরকার কিনিয়া লয়।

আমার বিশ্বাস এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা মন ও আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হওয়া সম্ভব। কেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, শিল্পী বা কারিগর তৈয়ারীর জন্য যে ভাবে শেখানো হয়, সে ভাবে না শিখাইয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ শিশু যেন বুঝিতে শেখে কেন, কি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইতেছে। এ বিষয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে তাহারই জোরে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ভরসা পাইয়াছি। যেখানেই কর্মীদের সুতাকাটা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে সেখানেই এই পন্থা অংশতঃ বা পুরাপুরি অবলম্বন করা হইতেছে। এই পন্থায় আমি নিজে স্যাণ্ডাল তৈয়ারী ও সুতাকাটা শিক্ষা দিয়া সুফল পাইয়াছি। এই পন্থায় শিখাইলে ইতিহাস, ভূগোলও বাদ পড়ে না। এইরূপ সাধারণ জ্ঞানের বিষয়গুলি মুখে মুখে শিখাইলে ভালো ফল পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। পুস্তকের মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়ার অপেক্ষা কাজের মাধ্যমে শিখাইলে দশগুণ অধিক শিখানো যায়। ছাত্র যখন কাজের মাধ্যমে খানিকটা শিখিয়া, নিজের রুচি গড়িয়া তুলিয়া, কোন্‌টা তাহার ভালো লাগে কোন্‌টা লাগে না বুঝিতে শিখিল তখন বর্ণমালার শিক্ষা আরম্ভ করা যায়। প্রস্তাবটি প্রচলিত প্রণালী হইতে

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিন্তু এই প্রণালীতে অনেক সময় বাঁচে—এই প্রথায় এক বছরে ছাত্র যতটা শিখিতে পারে, প্রচলিত নিয়মে ততটা শিখিতে অনেক বেশী সময় লাগিবে। কাজেই এই পন্থায় সময় ও অর্থ দুইই বাঁচিয়া যাইবে। হাতের কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র গণিতের হিসাবও শিখিয়া যায়।

এই প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশী বলিয়া মনে করি। এই শিক্ষাক্রম ছাত্রদের বর্তমান প্রবেশিকার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে—কেবল ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না।

[হরিজন, ৩১-৭-৩৭, ১৯৭]

৮৩২। যে প্রস্তাব আমি আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি তাহাতে এমন বুঝায় না যে, বর্তমান উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে মাত্র। আমার প্রস্তাব হইল কোন শিল্পের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। কেহ এ বিষয়ে আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, মধ্যযুগে শিল্পীরা শিক্ষানবীশদিগকে কেবল হাতের কাজই শিখাইত কিন্তু সে যুগের শিক্ষার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। হইবার কথাও নয় কারণ সেক্ষেত্রে বৃত্তির জন্যই বৃত্তি শেখানো হইত, তার সঙ্গে ছাত্রদের মানসিক শক্তির কোন অনুশীলন হইত না। পূর্বে যাহারা হস্তশিল্পের দ্বারা বাঁচিয়া থাকিত, তাহাদের বংশের লোক বৃত্তি ভুলিয়া গিয়া স্কুলে শিক্ষা পাইয়া কেরানী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, যার ফলে গ্রাম তাহাদের হারাইয়াছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে শিল্পের কৌশল ও বিজ্ঞান দুইই শিখাইতে হইবে হাতের কাজের মাধ্যমে। সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সকল দিকই সাধন করিতে হইবে।

শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা ছাত্রদের হাতের কাজের দ্বারা অর্জন করিবার ব্যবস্থার আমি একান্ত পক্ষপাতী। কারণ আমি বেশ বুঝিয়াছি আমাদের দরিদ্র দেশের কোটি কোটি বালক বালিকাকে

শিক্ষিত করিয়া তুলিবার অন্য কোন উপায় নাই। যতদিন পর্যন্ত রাজস্ব বাড়িয়া যথেষ্ট আয় না হয়, যতদিন পর্যন্ত বড়লাট সৈন্য-বাহিনীর বরাদ্দ না কমান, ততদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিবার উপায় নাই। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, জনস্বাস্থ্য, ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, স্বাবলম্বন, গৃহে পিতামাতাকে সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ও এই প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। আজকাল ছেলেমেয়েরা পরিচ্ছন্নতার বা স্বাবলম্বনের কিছুই শেখে না, তাহাদের শরীরও সক্ষম হয় না। এই কারণে আমি চাই সংগীতের তালে তালে ব্যায়াম করিয়া ছাত্রদের শরীর গড়িয়া উঠুক।

[শিক্ষার নববিধান—৬২, ৬৩]
[হরিজন, ৩০-১০-৩৭, ৩২৩]

উচ্চতর শিক্ষা

৮৩৫। কলেজী শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করিয়া, জাতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী সেই শিক্ষার মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। যান্ত্রিক ও অন্যান্য শিল্প বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই শিক্ষার ভার লইবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী শিল্প-প্রতিষ্ঠান। তাহাদের কাজের যোগ্য লোক তৈয়ারী করার জন্য তাহারাই অর্থব্যয় করিয়া, উপাধি দেওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া লইবে। যেমন টাটার কারখানা নিজেদের প্রয়োজনে কারিগরী শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের অনুমত্যনুসারে উপযুক্ত কলেজ চালাইবে। সুতা-কল, পাট-কল ইত্যাদির সংযুক্ত সমিতি-গুলিও নিজেদের প্রয়োজনে একযোগে কলেজ করিয়া নিজ নিজ প্রয়োজনমত লোক তৈয়ারী করিয়া লইবে। এইরূপ, সকল শিল্পের ক্ষেত্রে এবং নিছক ব্যবসায় ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কলেজ গড়িয়া উঠিবে। বাকী থাকিল সাধারণ উচ্চমানের শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা ও কৃষি-বিজ্ঞান। ভারতে অনেকগুলি সাধারণ কলেজ নিজের ব্যয় নিজেই

সংগ্রহ করিয়া লয়—যেখানে ছাত্রেরা সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা করিতে পারে—সুতরাং এরূপ কলেজ পরিচালনার ব্যয়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে লইতে হইবে না। রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালগুলির সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষণের কলেজ গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। সাধারণতঃ ধনী ব্যক্তিরাই সন্তানদের চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য পাঠাইয়া থাকেন, কাজেই ধনীদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত সাহায্যেই এরূপ কলেজগুলি চলিতে পারিবে। কৃষিবিদ্যার কলেজগুলি স্বাবলম্বী না হইলে সার্থক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিবে না। কয়েকজন উপাধিধারী কৃষিবিশারদকে দেখিয়া খুবই দুঃখ পাইয়াছি। তাহাদের চাষের সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানের একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থার প্রয়োজন মিটাইতে পারে এমন সার্থক কৃষিক্ষেত্রে এই সব পাশকরা কৃষিবিশারদরা যদি কিছুদিন ধরিয়া শিক্ষানবিশী করিতেন তাহা হইলে সরকারী চাকুরী লইয়া জনসাধারণের অর্থে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া সময় ও অর্থ নষ্ট করিতে হইত না।

[হরিজন, ৩১-৭-৩৭, ১৯৭]

৮৩৬। শিক্ষা বিষয়ে অনেক বৎসর ধরিয়া আমি যে সিদ্ধান্ত পোষণ করিতেছি এবং যখনই সুযোগ পাইয়াছি কার্যক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি, সেই বিষয়ে আমার অভিমত সরলভাবে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করি।

(ক) ছাত্রগণের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা পাওয়ার অধিকারে কোন বাধা নাই।

(খ) রাষ্ট্র যে স্থলে যেরূপ প্রয়োজন বুঝিবে সে স্থলে সেইরূপ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবে।

(গ) সকল উচ্চ মানের শিক্ষার ব্যয় সাধারণ রাজস্ব হইতে নির্বাহ করা হইবে এরূপ আমি মনে করি না।

(ঘ) উচ্চশিক্ষা বলিয়া পরিচিত সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে

যে কলেজী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহার জন্য ব্যয় করাকে আমি অপব্যয় বলিয়া মনে করি। এই শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল হইয়াছে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের ক্রমসংখ্যাবৃদ্ধি। আরও কুফল ফলিয়াছে যে, আমাদের দেশের যে সব ছেলেমেয়ে বহু কষ্টে এই ভাষা-সংকট উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা হারাইয়াছে তাহাদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য।

(৬) ভারতে যে উচ্চশিক্ষার ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার বাহন হইয়াছে বিদেশী ভাষা, ইহার ফলে আমাদের দেশের বুদ্ধি ও নীতির অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া আমরা এই ক্ষতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আরও অসুবিধা হইতেছে, আমরা যাহারা এই পদ্ধতির বিচার করিতে চাই, তাহারা প্রত্যেকেই এই পদ্ধতির বিষে জর্জরিত, যার ফলে যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।

কোন্ বিচারে আমি উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি তাহা বলা আমার কর্তব্য। আমার নিজের জীবনের একটি অধ্যায় বর্ণনা করিলে তাহাতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করি।

বারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি আমার মাতৃভাষা গুজরাতীতে শিক্ষা পাইয়াছি। ততদিনে আমি কিছু পরিমাণ অঙ্ক, ইতিহাস ও ভূগোল শিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তারপর আমাকে উচ্চতর বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। সেখানেও প্রথম তিন বৎসর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চলিল। কিন্তু সেই সময়ে শিক্ষকদের প্রধান চেষ্টা ছিল ছাত্রদের মাথায় ইংরাজী ঢুকাইয়া দেওয়া। কাজেই আমরা ছাত্ররা যে পরিমাণ সময় পড়াশুনায় ব্যয় করিতাম তাহার অর্ধেক সময় যাইত ইংরাজী ভাষা শিখিতে আর এই স্বেচ্ছাচারী ভাষার অহেতুক বানান ও উচ্চারণ মুখস্থ করিতে। বড় দুঃখ পাইয়া আবিষ্কার করিলাম যে, ইংরাজী এমন একটি ভাষা যার লিখিতমত উচ্চারণ হয় না।

ফলে, ইংরাজী বানান মুখস্থ করিতে বহু মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। কথাগুলি প্রসঙ্গক্রমে বলিলাম, যুক্তি হিসাবে বলি নাই। যেমন করিয়াই হউক প্রথম তিন বৎসর মন্দ কাটে নাই।

চতুর্থ বৎসর হইতে অবস্থা হইল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। জ্যামিতি, রসায়নবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সব কিছু ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিখিতে বাধ্য হইলাম। ইংরাজীর অত্যাচার এত বেশী ছিল যে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষাও ইংরাজীর মাধ্যমে শিখিতে হইত—এখানেও মাতৃভাষা বর্জিত হইল। যদি কোন ছাত্র ক্লাসের মধ্যে গুজরাতী বা মাতৃভাষায় কথা বলিয়া ফেলিত তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইত। ছাত্র যখন ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করিত তখন সে না করিতে পারিত ঠিকমত উচ্চারণ না বুঝিতে পারিত ইংরাজী শব্দের প্রকৃত অর্থ। শিক্ষক মহাশয় এজন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতেন না কারণ তাঁহার ইংরাজীও শুদ্ধ ছিল এমন বলা যায় না।

এর বেশী আর কি আশা করা যায়? ইংরাজী ছাত্রদের পক্ষে বিদেশী ভাষা, শিক্ষকের পক্ষেও তা-ই। এই কষ্টকল্পনার আবর্তে সকল দিকেই বিভ্রাট ঘটিত। আমরা ছাত্রেরা অধিকাংশ পাঠ্যই মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিতাম, যদিও কোনটিই পুরাপুরি বুঝিতে পারিতাম না, আবার কিছু কিছু আদৌ বুঝিতাম না। শিক্ষক যখন প্রাণপণ চেষ্টায় জ্যামিতি বুঝাইতেন তখন আমার মাথা ঘুরিতে থাকিত। ইউ-ক্লিডের ত্রয়োদশ উপপাদ্য পর্যন্ত এইভাবে শিক্ষার চেষ্টা চলিয়াছিল। এই সম্পর্কে স্বীকার করা উচিত, গুজরাতী ভাষার প্রতি আমার প্রভূত অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমি জ্যামিতি, বীজগণিত ইত্যাদির ভাষার গুজরাতী প্রতিশব্দ শিখিতে পারি নাই। এখন বুঝিতে পারি পাটিগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি চার বৎসরে আমি যেটুকু শিখিয়াছিলাম, গুজরাতী ভাষার মাধ্যমে শিখানো হইলে এক বৎসরেই ঐ পরিমাণ

বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিতাম। গুজরাতী ভাষার মাধ্যমে অনেক সহজে বুঝিতাম ও অধিকারও হইত অনেক বেশী। আমার গুজরাতী শব্দের জ্ঞান বাড়িয়া যাইত এবং স্কুলের বাহিরে ও বাড়ীতে এই সকল বিদ্যার প্রয়োগ করিয়া সকলের মধ্যে লব্ধজ্ঞান বিতরণ করাও সম্ভব হইত। ইংরাজীর মাধ্যমে বিদ্যা অর্জন করিতে গিয়া পরিবারের অন্য সকলের ও আমার মধ্যে একটি দুরধিগম্য ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া যাইতে লাগিল। পুত্র কেমন বিদ্যা অর্জন করিতেছে আমার পিতা তাহার কিছুই জানিতেন না। চেষ্টা করিলেও আমি আমার পাঠ্য বিষয় তাঁহাকে বুঝাইতে পারিতাম না কারণ ইংরাজী ভাষা তিনি আদৌ বুঝিতেন না। ফলে আমি দ্রুত পারিবারিক আবেষ্টনের বাহিরে চলিয়া যাইতেছিলাম। অবস্থার গুণে নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা অহমিকার সৃষ্টি হইতে লাগিল, এমনকি অজ্ঞাতসারে নিজের পোশাকেরও পরিবর্তন ঘটিতে থাকিল। এই অভিজ্ঞতা আমারই শুধু হইয়াছিল তাহা নয়, অধিকাংশেরই এই অবস্থা ঘটে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম তিন বৎসর আমার বিদ্যার পুঁজি বাড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এই তিন বৎসর ধরিয়া প্রস্তুতি চলিল যাহাতে আমরা ইংরাজীতে সব কিছু পড়িবার যোগ্য হইয়া উঠি। এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি ইংরাজ সংস্কৃতির কাছে আমাদের পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করাইয়া লয়। ফলে আমাদের স্কুলের তিনশত ছাত্রকে বিশেষ এক গণ্ডীর মধ্যে ঘিরিয়া ফেলিয়া জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইল।

সাহিত্যশিক্ষার বিচার করিয়া দেখা যাউক। ইংরাজী গদ্য ও পদ্যের কয়েকটি পুস্তক আমাদের পড়িতে হইত। বইগুলি যে সুপাঠ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সাহায্যে আমি আমাদের দেশের জনসাধারণকে বেশী করিয়া জানিতে শিখি নাই, কিংবা তাহাদের সেবায় উৎসাহ লাভ করিতে পারি নাই। এখন ভাবিয়া দেখি যে, যদি ইংরাজী সাহিত্যের ঐ পুস্তকগুলি না পড়িতাম তাহা

হইলে কি ক্ষতি হইত ? বিশেষ মূল্যবান কিছু হারাইতাম বলিয়া মনে হয় না। বরং যদি এই দীর্ঘ সাত বৎসর কাল ধরিয়া গুজরাতী ভাষার মাধ্যমে গুজরাতী সাহিত্য ও তৎসহ অঙ্ক, বিজ্ঞান ও সংস্কৃত শিক্ষা করিতাম তাহা হইলে যেটুকুই শিখিতাম তাহার সাহায্যে আমার আপনজনের সহিত আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হইতে পারিতাম। এমনও হইতে পারিত যে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি যে অদম্য প্রেম আমার অন্তরে রহিয়াছে তাহার বলে ও আমার স্বাভাবিক নিষ্ঠার সাহায্যে আমাদের দেশের জনসাধারণের জন্য আরও অনেক মূল্যবান ও মহত্তর সেবা দিয়া যাইতে পারিতাম।

উপরিউক্ত মন্তব্যের দ্বারা ইংরাজী বা উহার বিরাট্ সাহিত্যের নিন্দাবাদ করিতেছি এরূপ মনে করা ভুল হইবে। 'হরিজন' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইংরাজী ভাষার প্রতি আমার অনুরাগের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ইংরাজের শীতপ্রধান দেশ ও তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধ্যান করিয়া যেমন ভারতবাসীর চলিতে পারে না, তেমনি তাহার মহান্ সাহিত্যও ভারতবাসীর জীবনে ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। যদি এমনও হয় যে ভারতের আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সাহিত্য তিনটিই ইংরাজের আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সাহিত্য হইতে নিম্ন স্তরের, তাহা হইলেও ভারতবাসীকে বাঁচিতে হইবে তাহার নিজের দেশের আবহাওয়ায়, নিজের দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনে এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের সাধনে। আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ, যাহা পাইতেছি ও পাইবে তাহারই ভিত্তিতে এই জাতির ভবিষ্যৎ গড়িতে হইবে। যদি অন্যের ধন ধার করিয়া আমরা চলিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে নিজের সম্পদের গৌরব হারাইব। বিদেশী খাদ্যে আমাদের পুষ্টি হইতে পারে না। আমি চাহি যে, আমার দেশের লোক নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরাজী তথা পৃথিবীর অন্যান্য মহতী সাহিত্যের মাধুর্য ও মাহাত্ম্য বুঝিতে শিখুক। রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সাহিত্যের মাধুর্য উপলব্ধির জন্য আমার বাংলাভাষা শিখিবার আবশ্যকতা নাই,

ভাল অনুবাদের সাহায্যে সে উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। গুজরাতের বালকবালিকারা টলস্টয়ের ছোটগল্পগুলি পড়িবার জন্য কিরূপ ভাষা শিক্ষা করিবে? অনুবাদ পড়িলেই তাহারা সেগুলি জানিতে পারিবে। ইংরাজ গর্ব করিয়া বলে পৃথিবীর যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহের মধ্যেই ইংরাজ জনসাধারণ তাহার অনুবাদ হাতে পায়। শেক্সপীয়র বা মিল্‌টন যাহা ভাবিয়াছেন বা লিখিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য আমাকে ইংরাজী শিখিতে হইবে কেন?

আমাদের বিদ্বজ্জন-সমাজ যদি এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন যে, কতকগুলি ছাত্র তৈয়ারী হইবে যাহারা বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় যে সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আছে বা জন্মিবে তাহা অধ্যয়ন করিয়া ভারতীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন, তাহা হইলে অনেক শ্রম লাঘব হইয়া জাতির অগ্রগমনে সহায়তা হইবে। আমাদের পূর্ববর্তিগণ এই কাজের জন্য ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে সেই ভ্রমই প্রকৃত পন্থা বলিয়া মনে হইতেছে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের দেশপ্রেমের পথে বহু বাধা সৃষ্টি হইয়া ভারতের কোটি কোটি লোককে শিক্ষিত লোকের সেবা হইতে বঞ্চিত করার অপরাধ বাড়াইয়া চলিয়াছি, তাহার প্রমাণ প্রতিদিনই চোখে পড়ে। উপাধিপ্রাপ্ত বহু বন্ধু যখন তাঁদের অন্তরের গভীর কথা মাতৃভাষায় বলিতে চেষ্টা করেন তখন অপারগ হইয়া বহু ইংরাজী শব্দ, কখন কখন ইংরাজী বাক্যও ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। তাঁরা নিজের দেশেও পরদেশী হইয়া আছেন। ইংরাজী বই না হইলে তাঁহাদের একটি দিনও চলে না। এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে বিদেশী ভাষার প্রভাব আমাদের কি অবস্থায় আনিয়াছে। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য আমাদের চেষ্টা করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির স্বপক্ষে কেহ কেহ এরূপ যুক্তিও উপস্থিত করিয়াছেন যে আমাদের কলেজী শিক্ষায় এত ব্যর্থশ্রম ও অর্থের অপব্যয়ের ফলে যদি একটি জগদীশ বসুও গড়িয়া উঠিয়া থাকেন তবে আক্ষেপ করিবার হেতু নাই। এ যুক্তি আমি মানিয়া লইতাম যদি এই বিরাট্ অপব্যয় না করিয়াও এরূপ ঘটানো সম্ভব হইত। আশা করি পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে পূর্বেই এই অপচয় নিবারণ করা যাইত এবং এখনও করা যায়। যে যুক্তির সমর্থনে জগদীশ বসুর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহার চরিত্র সে যুক্তিকে সমর্থন করে না। তিনি আধুনিক শিক্ষার সৃষ্টি নহেন। বরঞ্চ এই শিক্ষার শত প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তিনি নিজ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ বলাই ঠিক। সর্বোপরি তাঁর সাধনার ফল সাধারণ্যে প্রচার করার মতও হয় নাই। মনে হয় যেন এ যুক্তিও কেহ বলিবেন যে, ইংরাজী শিখিয়াছিলেন বলিয়াই জগদীশ বসু এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন। এর চেয়ে দুঃখজনক কুসংস্কার আর কিছু হইতে পারে না। জাপানীরা নিজেদের এত অসহায় মনে করে না বলিয়াই জানি।

প্রবল বিরুদ্ধতা ব্যতিরেকে এই সুদূরপ্রসারী জড়তার পাপ ঘুচানো সম্ভব নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা হয়তো এ দুঃখ দূর করিতে পারিবেন না, তবে চেষ্টা করিলে দুঃখের ভার কিছুটা লাঘব করিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিজের ব্যয় নিজেই সংগ্রহ করিতে হইবে। কেবল সেই ছাত্রেরাই রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবে, রাষ্ট্র যাহাদের কাজে লাগাইতে পারিবে। অন্য সকল প্রকার বিদ্যার্জনের ব্যাপার বেসরকারী সাহায্যে চলিবে। এই ক্ষণেই শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন করিতে হইবে। যত অসুবিধাই ঘটুক না কেন, বিভিন্ন প্রদেশে মাতৃভাষা চালু করিয়া তাহাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হইবে। প্রতিদিন এই জাতি যে ক্ষতি ভোগ করিতে করিতে ক্ষতির

পরিমাণ বিভীষিকাপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা দূর করার জন্য উচ্চশিক্ষায় যত গোলযোগই হউক না কেন, এই ক্ষণেই এই পরিবর্তন সাধন করা উচিত।

মাতৃভাষার মর্যাদা ও কদর বাড়ানোর জন্য প্রতিটি আদালতে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিতে হইবে। প্রাদেশিক আইন সভায় তদ্দেশীয় ভাষায় কাজ চালানো উচিত। যে প্রদেশে একাধিক ভাষার চলন আছে সেখানে উহার সব কয়টিই আইন সভাতে চালু হওয়া উচিত। ইহাতে কাহারও অসুবিধা হইতে পারে না। আইন সভার সভ্যরা একমাসের চেষ্টায় অনভ্যস্ত ভাষাগুলি শিখিয়া লইতে পারেন। একজন তামিল ভাষাভাষীর পক্ষে তামিলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত তেলেগু, মালয়ালম বা কন্নড় ভাষার সহজ ব্যাকরণ ও কয়েক শত শব্দ শেখার বাধা কোথায়? কেন্দ্রে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

বিদ্যাব্যবসায়ীরা এই সকল বিচার করিতে পারিবেন না। কোন্ স্থানের বালকবালিকারা কোন্ ভাষায় শিক্ষা পাইবে তাহা স্থির করাও তাঁহাদের কাজ নয়। সকল স্বাধীন দেশ নিজেই এ ব্যবস্থা করিয়া লয়। কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে তাহা স্থির করিতে বিদ্বানের প্রয়োজন নাই। ছাত্র যে দেশের সেই দেশের প্রয়োজনানুযায়ী তাহাদের শিক্ষা দেওয়াই সংগত। জাতি যখন তাহার প্রয়োজন নির্ধারণ করিয়া ফেলিবে তখন বিদ্যাব্যবসায়ীরা স্থির করিবেন দেশের প্রয়োজন কোন্ উপায়ে সুষ্ঠুভাবে মেটানো যায়। দেশ স্বাধীন হইলে শিক্ষার মাধ্যম একরকম হওয়াই সম্ভব। শিক্ষাবিদ্‌গণ তদনুযায়ী পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করিবেন। আজ বিদেশী শাসনে থাকাকালীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশীদের সুবিধা অনুযায়ী চলিতেছে। যখন ভারত স্বাধীন হইবে তখন স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী চলা উচিত। যত দিন পর্যন্ত আমরা, শিক্ষিত লোকেরা, এই প্রশ্ন লইয়া নানা যুক্তি-

তর্কের খেলা খেলিতে থাকিব ততদিন পর্যন্ত আমাদের কল্পনার সুস্থ ও সমৃদ্ধ ভারত সৃষ্ট হইবে না। পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিতে হয় সবলে, সে পরাধীনতা শিক্ষাক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যাপারে, সামাজিক ব্যাপারে বা রাজনীতি ক্ষেত্রে যেখানেই হউক না কেন। স্বাধীনতার প্রয়াসই স্বাধীনতার যুদ্ধের চারি ভাগের তিন ভাগ।

আমার দাবী এইটুকু, আমি উচ্চশিক্ষার বিরোধী নই—আমার বিরোধ যে শিক্ষাপদ্ধতি আজ ভারতে চলে, তাহার সহিত। আমার প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিতে চাই বহু সুসজ্জিত পুস্তকাগার, অনেক সুগঠিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ-কেন্দ্র (লেবরেটরী), বহু গবেষণাগার। এই পন্থায় দলে দলে রসায়নশাস্ত্রবিৎ, ইঞ্জিনীয়ার এবং বহু কুশলী কর্মী গড়িয়া উঠিয়া দেশের সেবায় লাগিয়া যাইবে এবং স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রয়োজন ও অধিকার অনুযায়ী ভূরি ভূরি বস্তুসম্ভার রচনা করিবে। এই কর্মীরা বিদেশী ভাষায় কথা বলিবে না—বলিবে জনসাধারণের ভাষায়। তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও বিদ্যা দেশের লোক যাহার যেরূপ ক্ষমতা সেইরূপ নিজের করিয়া লইবে। অনুকরণাত্মক কাজ না করিয়া তাঁরা যথার্থ মৌলিক কাজ করিবেন। সহায়তা করিয়া এই স্বাধীন শিক্ষার ব্যয় দেশবাসী সংকুলান করিবে।

[হরিজন, ৯-৭-৩৮, ১৭৬]

ভারতের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি

৮৩৮। আমার গৃহের সকল জানালা বন্ধ করিয়া, গৃহের চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া, সকল যাতায়াত বন্ধ করিতে চাহি না। আমি চাই আমার গৃহে সকল দেশের সংস্কৃতির হাওয়া অবাধে চলাচল করুক। তাই বলিয়া বাহিরের ঝড়ে আমার গৃহ উড়াইয়া লইবে তাহা কামনা করি না। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা, যাদের সাহিত্যে রুচি আছে, যত পারে ইংরাজী, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশী ভাষার চর্চা করুক, তারপর তারা বসুর (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু)

মত, রায়ের (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়) মত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত দেশকে তাদের শিক্ষার সুফল অর্পণ্‌ করুক। তাই বলিয়া কেহ যেন নিজের মাতৃভাষাকে অবহেলা করিয়া ভুলিয়া না যায় বা মাতৃভাষার দীনতায় লজ্জা না পায় অথবা কেহ যেন মনে না করে নিজের মাতৃভাষায় সে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। কারাগারের ধর্ম আমার ধর্ম নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৬-২১. ১৭০]

বিংশ পর্ব

বিবিধ

স্বাস্থ্যবিধি

৮৪০। ভগবান আমাদিগকে এই শরীর দিয়াছেন, নিষ্ঠার সহিত তাঁর সেবায় নিয়োগ করিবার জন্য। জন্মগ্রহণ করিবার কালে শিশুর মন ও দেহ থাকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র। আমাদের কর্তব্য, জীবনে এমন করিয়া চলা, যেন দেহ কি মনে কোন পাপ, কোন কলুষ বহন না করিয়া, শিশুর মত পবিত্রতা লইয়া, কাল পূর্ণ হইলে নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করিতে পারি।

[স্বাস্থ্যবিধি, ১২৯]

পৌর স্বাস্থ্য

৮৪৩। পৌর স্বাস্থ্যরক্ষা বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের দেশগুলি এতই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যে আমরা তাহাদের কাছে এ বিদ্যা শিখিতে পারি এবং শেখা উচিত। পাশ্চাত্যের জনসমাজ বহু চেষ্টায় একত্রে বহু লোক মিলিয়া সুস্থভাবে বাস করার বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছে। তাহাদের কাছে শিখিবার আছে। তাহাদের অর্জিত স্বাস্থ্যবিধিগুলি আমাদের দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী রদবদল করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে। আমার দেশপ্রেম সকলের প্রতি প্রেমভাবাপন্ন, কাহারও প্রতি বৈরিভাব পোষণ করে না, তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিকতাকে আমি যতই পরিহার করিতে চাই না কেন, তাহাদের যে গুণে আমরা উপকৃত হইব তাহা গ্রহণ করিতে কোন বাধা দেখি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১২-২৪, ৪৩০]

প্রতিষ্ঠান ও জনসমর্থন

৮৪৪। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যদি যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে কোন প্রতিষ্ঠানই সাহায্যের অভাবে নষ্ট হয় না। যে সকল প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, হয় তাহাতে এমন কিছু গুণ ছিল না যাহা জনসাধারণের সহানুভূতি পাইতে পারে, অথবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন অথবা তাঁহাদের উদ্যম চলিয়া গিয়াছিল। (শেষের দুইটি একই ব্যাপার)। এই কারণে যোগ্য প্রতিষ্ঠানের কর্ম-কর্তাদের আমি বিশেষ অনুরোধ করিব, অভাব আসিলে তাঁরা যেন হতাশ না হন। এইরূপ সংকট পার হওয়াই তাঁহাদের যোগ্যতার পরীক্ষা বলিয়া যেন মনে করেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১০-২৫, ৩৫১]

জনসাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

৮৪৬। প্রথমেই আমি শিখিয়াছিলাম যে, ধার-করা অর্থে সাধারণের কাজ পরিচালনা করা উচিত নয়। অর্থের ব্যাপার বাদ দিয়া অন্য সকল বিষয়ে লোকের বাক্‌দানে বিশ্বাস করা যায়।

[আত্মকথা, ১৮৬]

৮৪৮। শিক্ষা বিষয়ে অভিনব পরীক্ষার দৃষ্টান্তটি বিচার করা যাউক। আমার মতে এ পরীক্ষার জন্য কাহারও কাছে অর্থসাহায্য লওয়া উচিত হইবে না। তাহা হইলে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সকল চেষ্টা পণ্ড হইয়া যাইবে। কথা এই যে, প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়ার নিশ্চয়তার সহিত মন হইতে আদর্শনিষ্ঠাও উবিয়া যায়।

[হরিজন, ১০-১২-৩৮, ৩৭১]

৮৫০। প্রতিষ্ঠানের অর্থের প্রাচুর্য থাকিলেই তাহার শেষ কপর্দক পর্যন্ত যে-কোন ভাবে হউক খরচ করিয়া ফেলা উচিত হইবে না। এই সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ নীতি হইল যদি একান্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়

তবে কোটি টাকা ব্যয় করিতেও দ্বিধা করার কারণ নাই। আবার যেখানে প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার আশা নাই সেই ক্ষেত্রে ব্যয় করার মত কোটি টাকা হাতে থাকিলেও একটি পয়সা ব্যয় করাও উচিত হইবে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৫-৩১, ১১৮]

৮৫১। আমাদের দেশের জনসাধারণ পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম, তাই আমাদের দেশের জনসাধারণের যে-কোন অর্থ সেই দরিদ্রতম জনতার অর্থ। সেই দরিদ্রের সম্পদ্ ব্যয় করার বিষয়ে সবচেয়ে সতর্ক, সাবধান ও যত্নশীল হইয়া তার প্রতিটি পয়সার হিসাব দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৪-৩১,৭৪]

সংবাদপত্রসেবা

৮৫৪। সংবাদপত্রে কাজ করার একমাত্র নীতি হওয়া উচিত—সেবা।

[আত্মকথা, ৩৪৯]

৮৫৫। সংবাদপত্র প্রচারের একটি উদ্দেশ্য হইল জনগণের মনোভাব বুঝিতে পারা এবং বিচারপূর্বক প্রচারের দ্বারা জনমত গঠন করা ও সেই সঙ্গে তাহা প্রচার করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল জনগণের চিত্তে সর্বজনসমাদৃত ভাবগুলি জাগাইয়া তোলা। তৃতীয় উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের ত্রুটিগুলি নির্ভীক শক্তিতে সকলের সামনে তুলিয়া ধরা।

[হিন্দ্ স্বরাজ, ১]

৮৫৭। দুঃখের বিষয় সাধারণ লোকের কাছে সংবাদপত্র ধর্ম-পুস্তকের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজীর এমনও ইচ্ছা হয় যে, খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করিতে অনুরোধ

করেন। ইহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। ধর্মপুস্তক ও সৎসাহিত্যের মধ্যেই মনের প্রকৃত খোরাক রহিয়াছে।

আধুনিক কালে সংবাদপত্রকে সমাজের চারি শক্তির মধ্যে চতুর্থ শক্তি বলা হয়। সংবাদপত্রের অবশ্যই বিরাট্ শক্তি আছে, সেই শক্তির অপব্যবহার করা মহাপাপ। গান্ধীজী নিজে সংবাদপত্রসেবী —তিনি তাঁহার সংবাদপত্রসেবী সহকর্মীদিগকে তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া এই অনুরোধ করেন যে, সংসারে সত্যের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করাই যেন তাঁহাদের একমাত্র কাজ হয়।

[হরিজন, ২৭-৪-৪৭, ১২৮]

বৃত্তিশিক্ষা

৮৫৯। যাঁদের বিদ্যা আছে সেই বিদ্যাকে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় মাত্র নিয়োজিত না করিয়া দেশের সেবা করিলে বিদ্যা সার্থক হইবে। যিনি চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহার সেবা পাইবার জন্য বহু রোগী ও অনেক রোগ অপেক্ষা করিয়া আছে। যদি কেহ আইনবিদ্যায় পারদশা হইয়া থাকেন,—ভারতে অগণিত বিবাদ বিসংবাদ রহিয়াছে, সেই সকল বিবাদ আইনের কৌশলে না বাড়াইয়া সেই বিবাদ মিটাইয়া দিয়া যাহাতে লোকের আদালতে আসা বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করিলে দেশের সেবা করা হইবে। যদি কেহ পূর্তবিদ্যায় পারদর্শী হন, দেশের দরিদ্র লোকের সাধ্যের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত আদর্শ গৃহ নির্মাণ করিয়া দেশের দুঃখ লাঘব করুন। শিক্ষণীয় এমন কোন বিষয় নাই যাহা প্রকৃত সেবায় লাগানো না যায়।

(যে বন্ধুটির প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী উল্লিখিত উক্তি করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন হিসাবরক্ষার কাজে শিক্ষিত, তাই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—)

কংগ্রেস ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাব পরাক্ষার জন্য দক্ষ কর্মীর একান্ত অভাব। ভারতে ফিরিয়া আসিলে তোমাকে প্রভূত

কাজ দিতে পারিব এবং কাজের মজুরিও দিব—দিন চারি আনা হিসাবে। ভারতের মজুররা এত বেশী পায় না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১১-৩১, ৩৩৪]

শিল্পকলা সম্বন্ধে

৮৬১। যখন কিছু দেখি, তার বাহিরের রূপ যখন রঙে রেখায় চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে, তখন অন্তরেও তার সাড়া জাগিয়া ওঠে। কেহ বাহিরের রূপেই তৃপ্ত, কেহ বা অন্তরের সাড়াটুকুর জন্য ব্যস্ত—যার যেমন কামনা। অন্তরে সাড়া জাগায় বলিয়াই বাহিরের রূপের মূল্য আছে। সার্থক শিল্প মাত্রই শিল্পীর অন্তরের প্রকাশ। মানুষের গোপন অন্তরের ভাব শিল্প যতখানি প্রকাশ করিতে পারে ততখানি তাহা সার্থকতা লাভ করে। যে শিল্প মানুষের অন্তরের প্রকাশ তাহা আমার একান্ত প্রিয়। অনেকে নিজেকে শিল্পী বলিয়া পরিচয় দেন, হয়তো লোকে তাহা স্বীকারও করে, কিন্তু তাঁদের রচিত শিল্পে অন্তরের বহিঃপ্রকাশের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, আত্মার সে ব্যাকুলতাও ধরা পড়ে না।

সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে আত্মোপলব্ধির জন্য মানবচিত্তের গভীর আকুলতা শিল্পীর হাতে প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শকের মনকে উদ্বুদ্ধ করে। আমার নিজের বেলায় আত্মোপলব্ধির জন্য কোন বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন হয় না। আমার ঘরের দেওয়ালে চিত্র রাখার কোন প্রয়োজন অনুভব করি না। ঘরের উপরে ছাদ না থাকিলেও যায় আসে না; বরং অনাবরণ হইলে, তারকাখচিত অন্তহীন আকাশ আমার চোখে সৌন্দর্যের ডালি মেলিয়া ধরিবে। রাতের অন্ধকারে অগণ্যতারকা-খচিত আকাশ যে মহিমায় শূন্যপট চিত্রিত করিয়া আমার চোখে ধরা দেয়—কোন্ চিত্রকর ছবিতে সে মহিমা ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে? তাই বলিয়া আমি শিল্পীদের আঁকা সর্বজনপ্রিয় ছবির মূল্য অস্বীকার করিতে চাহি না। আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, প্রকৃতি

তার বর্ণে ছন্দে যে মোহন ছবি আমাদের সামনে মেলিয়া ধরিতেছে তার কাছে মানুষের চেষ্টা কতই সামান্য! মানুষের শিল্পকলার একমাত্র সার্থকতা যে, শিল্পের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আরও বেশী করিয়া জানার পথে অগ্রসর হইতেছে।

কেবল যুক্তিসিদ্ধ সত্য নয়, সকল সত্য—সত্যদীপ্ত মুখচ্ছবি, সত্য প্রেরণার সৃষ্ট শিল্প, সত্য অনুভূতির প্রেরণাময় সংগীত—সকলই পরম সুন্দর। সাধারণতঃ লোকে সত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারে না, সাধারণ লোক সত্যকে সমাদর করিতে চাহে না, যার জন্য সত্যের সৌন্দর্যও বুঝিতে পারে না। যেখানে মানুষ সত্যকে সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করে সেখানে সৃষ্টি হয় সার্থক শিল্প।

সত্যের বেদনা যখন কাজ করে তখনই পরম সুন্দরকে রূপে রঙে ফুটাইয়া তোলা সম্ভব হয়। সত্যের প্রেরণা লাভ করে মানুষ কদাচিৎ, তাই সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে সুন্দরকে পাওয়া যায় খুব কম।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১১-২৪, ৩৭৭]

৮৬৩। কেমন করিয়া জানি না লোকের ধারণা হইয়াছে যে, কলাবিদ্যা শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে না। আমি জীবনে যাহা কিছু জানিয়াছি তার সকল অভিজ্ঞতা একত্রিত করিয়া বুঝিয়াছি, এই যুক্তি সর্বৈব মিথ্যা। আজ জীবনের সায়াহ্নে আমি বলিতে পারি, শুদ্ধ জীবন লইয়া বাঁচাই সবচেয়ে সত্য শিল্পকলা। চর্চার ফলে সুকণ্ঠ গায়কমাত্রই গাহিয়া লোকের মন ভুলাইতে পারেন। কিন্তু জীবনকে তালে মানে শুদ্ধ করিয়া, পবিত্র দেহমন লইয়া বাঁচিয়া তাহা হইতে যে অপরূপ সংগীত সৃষ্টি করা যায় তাহা পারে কয়জনে?

[হরিজন, ১৯-২-৩৮, ১০]

সংগীত

৮৬৪। সংগীত আনে ছন্দ, আনে লয় বা সংগতি। সংগীতের প্রভাব বিদ্যুতের মত, নিমেষে মানুষকে সজাগ ও শান্ত করিতে

পারে। ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে শাস্ত্র জানে মাত্র কয়েকজনে, সংগীতেরও সেই অবস্থা। আধুনিক কালে অন্য দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রে সকলেরই অধিকার। আমাদের দেশে সংগীত সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। বয়স্কাউট বা অনুরূপ সেবাদলগুলির উপর আমার যদি কর্তৃত্ব থাকিত তাহা হইলে জাতীয় সংগীতের যথাযথ যৌথ গায়ন বাধ্যতামূলক করিয়া দিতাম। এই উদ্দেশ্যে ভারতে কংগ্রেস বা অন্য সভাসমিতির অধিবেশনে সুগায়কের গান শোনানো এবং সমবেত সংগীতের প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৯-২০, ঠাকুর, ১৬৩]

৮৬৫। বহু অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিচারে পণ্ডিত খারে বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে সংগীতকে একটি অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গণ্য করা উচিত। এ প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। সুকৌশলে হাত চালাইতে শেখা যেমন দরকার, কণ্ঠস্বর ব্যবহারের কৌশলও শিক্ষা করা প্রয়োজন। শ্রেণীবদ্ধ ব্যায়াম, হস্তশিল্প ও অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতকেও পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে ছাত্রদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা হইবে এবং তাহাদের বিদ্যার্জনে আগ্রহ বাড়িবে।

ইহাতে শিক্ষা ব্যাপারে ঘোর পরিবর্তন ঘটানো হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে যদি দেশের জনসাধারণকে সুগঠিত ভিত্তিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে উপরিউক্ত চারিটি বিষয়ে শিক্ষা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিতে একবার পদার্পণ করিলেই সেখানকার রুচিহীনতা, বিশৃঙ্খলা ও অপ্রিয় কথাবার্তা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। আশা করি আমাদের দেশের মন্ত্রীরা যখন নূতন শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করিবেন তখন দেশের প্রকৃত মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমার প্রস্তাবিত বিষয়গুলি পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিতে ভুলিবেন না। প্রাথমিক শিক্ষার যে পদ্ধতি আমি রচনা করিয়াছি তাহাতে এগুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা

হইয়াছে। কঠিন বিদেশী ভাষার বোঝা ছাত্রদের স্কন্ধ হইতে সরাইয়া লইলে তাহারা সহজেই এ সকল বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবে।

[হরিজন ১১-৯-৩৭, ২৫০]

ড্রিল

৮৬৬। বহুলোক একসঙ্গে ড্রিল বা কুচকাওয়াজ করা অভ্যাস করিলে অনেকে মিলিয়া তালে তালে চলা ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলা এবং দ্রুতবেগে চলা অভ্যাস হয়। আমাদের দেশে জনসভা বা পূজা-পার্বণ ইত্যাদি ব্যাপারে যদি উপযুক্ত সংযম সহকারে আমরা চলাফেরা করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের সমগ্র জাতির সময় ও শক্তি অনেক বাঁচিয়া যাইত। বহুলোক একত্রে সংযতভাবে চলাফেরা করিলে তাহাতে একটি নীরব ছন্দের সুর বাজিতে থাকে। এখনি আমি আপনাদের অনুরোধ করিয়াছিলাম, একটু কাছে সরিয়া আসিতে, যাহাতে আমার অনুচ্চ কণ্ঠস্বর সকলে শুনিতে পান। যদি আপনাদের ড্রিলের অভ্যাস যথেষ্ট থাকিত তাহা হইলে আপনারা নিঃশব্দে, সুশৃঙ্খলভাবে সে কাজ করিতে পারিতেন। ড্রিলের মধ্যে এমন একটি ছন্দ ও সুর আছে যে সেই তালে চলিতে কোন কষ্ট হয় না, ক্লান্তি আসে না। যদি আমাদের দেশের ত্রিশ কোটি লোককে এমন অভ্যাস করানো যাইত যে সমগ্র জাতি একসঙ্গে, একতালে চলিবে, একসঙ্গে কাজ করিবে, প্রয়োজন হইলে একসঙ্গে মরিবে; তাহা হইলে সামান্য মাত্রও বিরোধ না করিয়া আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিতাম। সমস্ত পৃথিবীর লোক আমাদের এই শান্তিপূর্ণ বিপ্লব দেখিয়া মুগ্ধ হইত ও আমাদের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইত।

[হরিজন, ৩১-১২-৩৮, ৪১১]

প্রাচীনের মূল্যায়ন

৮৬৭। যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই ভালো এই মতে আমি সায় দিতে পারি না। আবার এ মতও আমি পোষণ করি না যে যাহা কিছু ভারতীয় তাহাই ভালো।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১-২৫, ১১]

স্বদেশী

৮৭০। সকল অবস্থায় বিদেশী জিনিস মাত্রই বর্জন করাকে স্বদেশীর অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতে আমি পারি না। আমাদের দেশের অনেক শিল্পদ্রব্য আছে যেগুলি দেশের লোক ব্যবহার না করিলে দেশ নিঃস্ব হইয়া পড়িবে, সেই সামগ্রীর ব্যবহার করিয়া বিদেশী বর্জন করাকেই আমি মোটামুটি স্বদেশী বলিয়া বুঝি। যে স্বদেশী অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী জিনিস, যাহার ব্যবহারে আমাদের দেশের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাও বর্জন করিতে চাহে—সে স্বদেশী আমার বিচারে বড়ই সংকীর্ণ বলিয়া মনে হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৬-২৬, ২১৮]

ইউরোপীয় সভ্যতা

৮৭৪। ইউরোপের আচার-আচরণ ইউরোপীয়দের মানায়—ভারতীয়েরা যদি তাহাদের সব কিছু নকল করিবার চেষ্টা করে, সর্বনাশ ডাকিয়া আনা হইবে। অবশ্য ইউরোপের যে সদ্‌গুণগুলি আমরা অভ্যাস করিলে উপকৃত হইব তাহার অনুকরণ করার বাধা নাই। আবার ইউরোপীয়দের আচরণে যে দোষ আসিয়া পড়িয়াছে সেগুলি ইউরোপীয়রা সংশোধন করিবে না, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। ইউরোপীয় সমাজজীবনের প্রধান দোষ দৈহিক আরামের জন্য তারা নিরন্তর বস্তুসম্ভার জমাইয়া স্তূপ করিয়া তুলিতেছে। উপভোগের চেষ্টায় যে আরামের গুরুভার বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার চাপে ধ্বংস

হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া আমি তাঁহাদের অনুরোধ করিব, যেন তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করেন। ইহাও হইতে পারে যে আমার ধারণা ভুল, তবে এটুকু আমি বেশ জানি যে, ভারতীয়দের পক্ষে ঐ স্বর্ণমৃগের পিছনে দৌড়ানোর প্রত্যক্ষ ফল মৃত্যু। ইংরাজের একটি বাণী আমাদের মনে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করা উচিত—

'জীবনযাত্রা হইবে সহজ ও অনাড়ম্বর, ধ্যান হইবে সুউচ্চ ও মহৎ।' আজ এটুকু সত্য বলিয়া বুঝা গিয়াছে যে, high living অর্থাৎ বিলাস-ব্যসনের জীবন পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের সকলের পক্ষে ঘটিয়া ওঠা সম্ভবপর নয়। আমরা যারা সকলের জন্য চিন্তা করার ভার লইয়াছি মনে করি, যদি সেই high living অর্থাৎ ব্যয়বহুল আরামের জীবনের জন্য ব্যস্ত হই, তাহা হইলে হয়তো high thinking বা মহৎ ধ্যান হারাইয়া ফেলিব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৪-৩১, ৮৮]

বিদেশীদের প্রতি

৮৭৬। দুধে পরিপূর্ণ পাত্রে যদি চিনি মেশানো হয় অতি ধীরে, সাবধানে, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র দুধ উপচাইয়া পড়ে না। বিদেশের যাঁহারা এই লঙ্কাদ্বীপে আসিয়াছেন তাঁহাদের এই দুগ্ধপাত্রের মত সংযত হইয়া এই দেশের মাধুর্য নিজের অন্তরে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদের আচরণে দেশের লোক যেন ক্ষুব্ধ না হয়—তাঁহাদের অন্তরের মাধুর্যে দেশের লোক যেন মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে আপন করিয়া লইতে পারে।

[সিংহলে গান্ধীজীর সহিত, ১১৬]

সমাপ্ত